শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ-লিখিত
মুখবন্ধ

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম
৪, নস্করপাড়া লেন, হাওড়া-১

প্রকাশক ঃ
শ্রীম[illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম,
৪, নস্করপাড়া লেন, হাওড়া-১

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
ইম্‌প্রেসন হাউস,
৮৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রীনিত্যানন্দ ভকত

মুদ্রণ ঃ
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪, কৈলাস মুখার্জী লেন
কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান
নবভারত পাবলিশার্স
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত 'একালের সর্বোচ্চ ধর্মসাহিত্য ও জীবনী-সাহিত্য' হিসাবে সাধারণের মধ্যে এবং বিদ্বজ্জনদের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থের ধর্মীয়, দার্শনিক এবং সাহিত্যরূপ নিয়ে ইতস্তত আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে কথামৃত দিনপঞ্জী রচনার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সূচিত হয়। আশ্রমের গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক বিভাগের পক্ষ থেকে স্থির করা হয়, এদেশ ও বিদেশের মনীষী, সাহিত্যিক এবং সন্ন্যাসীদের রচনা সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। গ্রন্থটি এমনভাবে প্রস্তুত করা হবে যাতে একটি খণ্ডের মধ্যে 'কথামৃত' ও শ্রীরামকৃষ্ণ উক্তি সম্বন্ধে নানা শ্রেণীর মানুষের চিন্তাভাবনা সংকলিত থাকবে, সেইসঙ্গে থাকবে প্রাসঙ্গিক সংবাদ। সেই সিদ্ধান্তেরই ফলশ্রুতি বর্তমান গ্রন্থ।

আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। সে রচনা গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আরও বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী এই বইটির সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছেন। আশ্রম-সভাপতি স্বামী গহনানন্দ আমাদের এ সম্পর্কে সর্বদাই অনুপ্রাণিত করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক সন্ন্যাসীর মূল্যবান রচনা আমরা পেয়েছি। শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকার রচনাপ্রাপ্তির সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

বাংলাদেশের বহু বিখ্যাত কথাশিল্পী ও বুদ্ধিজীবী লেখা দিয়েছেন। তাঁদের সময়ের মূল্য সবিশেষ। তথাপি কোনো প্রত্যাশা না রেখে আমাদের অনুরোধ তাঁরা রক্ষা করেছেন।

গ্রন্থ প্রকাশের কালে আর্থিক ও অন্য ব্যাপারে বহু মানুষের সাহায্য আমরা পেয়েছি। গ্রন্থশেষে তাঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সে তালিকা অসম্পূর্ণ। ত্রুটির ক্ষেত্রে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

গ্রন্থ-প্রস্তুতি কমিটির সদস্যরা যে, অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন তা

বলাই বাহুল্য। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কাজ হিসাবে তাঁরা এ কাজ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আমাদের প্রতিষ্ঠান; শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বহু বিশিষ্ট সন্ন্যাসীর স্নেহ ও সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠান পুষ্ট ও বর্ধিত—এর পক্ষে বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করা কর্তব্য, কারণ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আমাদের কাছে 'রামকৃষ্ণ-উপনিষদ'। তারই উপরে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা ধন্য। নমস্কার করি সেই চিরধন্য পুরুষ শ্রীম'কে—যিনি শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণের এই অমর কথামৃতের শ্রোত ঋষি।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দের চরণে প্রণাম।

মুখবন্ধ

যুগের সর্বোত্তম ধর্মগ্রন্থ—কথামৃত

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আজ সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মীয় ক্লাসিক সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত। জগতের বিরাট এক অধ্যাত্ম আচার্যের উক্তির সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংকলন এই গ্রন্থে আমরা পাই। গ্রন্থটি যে, ধর্মপুরুষদের জীবনীসাহিত্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন—সেকথা কেবল ভারতের ক্ষেত্রে নয়, সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রে সত্য। বস্তুতঃপক্ষে বলা যায়, এটি এই যুগের ধর্মক্ষেত্রে সর্বোত্তম গ্রন্থ।

বইটি বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে। নিশ্চয় আরো বহুভাষায় অনূদিত হবে। এমন ধারণার কারণ, এই গ্রন্থে আধুনিক মানুষের পক্ষে বোধগম্য ভাষায় ধর্মের সারবস্তু পরিবেশিত হয়েছে। ধর্মের এবং জাতির বেড়াকে ভেঙে এই বই নানা দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে—তাতে প্রমাণিত হয়েছে, সত্য ধর্মের বাণীর বিপুল আবেদন আজও এই পৃথিবীতে আছে। মানুষের মনে ধর্মের আবেদন হ্রাস পেয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের কাছে এটি প্রণিধানের বিষয়।

একথা দিন-দিন প্রতিভাত হয়ে উঠছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণই শ্রীম-কে এনেছিলেন তাঁর উক্তি লিপিবন্ধ করার জন্য। এমন কোনো আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা নেই যার সদুত্তর কথামৃতে মিলবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসসন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন তাঁর পাদমূলে উপবিষ্ট উপদেশপ্রার্থী সাধুদের বলেছিলেন, তিনি তাঁদের এককথায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দেবেন: 'প্রতিদিন কথামৃত পড়ো।' বাস্তবিকপক্ষে, কেউ যদি ধারাবাহিকভাবে এই উপদেশ অনুসরণ করে তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তার গোটা ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটবে এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তার আয়ত্তে আসবে।

১. শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের দৃষ্টিতে

'তোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই বলিতেছেন।'

'নিজের মুখে যাহা শুনিয়াছি, নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই সাজাইয়া দিলাম।'

'আপনার প্রচেষ্টা একেবারে মৌলিক। আমাদের প্রভু ওহেন মৌলিক ছিলেন, আমাদের সকলকে তাই হতে হবে।'

'ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করে ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যেতে পারে।'

'ভালো-ভালো পণ্ডিতের কাছ থেকে বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি। তারপর সেগুলোকে মালা করে গলায় পরে নিয়েছি।'

'এই প্রথম একজন পরিত্রাতা পুরুষের মুখের কথা হুবহু লিখে নিয়েছেন তাঁর এক শিষ্য।'

'তিন বৎসরের একটানা অসুখের মধ্যে কথামৃত ছিল আমার জীবন-সর্বস্ব।'

'তাঁর মতো পাত্র বিচার করে উপদেশ দেওয়া মনুষ্যশক্তির বহির্ভূত।'

'মহেন্দ্র মাস্টার···প্রভু-পদপঙ্কজে ভ্রমরা।'

শ্রীমা সারদাদেবী

॥ ১ ॥

কথামৃত সম্পর্কে শ্রীমা সারদাদেবী ঃ

বাবাজীবন, তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোনো ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহারই কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

—(জয়রামবাটী, ২১শে আষাঢ়, ১৩০৪)।

॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীমার কাছে শ্রীম-র নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীপাদপদ্ম ভরসা

পূজা ও নিবেদন

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপম্ ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যম, তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ।

মা, ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব উপস্থিত। এ আনন্দের দিনে আমাদের এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আমাদের এই নূতন নৈবেদ্য।

১লা ফাল্গুন,
১৩০৮, ১৯০২

আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী,
আপনার প্রণত অকৃতী সন্তানগণ

॥ ৩ ॥

নমস্তে ভুবনেশানি নমস্তে প্রণবাত্মকে, সর্ববেদান্তসংসিদ্ধে
নমো হ্রীঁকারমূর্তয়ে

মা, আশ্বিনের মহামহোৎসব উপস্থিত—আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ করো। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয় ভাগ এবারের নৈবেদ্য।

মা, তোমার আশীর্বাদে শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথম ভাগের চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। আমরা করযোড়ে আবার প্রার্থনা করিতেছি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বেদান্তবাক্য চিন্তা করিয়া—তাঁহার শ্রীমুখের কথামৃত পান করিয়া—তাঁহার ভক্তসঙ্গে বিহার, অলৌকিক চরিত্র স্মরণ মনন করিয়া, দেশে-দেশে ও সর্বকালে তোমার সকল সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি, আনন্দ, শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি ও অন্তে পরমপদ লাভ হয়।

মা, ঁঠাকুরের কথা ও তাঁহার ভক্তদের কথা একই। আজ আমরা ঈশ্বরলাভের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য চিন্তা করি। আবার ঁবিদ্যাসাগর, শশধর, ডাক্তার সরকার, প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের প্রতি তাঁহার আশ্বাসবাণী ও ভক্তি-পথপ্রদর্শন চিন্তা করিব। যাঁহারা 'আমি পাপী আমার কি আর উদ্ধার হইবে' এইরূপে ভাবিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি অভয়বাণী যেন আমরা না ভুলি। আর 'ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হই' এই মঙ্গলবাণী যেন আমাদের মূল মন্ত্র হয়।

দেবীপক্ষ, আশ্বিন ১৩১৫। একান্ত শরণাগত,

তোমার প্রণত সন্তানগণ।

॥ ৪ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

মা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আবার উপস্থিত! আজ নবম্যাদি কল্পারম্ভ। আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ করো! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থভাগ, এবারের নৈবেদ্য।

মা, তোমার ও বাবার আশীর্বাদে শ্রীকথামৃত আবার প্রকাশিত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্রের তেত্রিশখানি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ভগবদ্ভক্ত-গণ ধ্যান করিবেন।

ভক্তদের জন্য এবারে একটি বিশেষ শুভসংবাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন, 'মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়।' এই শুভ অঙ্গীকারবাণী ভক্তদের যেন সদা স্মরণ থাকে।

এবার ভক্তসমাগম-কথা অনেক আছে! ছোট নরেন, পূর্ণ, নারাণ প্রভৃতি শেষের ছোকরা ভক্তদিগের জন্য ব্যাকুলতা; নরেন্দ্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাসের উপদেশ; অধরকে চাকরি হইতে নিবৃত্তির উপদেশ; ঁজন্মাষ্টমীদিবসে গিরিশের স্তব ও তাঁহার প্রতি ঠাকুরের উৎসাহবাণী—এই সকল চিত্র ভক্তেরা ধ্যান করিবেন, সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থা বর্ণনা করা মানুষের অসাধ্য। তাঁহার বালকাবস্থা বা পরমহংস অবস্থার কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল। আর সিদ্ধি-

লাভের পর সাধনাবস্থায় যে সকল অমানুষিক ভাব ও অদ্ভুতদর্শন হইত, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস এই ভাগে পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থে বিবৃত শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ও ঠাকুরের নানাবিধ অবস্থাও একস্থানে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে ;—আমরা তাঁহার নিজের মুখে যাহা শুনিয়াছি ও নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছি।

মা, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে যখন শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়ন-দুরূহ-ব্রত তোমার অকৃতী সন্তান গ্রহণ করে, তুমি আশীর্বাদ করিয়াছিলে ও অভয় প্রদান করিয়াছিলে। শ্রীশ্রীনরেন্দ্র প্রভৃতি গুরুভায়েরাও যারপরনাই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও শ্রীযুক্ত বাবুরাম, শশী, গিরিশ প্রভৃতি ভায়েরা সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেছেন।

মা, তোমার আশীর্বাদ ও অভয়বাণী এ দাসানুদাসের একমাত্র অবলম্বন।

এক্ষণে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর, যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত একমাত্র বাবার সেবা, তোমার সেবা, ও তোমাদের সন্তানদের ও ভক্তদের আনন্দবর্ধনে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে।

নবম্যাদি কল্পারম্ভ ও দেবীর বোধন।
কলিকাতা, ২৭-এ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ ;
১০ই আশ্বিন, ১৩১৭।

একান্ত শরণাগত, দাসানুদাস,
মা, তোমার অকৃতী সন্তান,
শ্রীম

মা, তোমার আশীর্বাদে চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

কোজাগর পূর্ণিমা, আশ্বিন, ১৩২১।
শ্রীম

স্বামী বিবেকানন্দ

॥ ১ ॥

কথামৃত পুস্তিকা প্রাপ্তির পরে শ্রীমকে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের পত্র :

তোফা হয়েছে বন্ধু, তোফা। এতদিনে আপনি ঠিক কাজে হাত দিয়েছেন। গর্ত থেকে বেরিয়ে আসুন বন্ধু! সারাজীবন ঘুমিয়ে কাটাবার নয়। সময় বয়ে যাচ্ছে। সাবাস্। ঐ তো কাজ।

পুস্তিকা প্রকাশের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। কেবল ভয় হয়, পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলে খরচে পোষাবে না। কুছ্ পরোয়া নেই—টাকা হোক বা না হোক—দিবালোকে তা বেরিয়ে আসুক। আশীর্বাদ পাবেন অনেকের, বেশিলোকের কাছ থেকে অভিশাপ। কিন্তু বৈসাহি সদ কাল বনতা সাহেব। এই হল সময়।

[১১ অক্টোবর, ১৮৯৭]

॥ ২ ॥

দ্বিতীয় পুস্তিকাটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাস্তবিকই অপূর্ব। প্রচেষ্টা একেবারে মৌলিক। ইতিপূর্বে কখনো কোনো মহান আচার্যের জীবনকে লেখকের মনের রঙ না ছড়িয়ে এইভাবে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা হয়নি—যা আপনি করলেন। ভাষাও প্রশংসার অতীত—এমন সজীব, তীক্ষ্ণ, প্রত্যক্ষ অথচ এমন সহজ স্বচ্ছন্দ। কতখানি যে উপভোগ করেছি বলে বোঝাবার ভাষা নেই। পড়ে একেবারে মাতোয়ারা। কি অদ্ভুত! আমাদের আচার্য, আমাদের প্রভু, ওহেন মৌলিক, আমাদের সকলকেও তাই মৌলিক হতে হবে, নচেৎ সব বরবাদ। এখন বুঝতে পারছি, আমাদের মধ্যে আর কেউ কেন আগে তাঁর জীবনী লেখার চেষ্টা করেনি। ও-কাজটা—ঐ বিরাট কাজটা—আপনার জন্যই তোলা ছিল। স্পষ্টতঃই তিনি আপনার সঙ্গে আছেন।…

সক্রেটিসের সংলাপের আগাগোড়াই প্লেটো। আর আপনি আছেন সম্পূর্ণ অন্তরালে। তদুপরি নাটকীয় অংশ অসাধারণ সুন্দর।

[২৪, ১১, ১৮৯৭]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

শ্রীমকে লিখিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্রাংশ

অবতারবরিষ্ঠের সর্বোচ্চ প্রজ্ঞায় পূর্ণ এই অমূল্য পৃষ্ঠাগুলি প্রকাশ করে আপনি গোটা মানবসংসারকে ঋণজালে আবদ্ধ করে ফেলেছেন।

স্বামী শিবানন্দ

"একসময়ে কথামৃত-কারের দৃষ্টান্তে তিনি [স্বামী শিবানন্দ] ঠাকুরের কথা টুকিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন। এই কাজের সুবিধার জন্য একদিন নিবিষ্টমনে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া সব কথা ভালো করিয়া শুনিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিলেন, 'কিরে, অমন করে কি শুনছিস্ ?' অপ্রস্তুত হইয়া তারক [স্বামী শিবানন্দ] নিরুত্তর রহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'তোর ওসব কিছু করতে হবে না—তোদের জীবন আলাদা।' সেদিন হইতে লিখার সঙ্কল্প নষ্ট হইল এবং যাহা লিখা হইয়াছিল তাহাও গঙ্গাগর্ভে স্থান পাইল।"

[স্বামী গম্ভীরানন্দ-কৃত 'ভক্তমালিকা' (১ম) গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

স্বামী সারদানন্দ

ভাবরাজ্যের সম্রাটের বাণী-রহস্য

দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক তপস্যান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে বলেন— "ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্।" ঠাকুরও তাহাই করেন—একথা এখন অনেকেই জানিয়াছেন। কিন্তু ভাবমুখে থাকা যে কি ব্যাপার এবং উহার অর্থ যে কত গভীর তাহা বুঝা, ও বুঝানো বড় কঠিন। আটাশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন জনৈক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের এক-একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।" বন্ধুটি তৎশ্রবণে অবাক হইয়া বলেন—"বটে ? আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না। তাঁর কোনো একটি কথা ঐভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে ?"

স্বামীজী—বোঝবার মাথা থাকলে তবে তো বুঝবি! আচ্ছা, ঠাকুরের যে-কোনো একটি কথা ধর্, আমি বুঝুচ্ছি।

বন্ধু—বেশ। সর্বভূতে নারায়ণ দেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ঠাকুর 'হাতি-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণে'র যে গল্পটি বলেন সেইটি বুঝিয়ে বলো।

স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ পণ্ডিতদিগের ভিতরে আবহমান-কাল ধরিয়া স্বাধীন-ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ অথবা পুরুষকার ও ভগবদিচ্ছা লইয়া যে-বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে অথচ কোনো একটা স্থির মীমাংসা হইতেছে না, সেই-সকল কথা উত্থাপন করেন এবং ঠাকুরের ঐ গল্পটি যে ঐ বিবাদের এক অপূর্ব সমাধান, তাহা সরল ভাষায় তিন দিন ধরিয়া বন্ধুটিকে বুঝাইয়া বলেন।

তলাইয়া দেখিলে বাস্তবিকই ঠাকুরের অতি সামান্য-সামান্য দৈনিক ব্যবহার ও উপদেশের ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য হইতে হয়। অবতার-পুরুষদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কথাটি সত্য। তাঁহাদের জীবনালোচনায় ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি যে-দুই-একজন মহাপুরুষকে বিপক্ষ-দলের কুতর্কজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ধর্মসংস্থাপন করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, অপর সকল মহাপুরুষদিগের জীবনেই দেখা যায়, তাঁহারা শাদা কথায় মর্মস্পর্শী ছোট-ছোট গল্প, উপমা বা রূপকের সহায়ে যাহা বলিবার বলিয়া ও বুঝাইয়া গিয়াছেন। লম্বা-চওড়া কথা, দীর্ঘ-দীর্ঘ সমাস প্রভৃতির ধার দিয়াও যান নাই। কিন্তু সে শাদা কথায়, সে ছোট উপমার ভিতর এত ভাব ও মানবসাধারণকে উচ্চ আদর্শে পেঁছাইয়া দিবার এত শক্তি রহিয়াছে যে, আমরা হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও তাহাদের ভাবের অন্ত বা শক্তির সীমা এখনও করিতে পারিলাম না। যতই দেখি ততই উচ্চ উচ্চতর ভাব দেখিতে পাই, যতই নাড়াচাড়া তোলাপাড়া করি ততই মন 'অনিত্য অশুভ' সংসারের রাজত্ব ছাড়িয়া উর্ধ্বে উর্ধ্বতর দেশে উঠিতে থাকে এবং 'পরমপদপ্রাপ্তি' 'ব্রাহ্মীস্থিতি' 'মোক্ষ' বা 'ভগবদ্দর্শনে'র দিকে—কারণ এক বস্তুকেই নানাভাবে দেখিয়া মহাপুরুষেরা ঐ সকল নানা নামে নির্দেশ করিয়াছেন —যতই কেহ অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ঐ সকল শাদা কথার গভীর ভাব প্রাণে-প্রাণে বুঝিতে থাকে।...

ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, ঠাকুরের কথাগুলির পূর্বে তাঁহারা যে অর্থগ্রহণে সমর্থ হইতেন, এখন যত দিন যাই-তেছে তত সেইগুলির ভিতর আরও কত গভীর অর্থ তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারি-তেছেন। আবার ঠাকুরের অনেক কথা বা ব্যবহার, যাহার অর্থ আমরা তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কেবল হাঁ করিয়া শুনিয়া গিয়াছি মাত্র, তাহাদের ভিতর এখন অপূর্ব অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিয়া অবাক হইয়া থাকিতে হয়। ঠাকুরের কথাই ছিল—"ওরে, কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল পাওয়া

যায় ? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারা গাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল—সেই রকম। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না।…

ঠাকুরকে দেখিলেই বাস্তবিকই মনে হইত যেন একটি জ্বলন্ত ভাবঘনমূর্তি !—যেন পুঞ্জীকৃত ধর্মভাবরাশি একত্র সম্বন্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার একটা আকার ও রূপ দেখিতে পাইতেছি ! মনের ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটার পরিবর্তন হওয়ার কথা আমরা বলিয়াই থাকি, ও কালে-ভদ্রে কখন একটু-আধটু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু মনের ভাবতরঙ্গ যে, শরীরে এতটা পরিবর্তন আনিয়া দিতে পারে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। নির্বিকল্প সমাধিতে 'আমি' জ্ঞানের একেবারে লোপ হইল—আর অমনি সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরের হাতের নাড়ি, হৃদয়ের স্পন্দন, সব বন্ধ হইয়া গেল ; শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি ডাক্তারেরা যন্ত্র সহায়ে পরীক্ষা করিয়াও হৃৎপিণ্ডের কার্য কিছুই পাইলেন না। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জনৈক ডাক্তারবন্ধু ঠাকুরের চক্ষুর তারা বা মণি অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিলেন—তথাচ উহা মৃত ব্যক্তির ন্যায় কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না ! 'সখীভাব'-সাধনকালে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী ভাবিতে-ভাবিতে মন তন্ময় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শরীরেও স্ত্রী-সুলভ ভাব, উঠা-বসা, দাঁড়ান, কথাকহা প্রভৃতি প্রত্যেক কার্যে এমন প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, শ্রীযুত মথুরানাথ মাড় প্রভৃতি যাহারা চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সঙ্গে উঠা-বসা করিত,তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া অনেকবার কোনো আগন্তুক স্ত্রীলোক হইবে বলিয়া ভ্রমে পড়িল ! এইরূপ কত ঘটনাই না আমরা দেখিয়াছি ও ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি—যাহাতে বর্তমানে মনোবিজ্ঞান ও শরীর-বিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা নিয়মগুলিকে পালটাইয়া বাঁধিতে হয়। সেসব কথা বলিলেও কি লোকে বিশ্বাস করিবে ?

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় দেখিয়াছি. ঠাকুরের ভাবরাজ্যের সর্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা—ছোট-বড় সবরকম ভাব বুঝিতে পারা ! বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের মনোভাব— বিষয়ী,সাধু,জ্ঞানী,ভক্ত, স্ত্রী, পুরুষ সকলের হৃদ্‌গত ভাব—ধরিয়া কে কোন্ পথে কতদূর ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছে, পূর্ব সংস্কারানুযায়ী ঐ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে তাহার কিরূপ সাধনেরই বা বর্তমানে প্রয়োজন, সকল কথা বুঝিতে পারা, ও তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করা। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঠাকুর যেন মানবমনে যত প্রকার ভাব উঠিয়াছে, উঠিতে পারে, বা পরে উঠিবে, সে সকল ভাবই নিজ জীবনে অনুভব করিয়া বসিয়া আছেন এবং ঐ সকল ভাবের প্রত্যেকটির তাঁহার নিজের মনের ভিতর আবির্ভাব হইতে তিরোভাবকাল পর্যন্ত পর-পর তাঁহার যে-যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন। আর তজ্জন্যই ইতরসাধারণ মানব যে যখন আসিয়া যে ভাবের কথা বলিতেছে, নিজের ঐ সকল পূর্বানুভূত ভাবের সহিত মিলাইয়া তখনি

তাহা ধরিতেছেন, বুঝিতেছেন ও তদুপযোগী বিধান করিতেছেন। সকল বিষয়েই যেন এইরূপ। মায়ামোহ, সংসার তাড়না, ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ কোন্ অবস্থায় পড়িয়া উহা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া, কাতর-জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে ঠাকুর পথের সন্ধান তো দিয়া দিতেনই, আবার অনেক সময়ে সঙ্গে-সঙ্গেই নিজের ঐ অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ অনুভূতি হইয়াছিল তাহাও বলিতেন। বলিতেন, "ওগো, তখন এইরূপ হইয়াছিল ও এইরূপ করিয়াছিলাম" ইত্যাদি। বলিতে হইবে না—ঐরূপ করায় জিজ্ঞাসুর মনে কত ভরসার উদয় হইত এবং ঠাকুর তাহার জন্য যে-পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, কতদূর বিশ্বাস ও উৎসাহে সে সেই পথে অগ্রসর হইত। শুধু তাহাই নহে, এইরূপে নিজ জীবনের ঘটনা বলায় জিজ্ঞাসুর মনে হইত ঠাকুর তাহাকে কত ভালবাসেন!—আপনার মনের কথাগুলি পর্যন্ত বলেন।…

ঠাকুরকে ঐসব বেদ-বেদান্ত, যোগবিজ্ঞানের কথা কহিতে শুনিয়া আমাদের কেহ-কেহ আবার কখনো-কখনো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "মশাই, আপনি তো লেখা-পড়ার কখনো ধার ধারেন নি, এত সব জানলেন কোথা থেকে?" অদ্ভুত ঠাকুরের ঐ অদ্ভুত প্রশ্নেও বিরক্তি নাই! একটু হাসিয়া বলিতেন, "নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের-সব যে শুনেছি গো! সে সব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে, ভাল-ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে, বেদ-বেদান্ত, দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি। শুনে, তাদের ভেতর কি আছে জেনে, তারপর সেগুলোকে (গ্রন্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা করে গেঁথে গলায় পরে নিয়েছি—'এই নে তোর শাস্ত্র-পুরাণ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দে' বলে মার পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি।"…

ঠাকুরের কথা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তিনি যেন সর্বপ্রকার ভাবের মূর্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানবজগতে আর কখনও দেখা যায় নাই। ভাবময় ঠাকুর 'ভাবমুখে' অবস্থান করিয়া নির্বিকল্প অদ্বৈতবাদ হইতে সবিকল্প সকল প্রকার ভাবের পূর্ণ প্রকাশ নিজে দেখাইয়া সকল শ্রেণীর ভক্তদিগকে স্ব-স্ব পথের ও গন্তব্যস্থলের সংবাদ দিয়া অন্ধকারে অপূর্ব জ্যোতিঃ, নিরাশায় অদৃষ্টপূর্ব আশা এবং সংসারের নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের ভিতর নিরুপম শান্তি আনিয়া দিতেন। ঠাকুর যে, সকলের কি ভরসার স্থল ছিলেন তাহা বলিয়া বুঝানো দায়। মনোরাজ্যে তাঁহার যে কি প্রবল প্রতাপ দেখিয়াছি তাহা বলা অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—'মনের বাহিরের জড়-শক্তি সকলকে কোনো উপায়ে আয়ত্ত করে কোনো একটা অদ্ভুত ব্যাপার (miracle) দেখানো বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙ্গত, পিটত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না!' ['শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ১ম]

স্বামী অভেদানন্দ

॥ ১ ॥

পরিত্রাতা রামকৃষ্ণ ও তাঁর অপূর্ব বাণী

এই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মহান পরিত্রাতাগণের একজনের মুখের কথা হুবহু লিখে নিয়েছেন তাঁর এক শিষ্য। কথাগুলি মূল বাংলায় কথিত। শ্রীম নামক এক গৃহীভক্ত সেগুলিকে তাঁর ডায়েরীতে তুলে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের অনুরোধে শ্রীম সেই কথাগুলি ১৯০২-০৩ খৃস্টাব্দে বাংলায় দুইখণ্ডে কলকাতায় প্রকাশ করেন, নাম ছিল রামকৃষ্ণ কথামৃত।

ঐ সময় শ্রীম কথামৃতের যে ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন তার পাণ্ডুলিপি আমাকে প্রেরণ করেন এবং ঐ অনুবাদের সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে পত্র লেখেন। এই সঙ্গে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একটি ব্যক্তিগত চিঠির নকলও প্রেরণ করেন। [ঐ পত্রে স্বামীজী শ্রীমর কথামৃত পুস্তিকার প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন]……

শ্রীম-র অনুরোধে ঐ ইংরাজী পাণ্ডুলিপির বড় অংশের সম্পাদনা আমি করেছি, পুনর্বিন্যাসও করেছি ; বাকি অংশ সরাসরি বাংলা বই থেকে অনুবাদ করে নিয়েছি।…বর্তমান [ইংরাজি] সংস্করণের প্রতিটি শব্দকে আমি যথাসম্ভব মূলানুগ, সরল এবং মৌখিক ভঙ্গির রাখতে চেষ্টা করেছি।

কিছু-কিছু পুনরুক্তি ইচ্ছাপূর্বক রক্ষা করেছি—শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে তাঁর অনর্গল বাক্যপ্রবাহের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই ধরনের দৃষ্টান্তাদি প্রয়োগ করতেন তা দেখিয়ে দেবার জন্য।

পাশ্চাত্য জগতের সামনে গ্রন্থটি উপস্থিত করার কালে এই আন্তরিক আশা পোষণ করি, শ্রীরামকৃষ্ণের সুমহান শিক্ষা সত্যসন্ধানীদের সামনে অধ্যাত্মপথের নূতন দিগ্‌দর্শক হয়ে উঠবে এবং অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য সংগ্রামশীল মানবপ্রাণের নিকটে শান্তি ও মুক্তির আশ্বাস বহন করবে।

[কথামৃতের স্বামী অভেদানন্দ কৃত ইংরাজী অনুবাদের আমেরিকান সংস্করণের মুখবন্ধ থেকে অনূদিত]

॥ ২ ॥

ভারতবর্ষ অনেক বিরাট অধ্যাত্মনেতার জন্ম দিয়েছে যাঁরা মানবসমাজে পরিত্রাতারূপে স্বীকৃত এবং পূজিত। এঁদের প্রত্যেকের জীবন এবং চরিত্র ঈশ্বর-

পুত্রের [যীশুখ্রীস্টের] জীবনের মতোই অপূর্ব, অলৌকিক এবং দিব্য। এ'রা প্রত্যেকে সর্বপ্রকার ঐশ্বরিক গুণের প্রতিভূ, প্রত্যেকেই পুরাতন অধ্যাত্মসত্যের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারকারী, এ'রা এমন আধ্যাত্মিক বন্যা-তরঙ্গের স্রষ্টা যা ধর্মজগতকে প্লাবিত করেছে, কুসংস্কার এবং গোঁড়ামির বাধাকে অতিক্রম করেছে, ব্যক্তিসত্তার ধারাকে বাহিত করেছে ঈশ্বরসাগরের অভিমুখে।

বর্তমানে যে অধ্যাত্মতরঙ্গ প্রায় অর্ধপৃথিবীকে প্লাবিত করে আমেরিকার তট-প্রান্ত স্পর্শ করেছে, তার স্রষ্টা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—যীশুখৃস্ট সদৃশ এক দিব্য পুরুষ। এ'কে ভারতবর্ষ এখন অধ্যাত্মমহিমার আদর্শ অভিব্যক্তিরূপে পূজার্চনা করে। এ'র জীবন এমন অতুলনীয় ও অনন্যসাধারণ যে, এ'র দেহত্যাগের দশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে তা পরম বিস্ময়, সমাদর ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেছে—কেবল এ'র স্বদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক বিশিষ্ট ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয় 'ইম্পিরিয়াল এ্যাণ্ড কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রিকার জানুআরি ১৮৯৬ সংখ্যায়, শিরোনামা, 'এ মডার্ন হিন্দু সেণ্ট'। এই উৎকৃষ্ট রচনাটির লেখক অধ্যাপক সি এইচ টনী যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বহু বৎসর যাবৎ সংস্কৃতের অধ্যাপক, পরবর্তীকালে লণ্ডন ইণ্ডিয়া হাউসে প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক। এই প্রবন্ধটি অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাঁদের অন্যতম অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সমাদরের সঙ্গে 'নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী' পত্রিকার আগস্ট ১৮৯৬ সংখ্যায় এই হিন্দু সন্তপুরুষের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র প্রকাশ করেন, নাম 'এ রিয়্যাল্ মহাত্মন্।' এই বহুখ্যাত প্রবন্ধটিতেও (যা ভারত এবং ইংল্যাণ্ডে অনেক খৃস্টান মিশনারী ও থিওসফিস্টের অতি কঠোর সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল) অধ্যাপক-প্রবর থিওসফিস্টদের কাল্পনিক মহাত্মা এবং ভারতের যথার্থ মহাত্মাদের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করেছিলেন। ভারতের যথার্থ মহাত্মারা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি কার্যে ঈশ্বরচৈতন্যকে অভিব্যক্ত করে থাকেন। অধ্যাপক ম্যাকস্মুলার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিখেছিলেন, সেইসঙ্গে তিনি কোনো খৃস্টান পণ্ডিতের পক্ষে তথাকথিত হিদেন-ভূমির এক দিব্যচরিত্র সম্বন্ধে যে-সর্বোচ্চ প্রশস্তি করা সম্ভব তাই করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে তিনি 'রামকৃষ্ণ, হিজ্ লাইফ এ্যাণ্ড সেইংস্' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী আদর্শ ঐশ্বরিক চরিত্র সম্বন্ধে অধিকতর তথ্য এবং উপদেশাবলী সংকলিত ছিল।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এই বিরাট সন্তপুরুষ এবং 'যথার্থ মহাত্মার' মৌলিকতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন, যিনি কিন্তু কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে লালিত হননি, স্বীয় প্রজ্ঞাবারিকে কোনো গ্রন্থ বা শাস্ত্র থেকে আহরণ করেননি, তা এমন-কি

কোনো প্রাচীন আচার্যের কাছ থেকেও নয়—তাকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেছিলেন সর্বজ্ঞান এবং প্রজ্ঞার নিত্য উৎস থেকে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসমূহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত প্রশস্ত উদার এবং সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাব দর্শন করেও চমৎকৃত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং বাণী তথাকথিত ধর্মজগতে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে মৃত্যুপ্রহার ছাড়া অন্য কিছু নয়। যে-কেউ তাঁর উক্তিসমূহ পাঠ করেছেন, তিনি তাদের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মভাবের সার্বভৌমিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সেই আদর্শ সমগ্র মানব-সমাজে অবলম্বনীয় আদর্শ।

বাল্যকাল থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক মত-পথের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি একই সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন - সকল মত ও পথ দিয়েই পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, যেখানে ব্যাকুল ও আন্তরিক মানবাত্মারা বিভিন্ন পথ দিয়ে যাত্রা করে উপনীত হয়েছেন। বিভিন্ন মত ও পথ অনুসরণ করে, প্রত্যেক ধর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হয়ে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মানবসমাজকে এইভাবে অর্জিত তাঁর সর্ববিধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দান করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত প্রতিটি ভাব ঊর্ধ্বলোক থেকে সজীব সতেজ আকারে আবির্ভূত—তা মানববুদ্ধি, সংস্কৃতি, পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা বিকৃতিপ্রাপ্ত নয়। বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষপর্যন্ত তাঁর প্রতিটি কার্যই অনন্যসাধারণ। তাঁর জীবনগ্রন্থের প্রতিটি পর্ব যেন অদৃশ্য ঐশ্বরিক হস্ত কর্তৃক বিশেষভাবে লিখিত এক নূতন শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়—সে গ্রন্থ রচিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণ করার উপযোগীরূপে।···

বহু সংশয়বাদী এবং অজ্ঞেয়বাদীর কথা আমরা জানি যাঁরা কদাপি খৃস্ট, বুদ্ধ অথবা কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতাররূপে বিশ্বাস করেন নি, কদাপি ধর্মশাস্ত্রের আধিকারিক প্রামাণ্য স্বীকার করেন নি, উল্টোপক্ষে ধরে নিয়েছেন—খৃস্টসহ অন্য পরিত্রাতাগণের জীবন তাঁদের শিষ্যগণের কল্পনানির্ভর অতিরঞ্জিত বিবরণছাড়া কিছু নয়; শিষ্যগণ তাঁদের মানবদেহধারী গুরুকে অবতার তৈরী করতে ব্যস্ত ছিলেন। এই সকল সন্দেহবাদী এবং অবিশ্বাসিগণ রামকৃষ্ণের সম্মুখীন হয়ে, তাঁর অতিমানব জীবনদর্শন করে, এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে, খৃস্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ এবং অন্য অবতারগণের জীবন অবশ্যই সত্য এবং বাস্তব। সেই একই সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরা শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন করে তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা এমন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তাঁর সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেছেন, তাঁর পবিত্র পদধূলি চুম্বন করেছেন, অনুভব করেছেন যে, তিনি 'শৈলোপদেশ'-এর দেহধারী বিগ্রহ, পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতরণ, খৃস্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ এবং চৈতন্যের একদেহে আবির্ভাব। পূর্বেকার বিরাট অধ্যাত্ম-পুরুষগণের অপূর্ব চরিত্রে দিব্যশক্তির যে-সকল বিশেষ বিকাশ দেখা গিয়েছিল—

সংশয়বাদীরা দেখলেন, তার সকলই ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ঈশ্বরপুরুষের মধ্যে অভিব্যক্ত।

আমরা কি চমৎকৃত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিনি, কিভাবে সকল মহান ধর্ম-সমূহের অনুগামীরা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁদের দিব্য আদর্শের রূপ দর্শন করে-ছিলেন? আমরা কি দেখিনি, কিভাবে কোয়েকারগণ এবং রক্ষণশীল খৃস্টানগণ তাঁর সামনে নতজানু হয়ে তাঁকে খৃস্টরূপে অর্চনা করেছিলেন—যখন তিনি নাজারেথের যীশুখৃস্টের পুণ্যনাম শ্রবণমাত্রেই স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে ঊর্ধ্বচৈতন্যভূমিতে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন? যেসব মুসলমান পীর তাঁর দর্শনে এসেছিলেন তাঁরা তাঁর পবিত্র চরণে নত হয়ে তাঁর মধ্যে ইসলামের সর্বোচ্চ আদর্শের প্রকাশ দর্শন করেছেন। বৌদ্ধরা তাঁকে সম্বুদ্ধ মনে করেছেন। তিনি যখন শতশত বৈষ্ণবভক্তের দ্বারা পূজিত শ্রীচৈতন্যের সিদ্ধ আসনে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়েছিলেন তখন বৈষ্ণবচরণ ও শ্রীচৈতন্যের অন্য ভক্তগণ তাঁকে নদীয়ার মহাপ্রভুর পুনরাবির্ভাবরূপে স্তুতি করেছেন। কৃষ্ণ-পূজকগণ তাঁকে কৃষ্ণের অবতার বলতেন। শক্তি-উপাসকেরা অনুভব করেছিলেন স্বয়ং বিশ্বশক্তি তাঁর মধ্যে লীলারত। শৈবরা বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের জীবন্ত দেবতা। গুরু নানকের বিশ্বস্ত অনুগামী শিখেরা তাঁকে পবিত্র আচার্য মনে করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা তাঁর মধ্যে এইসকল শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করে, তাঁর বিরাটত্বে অভিভূত হয়ে, বিশ্বাস করেছেন যে, এই বহুমুখী ব্যক্তিত্ব পূর্ব-পূর্ব অবতারগণের সমষ্টিভূত জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা তাঁর কার্যাবলী এবং তাঁর বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, যিনি পূর্বে ছিলেন কৃষ্ণ, রাম, খৃস্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, তিনি এখন রামকৃষ্ণ। ভগবান রামকৃষ্ণ সর্বদাই এই সত্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে নিজের প্রিয় শিষ্যগণের কাছে, বৃহত্তর পৃথিবীর কাছেও, ঘোষণা করেছেন।...

রামকৃষ্ণের অপূর্ব মনস্বিতা ছিল। কোনো বস্তু বা কোনো ব্যাপারের আসল চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর ছিল তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি পৃথিবীর বিষয়াসক্ত মানুষের স্থূল মনকে গভীর অধ্যাত্মসত্যের উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারতেন; তাদের অনুভব করিয়ে দিতেন সুমহান আদর্শের সৌন্দর্য ও গরিমাকে। উচ্চারিত শব্দের মধ্যে তিনি নূতন জীবন-চেতনা দান করতেন যা শ্রোতাদের আত্মাকে স্পর্শে শিহরিত করত। জীবন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে, প্রাণের প্রকৃতি এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে, বিশ্বসৃষ্টির কারণ এবং মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ সম্বন্ধে, তাঁর মৌলিকতাপূর্ণ কথাকে শ্রোতারা পরম বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করত।...

দিব্যবাণী উচ্চারণের প্রহরগুলি আমাদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি সহস্র-সহস্র মানুষ যাঁকে আজ সর্বশেষ অবতাররূপে পূজা করছে তাঁর শক্তির লীলাবিকাশকে। ধন্য তাঁরা যাঁরা তাঁকে দর্শন করতে

পেরেছেন এবং তাঁর পুণ্য পদস্পর্শ করতে পেরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা পৃথিবীর সকল জাতি অনুভব করুক, ভাবী যুগসমূহে অনুরাগী ভক্তহৃদয়ে তাঁর দিব্যশক্তি প্রকাশিত হোক, এই তাঁর সন্তান ও সেবকের একান্ত প্রার্থনা।

[পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকা। অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক অনূদিত]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীম-কে লিখিত গিরিশচন্দ্রের পত্রাংশ ঃ

আমার সামান্য ধারণার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহলে আমি কেবল স্বামীজী মহারাজের [স্বামী বিবেকানন্দের] কথাগুলি পুরোপুরি সমর্থন করছি তাই নয়, তার সঙ্গে সমুচ্চকণ্ঠে যোগ করছি—গত তিন বৎসরে আমার ধারাবাহিক অসুস্থতার কালে কথামৃত আমার জীবনসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল।...সমগ্র মানবজাতি কালান্তকাল পর্যন্ত আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইল।

রামচন্দ্র দত্ত

ঠাকুরের উপদেশ বাক্যের কৌশল নয়

তাঁহার উপদেশে আমরা আস্তিক হইয়াছিলাম। উপদেশ অর্থে কেবল মুখের কথা নির্দেশ করিতেছি না। উপদেশ বলিলে আমরা যাহা সচরাচর বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ কতকগুলি বাক্যের কৌশল, এ উপদেশ সেরূপ নহে। আমরা যখন তাঁহাকে 'ঈশ্বর আছেন কি না' এইকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, "দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে একটিও তারা দেখা যায় না, সেইজন্য তারা নাই একথা বলা যায় না। দুগ্ধে মাখন আছে, দুগ্ধ দেখিলে কি মাখনের কোনো জ্ঞান জন্মে? মাখন দেখিতে হইলে দুগ্ধকে দধি করিতে হয়, পরে উহা সূর্যোদয়ের পূর্বে (ইচ্ছামতো সময়ে হইবে না) মন্থন করিলে, মাখন বাহির হইয়া থাকে। যেমন বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে হইলে, অগ্রে যাহারা তাহাতে মাছ ধরিয়াছে তাহাদের নিকটে, কেমন মাছ আছে, কিসের টোপে খায়, কী চার প্রয়োজন, এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যে-ব্যক্তি মাছ ধরিতে যায়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় সিদ্ধমনোরথ হইয়া থাকে। ছিপ ফেলিবামাত্র মাছ ধরা যায় না, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পরে সে 'ঘাই ও ফুট' দেখিতে পায়। তখন তাহার মনে মাছ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং ক্রমে মাছ গাঁথিয়া ফেলে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই

প্রকার। সাধুর কথায় বিশ্বাস, মন-ছিপে, প্রাণ-কাঁটায়, নাম-টোপে, ভক্তি-চার ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ঈশ্বরের ভাবরূপ 'ঘাই ও ফুট' দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে।" আমরা ঈশ্বরই মানিতাম না, তাঁহার রূপ দেখা যাইবে, একথা কে বিশ্বাস করিবে? আমাদের এই ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর নাই। যদি থাকেন, আমাদের ব্রাহ্ম পণ্ডিতদিগের মতে তাহা নিরাকার; ব্রাহ্মসমাজে বেড়াইয়া তাহা শুনিয়া রাখিয়াছিলাম। বিশ্বাস হইবে কিরূপে? পরমহংসদেব আমাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয়। যাঁহার মায়া এত সুন্দর ও মধুর, তিনি কি অপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন? দেখিতে পাইবে।" আমরা কহিলাম, "সব সত্য; আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারিবে? কিন্তু এই জন্মে কি তাঁহাকে পাওয়া যাইবে?" তিনি বলিলেন, "যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল কেবল প্রত্যয়।" এই বলিয়া একটি গীত গাহিলেন,

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়।
কালী-পদ সুধাহ্রদে, চিত্ত ডুবে রয়।
(যদি চিত্ত ডুবে রয়)
তবে, জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়।"

তিনি পুনরায় বলিলেন, "যেদিকে যত পা যাওয়া যায়, বিপরীত দিক তত পশ্চাৎ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ পূর্বদিকে দশহাত গমন করিলে পশ্চিমদিকের দশহাত পশ্চাৎ হইবেই হইবে।" আমরা তথাপি বলিলাম যে, "ঈশ্বর আছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ কিছু না দেখিলে, দুর্বল অবিশ্বাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।" পরমহংসদেব বলিলেন, "সান্নিপাতিক রোগী এক পুকুর জল পান করিতে চায়, এক হাঁড়ি ভাত খাইতে চায়, কবিরাজ কি সে-কথায় কখনো কান দেন? আজ জ্বর হইয়াছে, কাল কুইনাইন দিলে কি জ্বর বন্ধ হয়? না, ডাক্তার রোগীর কথায় তাহা ব্যবস্থা করিতে পারেন? জ্বর পরিপাক পাইলে ডাক্তার আপনি কুইনাইন দিয়া থাকেন, রোগীকে আর কিছু বলিতে হয় না।"...

কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব অধিক লেখাপড়া জানিতেন না। একথা বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে বলা হইল। সংস্কৃত জানিতেন না; কিন্তু সকলপ্রকার সংস্কৃত শ্লোক তিনি বুঝিতে পারিতেন। কেবল বুঝা নহে, তাহার গূঢ় তাৎপর্য বাহির করিয়া দিতেন। ইংরাজী জানিতেন কিম্বা অন্য কোনো ভাষা জানা ছিল, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। এই পাণ্ডিত্যে কি দর্শন, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনো-বিজ্ঞান, কি ধর্মতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব, তাঁহার নিকট কোনো তত্ত্বেরই অভাব ছিল না। যে-ব্যক্তি মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাহাকে অন্য কোনো কথা কহিতেন না।

যে জড়বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাহাকে তাহারই উপদেশ দিতেন। এই প্রকার পাত্র বিচার করিয়া উপদেশ দেওয়া মনুষ্য-শক্তির বহির্ভূত কথা। কেবল তাহা নহে, তিনি সময়ে-সময়ে শাস্ত্রের মীমাংসাও করিয়া দিয়াছেন। একদা অধরলাল সেন কাশীপুরের মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত তন্ত্রের কোনো শ্লোক লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। মহিমবাবু এবং তাঁহার বাটীস্থ জনৈক পণ্ডিত সেই শ্লোকের এক প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন, অধরবাবু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ করেন। পরস্পর অমিল হওয়াতে সে ক্ষেত্রে কোনো প্রকার মীমাংসা হইল না। অধরবাবু তথা হইতে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিয়া সেকথা কিছুই উত্থাপন করিলেন না। কারণ, পরমহংসদেব শাস্ত্রপাঠ করেন নাই, তাহা তাঁহার অধিকার বহির্ভূত, এই বিশ্বাস ছিল। অধরবাবু বসিয়া আছেন, এমন সময় পরমহংসদেবের ভাবাবেশ হইল। তিনি অধরবাবুকে ডাকিয়া সেই শ্লোকগুলির সমুদায় অর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। অধরবাবুর আর আশ্চর্যের সীমা রহিল না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, পরমহংসদেবের কখনও শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইত না। এইপ্রকার শক্তির বিকাশ হইলে তিনি বলিতেন, "যেমন ছাদের জল নল দিয়া পড়ে, কখনও বাঘের মুখ কিম্বা স্থানান্তরে কুকুর অথবা মানুষের মুখের ভিতর দিয়া বাহির হয়; নিম্ন হইতে ছাদের জল দেখা যায় না, কেবল যাহা দিয়া জল পড়ে, তাহাই দেখা যায়; লোকে মনে করে যে, বাঘের মুখের ভিতর দিয়া জল আসিতেছে, তেমনি হরিকথা যাহা বাহির হয়, তাহা হরিই বলেন; আধারটি বাঘ-মুখ বিশেষ নলমাত্র।" পরমহংসদেবের পক্ষে একথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, তাহাতে তিলাংশ সন্দেহ নাই।

[রামচন্দ্র দত্ত লিখিত 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' থেকে সংকলিত]

অক্ষয়কুমার সেন

"লীলা দরশনে শক্তিযুক্ত একজনা"

সুন্দর সংসারী ভক্ত গুণের আধার, এইবারে উপনীত মহেন্দ্র মাস্টার ॥
বৈদ্য-কুলোদ্ভব গুপ্ত উপাধি তাঁহার, বয়স তিরিশ কিংবা কিছু তার পার ॥
কান্তিমাখা মুখখানি গঠন অতুল, যেন গরবেতে ফোটা গোলাপের ফুল ॥
পরিপাটি আঁখি দুটি ভাতি খেলে তায়, দীপ্তিমান বয়ানে পরম শোভা পায় ॥
মিষ্টিমাখা কোমলতা সর্বাঙ্গে বিরাজে, প্রকৃতি প্রকৃত যেন পুরুষের সাজে ॥
গোউর বরণে দেহখানি শোভমান, মিষ্টকণ্ঠ বীণায় যেমন বাজে গান ॥
রূপে কিংবা গুণে তাঁর নাহিক তুলনা, ইংরেজরাজের ভাষা বিশেষিয়া জানা ॥
প্রখর গম্ভীর বুদ্ধি ঘটেতে বিরাজ, উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ ॥

শ'দরে আদরে মাসে মাসে মাহিয়ানা, শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য একজনা ॥
পরিচিত অনেকের, আবাস শহরে, সংসারে অনেকগুলি বাস একত্তরে ॥
সংসারের যেন রীতি সদা পরমাদ, পরস্পর অমিলন কলহ বিবাদ ॥
এমন বিবাদ হয় একবার ঘরে, সাধ্য নহে একতিল বাস তথা করে ॥
বড়ই অশান্তি মনে মাস্টার আপনি, রাত্রিকালে লয়ে সঙ্গে নন্দন-নন্দিনী ॥
পরিহরি আপনার ভিটামাটি ঘর, চলিলা ভগিনী-বাড়ী বরাহনগর ॥
পরের আবাসে কার সুখ কোথা থাকে, তবে যে রহিলা খালি পড়িয়া বিপাকে ॥
দিবারাতি দহে হৃদি শান্তির কারণ, বিকালে গঙ্গার কূলে করে বিচরণ ॥
পরম আত্মীয় এক রহে সাথে সাথে, পরস্পরে কথাবার্তা কতই দোঁহাতে ॥
একদিন বন্ধুবর কহিল তাঁহারে, দক্ষিণ-শহর গ্রাম অনতি অন্তরে ॥
জাহ্নবীর তীরস্থিত মনোহর স্থান, সেইখানে আছে এক সুন্দর বাগান ॥
পরিপাটি কালীবাটী তাহার ভিতরে, দরশনে প্রাণ-মন মোহে একেবারে ॥
জনৈক মহাত্মা তথা করিছেন বাস, সেই হেতু সেখানের গরিমা-প্রকাশ ॥
সৎ-তত্ত্বালাপে তেঁহ মত্ত অনুক্ষণ, শুনিবারে কতই লোকের সমাগম ॥
মন-বিমোহন মূর্তি আনন্দ-আধার, এক মুখে মহিমা-কাহিনী কহা ভার ॥
লোকেতে পরমহংস নামে তাঁরে কয়, শ্রীপ্রভুর এইমাত্র দিল পরিচয় ॥
কানেতে পশিল যেন শ্রীপ্রভুর নাম, দেখিবারে অমনি অধীর হৈল প্রাণ ॥
বন্ধুবরে বলিলেন মাস্টার অধীর, এইক্ষণে যাইবার দিন করো স্থির ॥
বিগত হইলে রাতি বন্ধুবর বলে, স্থিরতর যাইব যামিনী পোহাইলে ॥
বহুকষ্টে গেল রাতি অতি দীর্ঘতর, দিনমানে চলিলেন মহেন্দ্র মাস্টার ॥
ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া প্রভুর, মনের অশান্তি যত সব গেল দূর ॥
নেহারিয়া ভক্তবরে প্রভুর আমার, অন্তরে বহিল জোরে সুখের জোয়ার ॥
লীলা-কাজে সাজা সাজ বাহ্যিক লক্ষণে, লুকায়ে রেখেছে তাঁয় সাধ্য কার চিনে ॥
অপরিচিতের মতো প্রভুর জিজ্ঞাসা, নাম ধাম মাস্টারের কিবা কাজে আসা ॥
সরল বিনীত নম্র সদ্‌গুণাশ্রয়, ধীরে ধীরে মাস্টার দিলেন পরিচয় ॥
মাস্টার নিজের তাঁয় বড় ভালবাসা, বিবাহ হয়েছে কিনা দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ॥
মৃদুস্বরে উত্তরে মাস্টার তাঁরে কয়, বহুদিন হইল হয়েছে পরিণয় ॥
তৃতীয় জিজ্ঞাসা প্রভু করিলেন পরে, বিদ্যা কি অবিদ্যাশক্তি বিয়া কৈলা যারে ॥
তাহার উত্তরে কন মাস্টার ধীমান, আমার বিদিত তেঁহ বড়ই অজ্ঞান ॥
প্রভুদেব মাস্টারের এই কথা শুনি, "তুমি বড় জ্ঞানবান" বলিলা অমনি ॥
শ্লেষবাক্য শ্রীপ্রভুর করিয়া শ্রবণ, পুনঃ আর মাস্টারের না সরে বচন ॥
কি জানি কি ভাবে মন ডুবিল তাঁহার, যাহাতে হইল বন্ধ বাক্যের দুয়ার ॥
তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাস্টারের হেন তেজ ধরে, অনায়াসে পশে গূঢ় তত্ত্বের ভিতরে ॥
প্রখর অন্তর-দৃষ্টি সহকারে চলা, সাত চাল ভেবে তবে এক চাল চালা ॥

মাস্টারের কথা মোরে যদি কেহ পুছে, উত্তরে কেবল, আমি পশু তাঁর কাছে ॥
পাইয়া স্বাতীর বারি ঝিনুক যেমন, গভীর অগাধ জলে হয় নিমগন ॥
সেইমত ডুবিলেন মাস্টার এখানে, সহজে না ফুটে আর বচন বদনে ॥
অন্তরঙ্গ শ্রীপ্রভুর তাহার লক্ষণ, একবার দরশনে মুগ্ধ প্রাণ-মন ॥
বিশ্বাসের একটানা মহাবেগে ধায়, সেতু সন্দেহের গন্ধ না উঠিল তায় ॥
যেমন মাস্টার তার তেমতি ঘরণী, পাইলে চরণরজঃ মহাভাগ্য মানি ॥
ভক্তিমতী ভাগ্যবতী অতুল ভুবনে, মহাশক্তি সানুকূল যাঁহার স্মরণে ॥
আছে বহু ভক্তিমতী হেন কেহ নয়, জগৎজননী মাতা এতই সদয় ॥
অতি প্রিয় শ্রীপ্রভুর মাস্টার কেমন, ক্রমে ক্রমে পুঁথিতে পাইবে বিবরণ ॥
বিকাইয়া প্রাণমন প্রভুর চরণে, ফিরিলেন মাস্টার নিজের বাসস্থানে ॥
প্রভুর অন্তরে হেথা আনন্দ না ধরে, অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত পাইয়া মাস্টারে ॥
রাখাল নরেন্দ্র আদি যত ভক্তগণে, পাইয়া শ্রীপ্রভুদেব নিজ সন্নিধানে ॥
জনে জনে বলিলেন মহোল্লাস মন, আদি অন্ত মাস্টারের যত বিবরণ ॥
এখানে মাস্টার ঘরে বড়ই চঞ্চল, পুনঃ প্রভু দরশনে বাসনা প্রবল ॥
ঘরে নাহি রহে মন উড়ু উড়ু করে, পরদিনে উপনীত প্রভুর গোচরে ॥
দেখিয়া তাঁহায় প্রভু ভক্তগণে কন, পুনরায় আজি আসিয়াছে সেইজন ॥
লুকাইয়া পা দুখানি ঢাকিয়া বসনে, বসিলা মাস্টার শ্রীপ্রভুর সন্নিধানে ॥
ভক্তমনোবিমোহন শ্রীপ্রভু আমার, খুলিয়া দিলেন তত্ত্বকথার ভাণ্ডার ॥
আপনার ভাবে প্রভু আপনে মোহিত, অবশেষে ধরিলেন সুমধুর গীত ॥
মোহনীয়া গানে ঝরে এতই মাধুরী, যাহাতে অজান্তে করে মন প্রাণ চুরি ॥
যে শুনে যতই গান তত বাড়ে সাধ, ভাবে সুরে যুক্ত গীত মন-ধরা ফাঁদ ॥
মাস্টারের মন প্রাণ একেবারে হারা, দেহখানি লইয়া কেবল নাড়া-চাড়া ॥
বাহিরে আইলা পরে ফিরিবারে ঘরে, যাই যাই চেষ্টা, ঠাঁই ছাড়িতে না পারে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু তোলাপাড়া মনে, বিমোহিত বিচরণ করেন উদ্যানে ॥
সংগীত এতই দূরে লাগিয়াছে মিঠে, পুনশ্চ শ্রবণে আশ যদি ভাগ্যে ঘটে ॥
প্রভুর নিকটে ধীরে ধীরে আর বার, উপনীত মুগ্ধমন মহেন্দ্র মাস্টার ॥
ভক্তিভাবে প্রভুদেবে কৈল অবধান, আজি কি হইবে আর আপনার গান ॥
এখানে হবে না আজি, প্রভুর উত্তর, যাব কালি কলিকাতা শহর ভিতর ॥
বলরাম বসু এক তাঁহার ভবনে, বাগবাজারেতে বাস অনেকেই জানে ॥
শুনিতে পাইবে গীত যাইলে তথায়, এত শুনি লইলেন মাস্টার বিদায় ॥
চরণ না চলে ঘরে ছাড়িয়া উদ্যান, পূর্ববৎ পুনরায় বাগানে বেড়ান ॥
মনে মনে নানাবিধ করিয়া বিচার, প্রভুর নিকটে ফিরে আইল মাস্টার ॥
জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে যাইব কেমনে, জমিদার বলরাম বসুর ভবনে ॥
অভয় প্রদানে বলিলেন শ্রীগোঁসাই, দ্বারে প্রবেশিতে কোনো ভয় বাধা নাই ॥

যথাকালে উপনীত হইলে তথায়, আপনি লইব আমি ডাকিয়া তোমায় ॥
পাইয়া অভয় এবে মাস্টার সুজন, সেদিনে ভবনে করিলেন আগমন ॥
যথা কথা মিলিলেন তার পরদিনে, মহাভক্ত বলরাম বসুর ভবনে ॥
অপূর্ব শ্রীপ্রভুদেবে হেরি বারবার, পাদপদ্মে মজিলেন মহেন্দ্র মাস্টার ॥
তন্ত্রমন্ত্র প্রভুবাক্য, প্রভু ধ্যানজ্ঞান, শ্রুতিরুচিকর অতি প্রভুর আখ্যান ॥
প্রভু-সঙ্গ-সুখ-আশা চিত্তে নিরন্তর, কোথায় কখন প্রভু রাখেন খবর ॥
কোথা কি করেন প্রভু কোথা কিবা কন, মত্তভাবে তত্ত্ব তার রাখা বিলক্ষণ ॥
শ্রীবদন-বিগলিত প্রত্যেক অক্ষর, বিশ্বাস গিয়ান বেদাপেক্ষা গুরুতর ॥
অধর-কপাট বন্ধ করিয়া আপনে, লিপিবন্ধ করেন পরম সংগোপনে ॥
অতি প্রিয় শ্রীপ্রভুর অন্তরঙ্গ জন, ভাবে মুগ্ধাকৃতি ভক্ত প্রভুর বচন ॥
বিভূতির চাপরাশ অঙ্গে আছে তাঁর, করিবারে শ্রীপ্রভুর মহিমা প্রচার ॥…
কথামৃত পূজনীয় মাস্টারের লেখা। মাস্টার বলিলে পরে অন্য কেহ নয়।…
মহেন্দ্র মাস্টার নামে প্রভুভক্ত যিনি, যতখানি জমি তাঁর বুদ্ধি ততখানি ॥
আট চাল ভাবিয়া চালেন একচাল, মানুষে সহজে তাঁর না পায় নাগাল ॥
জন্ম গুঁয়াইলে কাছে নাহি যায় চেনা, লীলা-দরশনে শক্তিযুক্ত একজনা ॥…
অতি অন্তরঙ্গ গণি, মহেন্দ্র মাস্টার যিনি, প্রভু পদপঙ্কজে ভ্রমরা।
উলট পালট কোষে, মধু পিয়ে শুষে শুষে, মুখে নাই গুন্‌গুন্‌ সাড়া ॥…

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি থেকে সংকলিত]

২. ভারত ও বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে

হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন সুরামত্তের ন্যায়—সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গূঢ় গভীর আধ্যাত্মিক কথায় সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন…

তাঁহার বাক্যে এমন মধুরতা ও চরিত্রে স্বর্গীয় আকর্ষণ যে, তাঁহার নিকট বসিলে উঠিতে ইচ্ছা হইত না, ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ থাকিত না…

তিনি নিজ আত্মাকে উন্মোচন করে দিতেন অনর্গল আধ্যাত্মিক বাক্যধারায়…আলোকের বন্যা যেন…

তাঁহার সান্নিধ্যে ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, পরম তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি না হইলে বিশ্বসংসারের সমস্যা কাহারও নিকট এত সহজ হয় না…

দীর্ঘ আট ঘন্টা ধরে রামকৃষ্ণের বাক্যধারা অবিরাম প্রবাহিত, যেমন বইছিল গঙ্গার ধারা তরঙ্গভঙ্গে…

ধর্ম সংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের সর্বোচ্চ কল্পনার পূর্ণ সিদ্ধি তিনি…

তিনি জাগাইয়াছেন ঘুমন্ত আরণ্য-সৌন্দর্যের নির্ঝরগুলিকে, আনিয়াছেন সমুদ্র-শৈবালের সুমিষ্ট গন্ধ, মহাসমুদ্রের লবণাক্ত স্বাদ…

কদাপি কোনো ধর্মাচার্যের যথেচ্ছ উক্তিগুলি এমন বিশ্বস্ততার সঙ্গে লিখিত হয়নি…

তিনি গ্রীকদেবতা প্রোটিয়াসের প্রাণশক্তিসম্পন্ন।…প্রাচীন দৈববাণী, সক্রেটিস, কনফুসিয়াস ও ডাঃ জনসনের সম্মিলন…

তাঁর কথা উপনিষদ তুল্য।…তাঁর থেকে গীতার গভীরতর ব্যাখ্যা আর কেউ করেনি…

রামকৃষ্ণের শিক্ষা-ভিন্ন এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তার সৌধ নির্মিত হতে পারত না…

এক নগণ্য স্কুল মাস্টার কি জেনেছিলেন—তাঁর সঙ্গে একদিন বসওয়েলের তুলনা করবেন অলডাস হাক্সলি…

কেশবচন্দ্র সেনের পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তি প্রসঙ্গ

We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful.

[*The Indian Mirror*, March 28, 1875]

তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের] সহিত আলাপ করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়।··· মনুষ্যের সাধনের বল এবং ঈশ্বরের করুণাবল সম্বন্ধে তাঁহার একটি দৃষ্টান্তকথা আমরা এখানে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় যাহার সম্পূর্ণ নির্ভর সে বিড়ালের বাচ্চা, আর সাধনের বলের উপর যাহার নির্ভর সে হনুমানের বাচ্চা। বিড়ালের বাচ্চা কেবল মেও-মেও করিয়া ডাকিতে জানে, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া কোথায় ফেলিবে তাহা সে জানে না। আর যে হনুমানের বাচ্চা সে মাতৃবক্ষস্থল প্রাণপণ যত্নে ধরিয়া থাকে, তাহার মাতা তাহাকে পেটের নীচে রাখিয়া যেখানে-সেখানে দৌড়িয়া যায়। রামকৃষ্ণ বলেন, আমি বিড়ালের ছানা, কেবল মেও-মেও করিয়া ডাকিতে জানি। আর একটি উৎকৃষ্ট কথা এই যে, শিশু যখন রাঙা লাঠি পাইয়া ভুলিয়া খেলা করে মাতা তখন গৃহকার্য করিতে থাকেন, যদি সে কাঁদিয়া ওঠে অমনি মাতা সকল কাজ ফেলিয়া তাহাকে কোলে গ্রহণ করেন। সংসারাসক্ত মনুষ্য বালক-সমান, ঈশ্বর তাহার জননী, যাই সে মাতার জন্য কাঁদিবে অমনি তিনি তাহাকে দেখা দিবেন। যখন সে সংসাররূপ রাঙা লাঠি লইয়া খেলা করিতেছে তখন মাতা বলেন—ও খেলা করিতেছে করুক, আমি এখন অন্য কাজ করি।

একজন লোক লেখাপড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কতদূর ধার্মিক হইতে পারে রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভাবের ভাবুক পাইলে তিনি মন খুলিয়া অনেক নূতন কথা বলেন। ['ধর্মতত্ত্ব', ১৪ মে, ১৮৭৫]

বিগত ৩১ ভাদ্র বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে ২৫/৩০ জন ব্রাহ্ম সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বর-প্রেম ও মত্ততা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন স্বর্গীয় মধুর ভাব আর কাহার জীবনে দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে "ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্য লৌকিকাঃ, নৃত্যন্তি গায়ন্ত্য-

নৃশীলয়ন্ত্যজং ভর্বন্তিতৃষ্ণীং পরমেত্য নিবৃত্তাঃ।” “ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখনো রোদন করেন, কখনো হাস্য করেন, কখনো আনন্দিত হয়েন, কখনো অলৌকিক কথা বলেন, কখনো নৃত্য করেন, কখনো তাঁহার নাম গান, করেন, কখনো তাঁহার গুণকীর্তন করিতে-করিতে অশ্রু বিসর্জন করেন।” পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি সেদিন ঈশ্বর দর্শন ও যোগ প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে-বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে-করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, সুরামত্তের ন্যায়, শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন. সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হয়, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যায়। [‘ধর্মতত্ত্ব’, ১লা অক্টোবর ১৮৭৯]

There was a large gathering of our friends at Dakhineswar, on Tuesday last, to pay their respects to the Venerable Paramhansa. The party proceeded in a steamer, and reached the place at about 5-30 P.M. Others had assembled earlier. Altogether there were more than eighty persons present. The conversation, which was deeply spiritual and instructive, lasted over an hour ... It was a pleasent evening, and showed how highly the Paramhansa is esteemed by all classes of the Native community. His liberality is indeed a great attraction. One of the most noteworthy things he said the other day was that he believed in the identity of Janak and Nanac. After the death of the former the Lord blessed his spirit, and expressed His joyful appreciation of the Rishi's life. Greatly pleased, He said to him to the following effect,—'Well done, good Rishi. Thou hast sanctified many by the purity and asceticism, and by the noble example of a self-denying king thou hast set. So good a teacher, thou shalt not sleep in heaven, but thou shalt go again into the world. Thy services, O Janak, are required in the Punjab. Go there, harmonize the scriptures, and draw together hostile sects. O thou apostle of union and reconciliation." In this anecdote one cannot fail to notice the doctrine of unity which forms the

corner-stone of the New Dispensation.

[*The New Dispensation*, 26 May, 1881]

In the course of an antimated conversation with our devotees, the Paramhansa of Dakhineswar lately expanded the Hindu doctrine of Trinity. He spoke of "Bhagaban," "Bhagavat" and "Bhakta" as three entities, yet one in essence,—the mysterious three in one. The first signifies the Godhead ; the second, Scripture or Word ; the third, Devotee or Saint.

[*The New Dispensation*, 7 July 1881]

আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে, আমরা যেমন ঘর, বাড়ী, ধন, মানের কথা কহি ও সর্বদাই সেই সমস্ত চিন্তা করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতন সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতন হন। তিনি কখনো হরি বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ন্যায় নৃত্য করেন, কখনো মা কালী বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শক্তি-ধর্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখনো-কখনো পুরাতন যোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান। যখন যে ভাব তাঁহার মনে প্রবল হয়, তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া বাহ্যজ্ঞান আর রাখিতে পারেন না। একখানি তক্তার মতন তাঁহার সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া তাঁহার বাহ্যজ্ঞান চলিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার আত্মা ভাব-সমুদ্রে লীন হইয়া যায়। তিনি নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী দুই। কিন্ত তিনি সর্বদা বলিয়া থাকেন, মাটির হস্ত-পদ-বিশিষ্ট কালী অথবা কৃষ্ণেতে তিনি মত্ত হন না। তাঁহার কালী কৃষ্ণ নিরাকার, চিন্ময়, কেবল আত্মাতেই উদয় হন। তিনি আরও বলেন, নিরাকার ঈশ্বর সমুদ্রবৎ, কিন্তু সেই চিন্ময় সমুদ্রের এক-একটি চিন্ময় ভাব-রূপ লহরী হয়, সেই লহরী সাকার ঈশ্বর। সম্প্রতি তিনি কলকাতায় একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই হরিনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন। সেদিন আমাদিগের সহিত একখানি ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়া তাঁহার সাধন অবস্থায় জীবনের কয়েকটি পরীক্ষার কথা বলিয়া সকলকে অবাক করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, আগে-আগে রাত্রিতে তিনি আপনাকে কাল বিড়ালের বাচ্চা মনে করিয়া ভাবিতেন যে, তিনি মা'র কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া আছেন এবং মা'র কাছে মিউমিউ করিয়া ডাকিতেন, তাঁহার মাও প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গা চাটিতেন ও স্নেহভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন, সে সময়ে তিনি অত্যন্ত সুখে রাত্রি কাটাইতেন।

কখনো-কখনো আপনাকে স্ত্রীলোক মনে করিতেন এবং স্ত্রীভাবে অত্যন্ত প্রেমে সেই পতির সহিত কথাবার্তা কহিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কখনো-কখনো দেখিতেন, ব্রহ্মরূপ সমুদ্র আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইল, তিনি মনে করিতেন যেন তিনি সচ্চিদানন্দ-রূপ জলে ডুবিয়া রহিয়াছেন, যখন এইভাবে থাকিতেন, তাঁহার আহারাদি বাহ্য ক্রিয়া দূরে যাইত, একটু এইভাব কমিলে তিনি আপন পরিচারককে বলিতেন, এইবেলা আমাকে আহার দেও, সে-ভাব এখন আমার কমিয়াছে। কিন্তু বলিতে-বলিতে বানের জলে পড়িলে নিরাশ্রয় মনুষ্যের অবস্থা যেরূপ হয়, তাঁহারও অবস্থা সেইরূপ হইত। অমনি ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যেন বান ডাকিত এবং তাঁহার নিরাশ্রয় আত্মাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি আবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। এইরূপে ভগবান তাঁহাকে লইয়া নানাভাবে ক্রীড়া করিতেন। তিনি সেদিন একবার ষ্টীমারে বসিয়াছিলেন, একজন একটি দূরবীন আনিয়া তাহার ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে বলিলেন : তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এখন আমার মন ব্রহ্মের ভিতর ডুবিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে, তোমার ও এমনই কি জিনিস যে তাঁহার ভিতর হইতে মন উঠাইয়া লইয়া উহার ভিতর দিব। পরমহংস মহাশয়ের নিকট আমরা এত উচ্চ-উচ্চ এবং নূতন-নূতন কথা শুনিতে ও ভাব দেখিতে পাই যে, তাহার সকল লিখিতে গেলে তাহাতেই "সুলভ" পরিপূর্ণ হয়। অদ্য আমরা তাঁহার উপরিউক্ত কয়টি কথা উপহারস্বরূপ পাঠক মহাশয়দিগকে দিতেছি, ভরসা করি এগুলি গ্রাহ্য হইবে। ['সুলভ সমাচার', ৩০ জুলাই ১৮৮১]

Tuesday last, [Ramakrishna] as usual spoke wisdom and love, sang and danced with joy. Rich and varied were the illustrations which he used. Some of these we shall cite for the reader's benefit. [*The New Dispensation*, 9 September, 1881]

He regains his consciousness little by little and when he is half awake begins the conversation as edifying in its nature as it is marked by all the humour and humility that characterizes a genuine son of God. One thing is remarkable about his discourses. He never states many propositions, but the largest portion of what he says is taken up with illustrations. And what illustrations they are ! Facts drawn from the commonest incidents of life, familiar sights and commonplace details are combined and enlarged upon with such infinite sagacity and

humour as suffice to suggest, as soon as you have taken your seat before him for a few minutes, that you are before no ordinary person.

[*The Indian Mirror*, 9 October 1881]

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মহাশয় কথায়-কথায় বলিলেন, শকুনি এবং নীতি-বিহীন পণ্ডিতেরা সমান। শকুনিরা আকাশের খুব উচ্চস্থানে উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু সেখান হইতে পৃথিবীর কোথায় কোন্ ভাগাড়ে বা শ্মশানে মরা গরু বা মানুষ পড়িল তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করে, এবং একটি মড়া দেখিতে পাইলেই অমনি নামিয়া আসিয়া তাহার উপর পড়ে। নীতি ও ধর্মহীন পণ্ডিতেরা জ্ঞানাকাশের খুব উচ্চস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান কিন্তু সেখানেও তাঁহাদের দৃষ্টি সংসার ও পাপের প্রতি স্থির থাকে। একটি পাপ ও প্রলোভন আসিলেই মনের সাধে পাপরূপ পচা মড়া খাইয়া আপনাদের ঘৃণিত অবস্থার পরিচয় দেন।

[সুলভ সমাচার, ২৯ অক্টোবর, ১৮৮১]

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা ক্রমেই চিনিতেছেন। তাঁহারা কেহ-কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত ধর্মকথা ও কীর্তনাদি শুনাইয়া সুখী করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা দ্বারা কলিকাতার হিন্দুসমাজে ধর্মভাব জাগ্রত হইতেছে। বিগত শনিবার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। তিনি ভাবে বিভোর ও উন্মত্ত হইয়া অনেকগুলি গূঢ়-গূঢ় ধর্মকথা বলিয়াছিলেন। তিনি এই একটি কথা বলিলেন যে, পরমাত্মা জীবাত্মার অতি নিকট রহিয়াছেন তথাচ জীবাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সেকথা এইরূপে বুঝাইলেন যে, রামচন্দ্র পরমাত্মাসদৃশ, সীতাদেবী মায়া, ও লক্ষ্মণ জীবাত্মার অনুরূপ। জীবাত্মার প্রতিরূপ লক্ষ্মণ পরমাত্মার ঠিক পশ্চাতেই যাইতেছেন, কিন্তু কেবল মায়ারূপী সীতার ব্যবধানেই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না ; যখনই সীতা একটু পাশ দেন তখনই তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন। আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি সুন্দরভাবে বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন যে, পরমাত্মা চুম্বকসদৃশ, জীবাত্মা লৌহশলাকার ন্যায়। চুম্বক স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার গুণেই লৌহকে আকর্ষণ করে কিন্তু লৌহে কাদা মাখানো থাকিলে তাহার উপর চুম্বকের যেমন কোনো বল খাটে না, তদ্রূপ আত্মা কর্দমে পূর্ণ থাকিলে তাহা পরমাত্মার নিকট যাইতে সক্ষম হয় না। কিন্তু অনুতাপের অশ্রুজলের দ্বারা সেই পাপরূপ কর্দম ধৌত হইলে, অনাবৃত লৌহসম আত্মা আপনাআপনিই পরমাত্মারূপ চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়।

['সুলভ সমাচার' ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮১]

Paramhansa of Dakhineswar is serving as a marvellous connecting link between the Hindus and the Brahmos of the new dispensation···Learned pandits, educated youths, orthodox Vaishnavas and yogis gather in numbers, some from curiosity, some for the sake of Sadhu Sangha or good company, others for acquiring wisdom and joining the Kirtan. We have invariably found on such occasions an outburst of living devotional enthusiasm—a mighty wave of rapturous excitement—sweeping over the whole audience. The effect is wonderful. Theological differences are lost in the surging wave of love and rapture. What this spiritual fusion and loving union may lead to in the end who can divine ? The ways of the Lord are past finding out.

[*The New Dispensation*, 8 January 1882]

Two GREAT MINDS—The venerable Paramhansa lately paid a visit to the eminent philanthropist and scholar, Vidyasagar. Why did he call ? What earthly or unearthly advantage did that recluse expect from such a visit ? The Paramhansa has a passion for great minds. His curiosity to see distinguished men is most ardent. He is ever asking his friends to show him great things, and in this he is at times most importunate. Now he is off to see a lion. Now his heart is bent on witnessing steam force as it propels a steam launch up the river. He is impatient to have a look at a cathedral with its prayerful thousands. And as among beasts and things inanimate he would honor the great so also among the human species Curiosity alone, deep and impulsive, led the devotee of Dakhineswar to Vidyasagar's house in Calcutta. No prospect of earthly good actuated him.

Eminent sage, said the devotee, I come as a little muddy stream into the vast deep sea ['sagar'].

Yes, replied Vidyasagar, but you must remember, venerated sire ; that the sea is full of salt water, and if a fresh water

stream mixes with it, it too becomes salt, and loses all its sweetness.

It is not *avidya* sagar, which indeed is to be shunned, but *Vidya* sagar that draws me into its welcome waters ;—was the rejoinder.

But the sea hath its dangers and perils, said Vidyasagar, and thousands of monsters hide themselves in its treacherous waters.

Are there no pearls in the deep water of the sea ? In search of those pearls I am here. The sea is famous for its hidden treasures. Great is your value, Vidyasagar. So said Paramhansa. [*The New Dispensation*, 3 September 1882]

একদিন আচার্যদেবের শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও যন্ত্রণাগ্রস্ত, সন্ধ্যার অনতিপূর্বে পরমহংস মহাশয় হঠাৎ কমলকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আচার্যদেব নিদ্রিত, পরমহংস মহাশয় গৃহে উপস্থিত হইলেও অসুস্থতা বৃদ্ধি হইবে ভয়ে কেহই তাঁহাকে জাগ্রত করিতে সাহসী হইলেন না ; প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরমহংস মহাশয় বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া আচার্যদেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, বলিতে লাগিলেন 'যদি তিনি এখন না আসিতে পারেন যে-ঘরে তিনি শয়ন করিয়া আছেন সেই ঘরটি আমায় দেখাইয়া দাও, আমি দৌড়িয়া এখনই তথায় যাই, তাঁহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না।' আচার্যদেব গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিতে প্রস্তুত হইতেছেন, পরমহংস মহাশয়ও সমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন 'ওগো বাবু, আমি অনেক দূর হইতে তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি, একবার দেখা দাও, আমি আর থাকিতে পারি না।' আচার্যদেব এই সময় বাহির হইলেন এবং পরমহংস মহাশয়কে প্রণাম করিলেন, উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। তখন স্পষ্ট প্রতীত হইল, দুইটি অশরীরী আত্মা যেন একত্র মিলিত হইলেন, তাঁহাদের সম্মিলনে যেন আগুন উঠিল, দুইজনেই শরীরের কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা যে কিরূপ গভীর সৎপ্রসঙ্গে ডুবিয়া গেলেন তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন কেবল তাঁহারাই জানেন। পরমহংস মহাশয় পীড়িত আচার্যদেবকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, প্রায় অর্ধ ঘণ্টা ধরিয়া অনেক কথা কহিলেন, কেবল তাঁহার পীড়ার কথা হইল না। এ সম্বন্ধে তিনি এইমাত্র বলিলেন যে, 'সময়ে-সময়ে মালী ভালো বস্‌রাই গোলাপ বৃক্ষের গোড়া খুঁড়িয়া দেয়, শিশির খাওয়ান হইলে আবার মাটি দিয়া তাহা পূর্বমত পূর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে গাছে খুব ফুল ও তেজ হয়। তোমার সম্বন্ধে মা তাহাই করিতেছেন, তোমার পীড়া নয়, তুমি মার বস্‌রাই গোলাপ গাছ, মা তোমার গোড়া খুঁড়িয়া দিয়াছেন, কার্য সিদ্ধি হইলে

আবার পূর্বমত করিয়া দিবেন।' তিনি আরও বলিলেন, 'মাকে পাকা রকম পাইতে গেলে, শরীরে এক-একবার বিপদ হয়, তিনি শরীরটাকে আত্মার উপযোগী করিয়া লইবার সময় একবার খুব নাড়িয়া-চাড়িয়া লন। আমারও একবার ঠিক এইরূপ হইয়াছিল, মুখ দিয়া ঘটি-ঘটি রক্ত উঠিত, সকলে বলিত আমার যক্ষ্মা হইয়াছে আর বাঁচিব না।' তিনি আরও বলিলেন, 'সে-বার যখন তোমার অত্যন্ত রোগ হইয়াছিল, আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল, সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানিয়াছিলাম, এবার তত ভাবনা হয় নাই। কেবল কাল রাত্রিতে প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, নিদ্রা হয় নাই, মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা যদি কেশব না থাকেন তবে আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিব?'

['ধর্মতত্ত্ব', ১৪ জানুয়ারি ১৮৮৪]

তাঁহার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় বৈরাগী পরম যোগী ও ভক্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাঁহার সংসারবন্ধন একেবার ছিন্ন হইয়াছিল, তিনি ঈশ্বরেতে সর্বদা মত্ত থাকিতেন। ঈশ্বর প্রসঙ্গ মাত্র প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিতেন। হাসিতেন কাঁদিতেন নৃত্য করিতেন। তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায় সরল ছিল। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, অথচ প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য ঈশ্বর-দর্শন-শ্রবণ বিষয়ে আশ্চর্য-আশ্চর্য কথা বলিতেন ও গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন, তদ্রূপ অন্য কেহই বলিতে জানে না। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অকূল সংসারার্ণবে ঈদৃশ সাধকজীবন আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এরূপ জীবন্ত পুরুষকে দেখিলে আশা হয়, ভয়-ভাবনা চলিয়া যায়। আমরা অনেক যোগী ঋষির চরিত্র, বুদ্ধ চৈতন্য নানক প্রভৃতি মহাপুরুষের বৃত্তান্ত কেবল পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু রামকৃষ্ণকে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি ও অনেক দিন তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছি, এবং অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তাঁহার বাক্যে এমন মধুরতা ও চরিত্রে স্বর্গীয় আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার নিকট বসিলে আর কাহার উঠিতে ইচ্ছা হইত না। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নানা দূরদেশ হইতে স্ত্রী পুরুষ আগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট লোকের ভিড় হইত।...তিনি সর্বদাই ধর্মের নূতন-নূতন চমৎকার কথা, যোগ ভক্তি বৈরাগ্যের গভীর তত্ত্বসকল বলিতেন। তাঁহার কথায় অত্যন্ত মিষ্টতা ও আকর্ষণ ছিল, তাঁহার নিকট বসিলে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ থাকিত না। তাঁহার কথা শুনিলে ও স্বর্গীয় ভাব দেখিলে পাষাণ হৃদয় বিগলিত ও পাষণ্ড বিদলিত হইত।

['পরিচারিকা', আগস্ট ১৮৮৬]

He was an unlettered man, but his commonsense was strong and his power of observation keen. He had facility for expressing his ideas in such homely language that he could make

himself easily understood by all on intricate points of religion and morality. [*The Indian Mirror*, 19 August 1886]

But though not distinguished for scholarship, Paramhamsa had a gift of strong commonsense and quick apprehension. He could argue learnedly with the most erudite Pandits of the day and understand and explain the most abstruse passages of the Sanskrit scripture. [*The Indian Mirror*, 21 August 1886]

রামকৃষ্ণ লেখাপড়ার চর্চা প্রায় কিছুই করেন নাই। রীতিমত দুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব রাখিতেন, পৌরাণিক অনেক সুন্দর-সুন্দর উপাখ্যান সচরাচর বলিতেন, তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন এরূপ নহে, শাস্ত্রবিৎ পাঠকদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তি ছিল, যাহা একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা কখনো ভুলিতেন না। ধর্মের সুকঠিন জটিল বিষয় অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন।···শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখনো-কখনো রোদন করেন, কখনো হাস্য করেন, কখনো আনন্দিত হন, কখনো অলৌকিক কথা বলেন, কখনো নৃত্য করেন, কখনো তাঁহার নামগান করেন, কখনো তাঁহার গুণানুকীর্তন করিতে-করিতে অশ্রু বিসর্জন করেন।" পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এ সমুদায় লক্ষণই লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরদর্শন, যোগ ও প্রেমের গভীর কথাসকল বলিতে-বলিতে এবং সুমধুর সঙ্গীত করিতে-করিতে প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন, হাসিতেন কাঁদিতেন, সুরামত্তের ন্যায়, শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথা-সকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হইত, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা ও নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যাইত। কত সুরাপায়ী ব্যভিচারী নাস্তিক তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস, ভক্তির মত্ততা, অলৌকিক জীবন দেখিয়া ধার্মিক সচ্চরিত্র হইয়াছে। তিনি একজন নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক ছিলেন, তথাপি তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিতগণও তাঁহার পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সামান্য গ্রাম্য ভাষায় ও গ্রাম্য দৃষ্টান্তযোগে অতি সুন্দর-সুন্দর গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এমন ভাবের মাধুর্য ও কথার

জমাট ছিল যে, নিতান্ত সন্তাপিত আত্মা ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে বসিলে দুঃখ শোক ভুলিয়া যাইত। তাঁহার সহাস্য বদন ও সরল বাল্যভাব, মার নামেতে মত্ততা, সমাধি-নিমগ্নতা দেখিলে প্রাণ মুগ্ধ হইত। অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার সমাধি হইত, তদবস্থায় নয়ন পলকশূন্য স্থির, উভয় নেত্রে প্রেমধারা, মুখে সুমধুর হাসি, বাহ্য-চৈতন্যশূন্য সর্বাঙ্গ স্পন্দহীন মৃতপ্রস্তরের ন্যায় হইয়া যাইত, কর্ণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতন্যোদয় হইত।

['ধর্মতত্ত্ব', ৩১ এ আগস্ট ১৮৮৬]

সাধু সাধুকে বেশ চিনিতে পারেন। পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য মহাশয় [কেশবচন্দ্র] মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মায় আত্মায় গূঢ় যোগ হয়। সময়ে-সময়ে আচার্যদেব দলবলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকটে যাইতেন, পরমহংসও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া আচার্য-ভবনে আসিতেন। পরমহংস পদার্পণ করিলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, আচার্যদেবের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধু সকল লোক আসিয়া জুটিত, লোকের ভিড় হইত। পাঁচ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা ব্যাপিয়া ধর্মপ্রসঙ্গে কত আনন্দের স্রোত ও মত্ততার ব্যাপার চলিত। প্রতি উৎসবের পর বাষ্পীয় পোত বা নৌকা আরোহণে ব্রাহ্মমণ্ডলী-সহ আচার্য মহাশয় পরমহংসদেবের নিকট যাইতেন, কখনো-কখনো বেলঘরিয়ার তপোবনে যাইয়া গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন। উৎসবান্তে তাঁহাকে লইয়া আমোদ করা উৎসবের অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত ছিল।...যখন আচার্যদেব দলবলে পরমহংসের নিকটে এবং পরমহংসদেব আচার্যের ভবনে পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং পরমহংসদেবের উচ্চ ধর্মভাব ও চরিত্র পুস্তক ও পত্রিকায় আচার্যদেব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, মিরার ও ধর্মতত্ত্বে তাহার বিবরণ-সকল লিখা হইল, পরমহংসের উক্তি নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল, তখন হইতে তিনি সর্বত্র পরিচিত হইলেন।...পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আশ্চর্য ছিল, তিনি কোনো লোকের মুখ দেখিয়া ও দুই-একটি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন সে কি ধাতুর লোক। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "বহুকাল পূর্বে আমি একদিন বুধবারে যোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, নবযুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করিতেছেন, দুই পার্শ্বে শত-শত উপাসক বসে আছেন। ভালো করে তাকায়ে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তাঁর ফাত্না ডুবেছে, সেদিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল। আর যে সকল লোক উপাসনা করিতে বসেছিল, দেখলাম যেন তারা ঢাল তলওয়ার বর্শা লইয়া বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল, সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপু সকল যেন ভিতরে কিল্‌বিল্ করছে।" পরমহংসদেবের সেই হইতেই আচার্য মহাশয়ের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু আচার্যদেব তাঁহাকে কিছুই জানিতেন

না। অনেক বৎসর পরে শুভক্ষণে বেলঘরিয়ায় দুই জনের গাঢ় সম্মিলন হয়। তখন তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়া ব্রাহ্ম সাধকদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। উহা বিধাতার কার্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমহংসদেবের সমুদায় ধর্মমতে যদিচ আমরা ঐক্য স্থাপন করিতে পারি না, কোনো-কোনো মত ব্রাহ্মধর্মের অননুমোদিত বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার যোগভক্তিপ্রধান সমুন্নত জীবন যে নববিধানের উন্নতিসাধনে বিধাতা কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না। পরম ধার্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে এক-পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা-সকল শ্রবণ করিতেন, কোনো-দিন কোনোরূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না, পরমহংসের জীবনের মূল্যবান্ জিনিস-সকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদায় করিতেন। সাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কিভাবে গ্রহণ করিতে হয়, কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেকদিন পরমহংসের নিকটে যাওয়ার পূর্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি-বিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন।...

আমরা নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। রামকৃষ্ণ বর্তমান সভ্যতার ধার ধারিতেন না, কোনো সভায় যাইতেন না, বক্তৃতাও দিতেন না, পুস্তক পত্রিকাদির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিতেন না। কাহারো নিকটে শিক্ষা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বরকৃপায়, দৈববলে ও সাধনবলে কিরূপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করিতে হয় তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। হংস যেমন অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া জল হইতে সারভাগ ক্ষীর গ্রহণ করে, এই পরমহংসও হিন্দুধর্মের সমুদায় অসারতা ছাড়িয়া তাহার সারমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

['ধর্মতত্ত্ব', ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৬]

[ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস প্রণীত "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস : সমসাময়িক দৃষ্টিতে" (১৩৫৯ সংস্করণ) গ্রন্থ হইতে সংকলিত]

অসামান্য প্রজ্ঞার প্রবাহ

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

আমার মন এখনো সেই জ্যোতির্ময় জগতে ভাসমান—যাকে সেই অপূর্ব মানুষটি সৃষ্টি করতেন—যেখানে যেতেন সেখানেই। এখনো আমার মন ভাসছে সেই রহস্যময় অনির্ণেয় সকরুণ বেদনাপ্রবাহে যা তাঁর মধ্য থেকে উৎসারিত হত, যা দেখেছি তাঁর সঙ্গে সর্বদা সাক্ষাৎকালে। সেই সম্মোহন থেকে নিজ মনকে এখনো আমি বিচ্ছিন্ন করতে পারিনি। তাঁর এবং আমার মধ্যে ঐক্যের ভূমি কোথায় ? আমি ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সুসভ্য, আত্মকেন্দ্রিক, বহুলাংশে সন্দেহবাদী, তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী ; আর তিনি দরিদ্র, অশিক্ষিত, শীর্ণ-সংকুচিত, অমার্জিত, অসুস্থ, অর্ধনগ্ন, অর্ধপৌত্তলিক, বন্ধুহীন, ভক্ত হিন্দু। কেন আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কাছে বসে থেকেছি—যে আমি ডিসরেলি, ফসেট, স্ট্যানলী, ম্যাক্সমুলার-সহ বহুসংখ্যক ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং ধর্মবেত্তার কথা শুনেছি ? আমি যীশুখৃস্টের একান্ত ভক্ত ও উদারনৈতিক খৃস্টান মিশনারিদের বন্ধু ও সমাদরকারী, যুক্তিবাদী ব্রাহ্মসমাজের অনুগত সদস্য ও কর্মী—আমি কেন নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনি ? কেবল কি আমি, আমার মতো ডজনে-ডজনে লোক তা করে থাকে। অনেকেই তাঁর সাক্ষাতে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। দলে-দলে লোক গেছে তাঁকে দেখতে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। আমাদের কোনো-কোনো চতুর কিন্তু আসলে নির্বোধ বুদ্ধিজীবী তাঁর মধ্যে কোনো বস্তু খুঁজে পান নি, ঘৃণাপূর্ণ হৃদয়ে কিছু খৃস্টান মিশনারি তাঁকে প্রতারক বা উৎসাহী আত্মপ্রতারিত ব্যক্তি বলতে ইচ্ছুক। তাঁদের আপত্তিগুলির বিচার, বিবেচনা ও পরিমাপ আমি করেছি। তারপর স্থিরচিত্তেই এই কথাগুলি লিখছি।

এই হিন্দু সাধুর বয়স চল্লিশের অনেক নীচে। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। শরীরের কাঠামো সুগঠিত, কিন্তু যে-ভয়ানক কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র বিকশিত হয়েছে তা স্থায়ীভাবে তাঁর দেহযন্ত্রে বিপর্যয় এনে দিয়েছে। …এই ক্ষয়িত কৃশ দেহ সত্ত্বেও তাঁর মুখে এমন এক পরিপূর্ণতা, শিশুকোমলতা, সুগোচর ও সুগভীর বিনয়-নম্রতা, অবর্ণনীয় মাধুর্য এবং অপরূপ হাসির উদ্ভাস—তার তুল্য কিছু অন্য কোনো মুখে আমি দেখেছি বলে মনে করতে পারি না।…ধর্মই এই মানুষটির একমাত্র কথাবস্তু। কিন্তু সে ধর্ম কী ? অবশ্যই তা হিন্দুধর্ম, কিন্তু বিচিত্র ধরনের হিন্দুধর্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংস কোনো বিশেষ এক হিন্দুদেবতার উপাসক নন। তিনি শৈব নন, শাক্ত নন, বৈষ্ণব নন, বৈদান্তিক নন—তিনি সকলই। তিনি শিবের,

কালীর, রামের, কৃষ্ণের পূজো করেন। একইসঙ্গে বৈদান্তিক মতের বিশ্বাসী ঘোষক। তিনি মূর্তিপূজক, তথাপি যাকে তিনি 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' বলেন, সেই অসীম, অভেদ, অনন্ত, নিরাকার ঈশ্বরের বিশ্বস্ত এবং চরম অনুগত বার্তাদূত। ...তাঁর কাছে ধর্ম মানে ভাবোন্মাদনা, উপাসনা মানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। বিচিত্র বিশ্বাস এবং উপলব্ধির অগ্নিদাহে তাঁর দেহমন দিবারাত্র জ্বলন্ত। তাঁর সংলাপ সেই অন্তরাগ্নির অবিরাম শিখাবিস্তার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তা চলে। দর্শক বা শ্রোতারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু বাহ্যত কৃশ এই মানুষটি একইভাবে সতেজ থাকেন। প্রায়ই তিনি আধ্যাত্মিক ভাবোন্মাদনায় বাহ্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন, বিশেষতঃ যখন তিনি কথাবার্তার সময়ে তাঁর প্রিয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, কিংবা সেসব সম্বন্ধে অন্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমর্থনের মনোভাব লক্ষ্য করেন। ...তিনি কিছু লেখেন না, কদাচিৎ তর্কে অংশ নেন, উপদেশ দেবার চেষ্টা নেই—তিনি কেবল নিজ আত্মাকে উন্মোচন করে দেন আধ্যাত্মিক উক্তির অনর্গল প্রবাহে। অপূর্ব কণ্ঠে গান করেন এবং নানা বিষয়ে অসাধারণ প্রজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করেন। পৌরাণিক শাস্ত্রসমূহের অনালোকিত অংশের উপর তিনি অসচেতনভাবে অপূর্ব আলোকের বন্যা বইয়ে দেন। প্রচলিত হিন্দু ধর্মধারণার মধ্য থেকে তিনি এমন মৌলিক নীতি বার করে আনেন, যার দার্শনিক স্বচ্ছতা তাঁর অশিক্ষিত সহজ জীবন থেকে বিচিত্রভাবে পৃথক। ...যদি তাঁর সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহলে তা অদ্ভুত এবং অসামান্য প্রজ্ঞার এক গ্রন্থ হয়ে দাঁড়াবে। মনুষ্যজগৎ এবং বস্তুজগৎ সম্বন্ধে তাঁর সকল মন্তব্য উপস্থিত করলে মনে হবে, দিব্যবাণীর দিন, মৌলিক আদিম প্রজ্ঞার দিন, আবার ফিরে এসেছে।

['থীইস্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রিকায় ১৮৭৯ অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ। অনুবাদক—সন্দীপ বসু]

সরলতম ভাষায় পরমতত্ত্ব

শিবনাথ শাস্ত্রী

পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তেই আসি যে, রামকৃষ্ণ কেবলমাত্র সাধক বা ভক্ত নহেন—তিনি সিদ্ধপুরুষ। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়া তিনি যে-পরম সত্যকে দর্শন করিয়াছেন, যে-সত্য তাঁহার সাধনজীবনের উৎসরূপে বর্তমান—তাহা ঈশ্বরীয় মাতৃমূর্তি। ভগবানকে তিনি জগজ্জননীরূপে ভাবিতে ভালবাসিতেন। মাতৃস্নেহের একটি অপার্থিব অমৃতধারার মাঝে তিনি পরম আশ্রয় লাভ করেন, ইষ্টকে মাতৃভাবে আরাধনা করিয়াই তাঁহার সাধনা, সিদ্ধি ও পরমপ্রাপ্তি ঘটে।

তাঁহার মনোজগতে ও জীবন-সত্তায় 'মা' ব্যতীত আর কোনো বস্তুর যেন অস্তিত্বই ছিল না। সেজন্য মায়ের গান শুনিলে তিনি ভাবস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া একেবারে সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিতেন।

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক চেতনায় জগজ্জননীর যে বিশ্বব্যাপিনী মাতৃরূপ প্রকাশ লাভ করে, তাহাতে খণ্ডতা অপূর্ণতা বা বৈষম্যের কোনো স্থান ছিল না। তাই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেকার সমন্বয়ের মূল সূত্রটি তিনি অনায়াসেই ধরিতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আজ মনে পড়িতেছে।

ভবানীপুরের এক খৃস্টান ধর্মপ্রচারকের সহিত সে সময় আমার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। আমার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু কথা শুনিয়া তিনি এই শক্তিমান সাধক পুরুষকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। আমি একদিন বন্ধুটিকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হই। রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইবার কালে বলিলাম, "ইনি একজন খৃস্টান ধর্মযাজক, লোকমুখে ও আমার কাছে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে এসেছেন।"

আমার কথার উত্তর দিবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাত্মা যীশুর চরণে আমার শত-শত প্রণাম।"

যীশু সম্পর্কে একটি অপর ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আগন্তুক খৃস্টান যাজকটিকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "মশাই, আপনি যীশুর চরণোদ্দেশে যে নত হয়ে প্রণাম করলেন তার তাৎপর্য কি?"

রামকৃষ্ণ মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "সে কি গো! তাঁকে প্রণাম করব না? তিনি যে ভগবানের অবতার! মানুষকে ত্রাণ করবার জন্য নরদেহে মর্তে অবতরণ করেছিলেন।"

বন্ধু ততোধিক বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "অবতার? ঈশ্বরের অবতরণ? আমি কিন্তু এর কোনো অর্থই বুঝলাম না। আপনি কি দয়া করে আমায় আর একটু পরিষ্কার করে এ কথাগুলো বুঝিয়ে দেবেন?"

"এদেশে যিনি রাম, কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যীশুও তাঁর সেইরূপ আর এক প্রকাশ। তুমি ভাগবত পড়নি? তাতে লেখা আছে, অনন্ত শক্তিমান ভগবান জীবের কল্যাণার্থে নরদেহে বহুবার অবতরণ করবেন।"

"আমি কিন্তু এখনও এর তাৎপর্য বুঝতে পারছিনে। আপনি যদি দয়া করে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহলে বাধিত হবো।"

"একটা সাধারণ কথা দিয়েই বলি। আচ্ছা, সমুদ্রের কথাই ধরো। যখন এর দিকে তাকাও, এর অনন্ত জলরাশি ছাড়া কিছুই দৃষ্টিপথে আসে না। কিন্তু ঠাণ্ডায় যখন জলভাগের কিছুটা জমে যায় তখন এই অসীমতার মধ্যে তোমার দৃষ্টি সীমিত হয়, অবলম্বনের একটা ক্ষেত্র খুঁজে পায়, তুমি একে ইচ্ছে বা প্রয়োজন

মতো ব্যবহার করতেও পারো। অবতার সম্পর্কেও সেই এক কথা। ঈশ্বর অনন্ত, অরূপ, বিশ্বব্যাপী। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে এই অসীম শক্তি—সীমার মাঝে রূপ নিয়ে আসেন। এই শক্তি যাঁদের, তাঁদের আমরা বলি মহাপুরুষ, মহাত্মা বা অবতার। অবতার ঈশ্বরের বিশেষ ভাবের প্রকাশকেই বুঝায়। মহাপুরুষদের লোকোত্তর জীবনের মধ্যে দিয়েই লীলাময়ের স্বর্গীয় সত্তার প্রকাশটি ঘটে। এই হচ্ছে অবতারের ব্যাখ্যা।"

রামকৃষ্ণ তাঁহার সেই শিশুসুলভ ভঙ্গিতে ও ভাষায় অধ্যাত্মজগতের বহু নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতে থাকেন। খৃস্টান ধর্মযাজকটি সেদিন তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। রামকৃষ্ণের গভীর সত্যোপলব্ধি সেদিন আমাকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার পর হইতে আমি যখনই অবসর পাইতাম দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট যাইতাম। তাঁহার সহিত বহুবার সাক্ষাৎ করিয়াছি। তাঁহার মুখনিঃসৃত পরমতত্ত্বের বহু মূল্যবান ব্যাখ্যা শুনিবার সুযোগও কম পাই নাই কিন্তু পৃথকভাবে সেগুলি সব আজ আর স্মরণ নাই। স্মৃতিপটে যে-ঘটনাগুলি তখন বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়াছিল তাহারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

আমি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া আছি, কয়েকটি ভক্তও সেখানে উপবিষ্ট। পরমহংস হঠাৎ এক সময়ে কক্ষ হইতে বাহিরে গিয়াছেন। ভক্তেরা নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরের গুণাগুণের বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন, "চুপ কর তো তোরা, ঈশ্বরের গুণাগুণের কথা এভাবে বিচার করে কি লাভ বল দেখি। তাঁর মহিমা বুঝতে হ'লে স্মরণ, মনন, ধ্যান ধারণা দিয়ে তা করতে হয়, তর্ক করে কি তা বুঝা যায়? ঈশ্বর যে করুণাময়—একথা কি যুক্তি দিয়ে সত্যিই আমায় বোঝাতে পারিস? এই-যে সেদিন সাবাজপুরে বন্যা আর ঝড়ে শত-শত লোকের প্রাণ নষ্ট হ'ল, একি করুণার নিদর্শন? তোরা হয়তো বলবি, এই ধ্বংসের ফলে ভবিষ্যতের নতুন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার হল! কিন্তু আমি তর্ক করে বলব, যিনি সর্বশক্তিমান, একদিকে সৃষ্টি করতে হলে কি তাঁকে আবার আর একদিকে ধ্বংস করতে হবে? শত-শত অসহায় শিশু, নারী, বালক, বৃদ্ধের কান্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি ঈশ্বরের করুণার কথা কল্পনা করা যায় রে?"

একজন ভক্ত শ্রোতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে কি বলতে হবে, ঈশ্বর নিষ্ঠুর।"

শ্রীরামকৃষ্ণ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আরে বোকা, কে তোকে তা বলতে বলছে? ঈশ্বরের গুণাগুণ নির্ণয় কে করবে? তাঁর অনন্ত মহিমার অন্ত কে করবে। তাইতো বলছি, কাতর হয়ে যুক্ত-করে শুধু এই প্রার্থনা কর—ঈশ্বর!

তোমার মহিমা বুঝবার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই, তুমি কৃপা করে আমাদের জ্ঞাননেত্র খুলে দাও।"

এই বলে তিনি একটি সুন্দর গল্প সকলের সম্মুখে বিবৃত করিতে লাগিলেন।

"এক বাগানে একটা আম গাছের নীচে দুই বন্ধু পথশ্রান্ত হয়ে এসে বসলো। ওদের একজন তৎক্ষণাৎ কাগজ পেন্সিল নিয়ে আমগাছের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অপরজন প্রকৃত বুদ্ধিমান, সে এসব চিন্তা না করে পাকা আমগুলো তৎক্ষণাৎ পেড়ে খেতে শুরু করল। সে জানে, আমের হিসাবে তার প্রয়োজন নেই, সে আম খেতে এসেছে, খাওয়ার তৃপ্তিই তার কাম্য। আমাদের সম্পর্কেও ঠিক একই কথা! আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, ঈশ্বরের গুণের বিচারে আমাদের কাজ কি? আমরা আনন্দে তাঁর নামসুধা পান করে যদি তৃপ্ত হই, তাই কি পরম লাভ নয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে থাকেন, "বাগানে যে দুই বন্ধু এসে ঢুকল, তাদের মধ্যে যে পাকা আমটি খেল, প্রকৃত লাভবান সে-ই—এ সম্পর্কে কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না। সে জানে, অপরের বাগানে স্বল্পক্ষণের জন্য এসে হিসাব করতে বসা মূর্খতা।"

ভক্তেরা একবাক্যে মাথা নাড়িয়া তাঁহার কথা সমর্থন করিলে পরমহংস হাসিয়া বলিলেন, "ওরে, মানুষের জীবনও তো এমনি অল্পস্থায়ী। এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের গুণাগুণ বিচারে সময়ের অপচয় করবি কেন? অনন্ত শক্তির হিসাব কে করতে পারে? তার চাইতে তাঁর নামগান করে আনন্দলাভ করলেই ববং জীবনের চরিতার্থতা। সমস্ত প্রাণ মন সমর্পণ করে তাঁর অনন্ত মহিমার রাজ্য তোর সামনে উন্মোচন করবেন। আমাদের আর হিসেবে প্রয়োজন কি?"

সম্মিলিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত। এই নিরক্ষর গ্রাম্য সাধকের মুখে গভীর তত্ত্বজ্ঞানের এরূপ সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া সেদিন সকলেই বিস্মিত হইয়া যান।

একদিন আমি রামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া আছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। এক ভদ্রলোক শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন—অধ্যাত্ম সাধনায় সদ্‌গুরু প্রাপ্তির উপর জোর দেওয়া কি সত্যই অপরিহার্য?

রামকৃষ্ণ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই, জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যবলেই মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এপথে গুরুর করুণা যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। গুরুই শিষ্যকে প্রধানতঃ এপথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন, শিষ্যের চেষ্টার তেমন প্রয়োজন নেই। তবে ব্যক্তিগত চেষ্টায়ও কাজ হয়, কিন্তু গুরুই সেই দুর্গম পথকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে সুগম করে দিতে পারেন।"

এই বলিয়া তিনি সম্মুখে প্রবাহিনী গঙ্গায় চলমান একখানি বাষ্পীয়-পোতের দিকে সমাগত ভক্ত দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তারপর বলিলেন, "আচ্ছা স্টীমারটি চুঁচুড়ায় কখন পেঁছিবে বলতে পারো?"

একজন উত্তর দিলেন, "সন্ধ্যা পাঁচটা-ছয়টা হবে।"

"হালটানা নৌকোর সেখানে পেঁছিতে পনের-কুড়ি ঘণ্টারও বেশী সময় লাগবে; কিন্তু নৌকোটিকে যদি ওই বাষ্পীয়-যানটির সঙ্গে জুড়ে দাও তবে সেও ওটার মতো অল্প সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে পেঁছিবে। যারা মুক্তি চায় তাদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যবস্থা। তুমি যদি গুরুর নির্দেশ ছাড়াই এপথে চলতে আরম্ভ করো, তাহলে বহু বিঘ্ন ও বিপত্তি অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে পেঁছিতে তোমার সময় ও পরিশ্রম কম যাবে না, কিন্তু গুরুসহায়ে সহজে ও স্বল্প সময়ে তা সম্ভব হয়। এই হচ্ছে ধর্মজীবনে গুরু সহায়ের তাৎপর্য।"

অপর একদিন এক ভক্ত তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "জ্ঞান ও ভক্তি এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি বড়?"

সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ সাধকের ব্যাকরণগত ত্রুটি ঐ সময় আমার শিক্ষিত মনকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার অনাড়ম্বর সরল ও প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা আমার মনকে বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না করিয়া পারে নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'জ্ঞান' ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু নিরক্ষর রামকৃষ্ণ জ্ঞানকে পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, "জ্ঞান পুরুষ, সেজন্য তাকে সকল সময়ই মহামায়ার অন্তঃপুরের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়—ভেতরে প্রবেশের অধিকার তার নেই। কিন্তু ভক্তি নারী, মায়ের অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি, মায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভে তার কোনো বাধাই নেই। জ্ঞানের পথ আয়াসসাপেক্ষ, কিন্তু ভক্তির সরসতা গমন-পথকে স্নিগ্ধ করে, পথের বাধার রুক্ষতা দূর করে দেয়।"

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মতো দুরূহ তত্ত্বকে এমন সহজভাবে ব্যাখ্যা করা চলে, একথা পূর্বে কখনও ধারণা করিতে পারি নাই। তাঁহার সান্নিধ্যে ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, পরমতত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি না হইলে বিশ্বসংসারের সমস্যা কাহারো নিকট এমন সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠে না। তাঁহার ব্যাখ্যাত তত্ত্বগুলি এতই প্রত্যক্ষ ও সহজ যে, তাহা যে-কোনো মানুষই সাধারণ জ্ঞান দিয়া বুঝিতে পারিত।

একদিনের ঘটনার কথা বলি। শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের সাধনার কথা বলিতেছেন, এক ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, "গৃহীরা ধ্যান-ধারণা করবে কখন? দিবারাত্র সংসারের কাজে তারা মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, এ অবস্থায় ভগবদ্‌ভজনের অবসর কই?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওর মধ্যেই হয়। গ্রামদেশের চিঁড়েকুটুনী মেয়েদের দেখেছ? ওরা চিঁড়ে কুটবার সময় একহাতে ঢেঁকির ভেতরের ধান ওল্টায়, আর একহাতে শিশুকে স্তন দেয়; আবার ব্যাপারী এলে তার সাথে চিঁড়ের দর-কষাকষি করে। সে সব কাজই করে কিন্তু মনটি দিয়ে রাখে ঢেঁকির গর্তের দিকে। সে জানে, অন্যমনস্ক হলেই তার হাত ঢেঁকির ঘায়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। সংসারী লোকেরা চিঁড়েকুটুনীর মতোই সমস্ত মনটি ঈশ্বরের দিকে রেখে সকল কাজ করে যেতে পারে, তাতেই কাজ হবে।"

সাধক রামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনটি ভগবদ্‌সত্তায় এমনই ভরপুর ছিল যে, সেখানে যে-কোনো বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইত। আন্তরিকতাহীন অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর তিনি পছন্দও করিতেন না।

একদিন ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। কথাপ্রসঙ্গে মালা জপের প্রসঙ্গ উঠিল। একটি ভক্ত পরমহংসকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, দেবদেবীর নাম স্মরণের জন্য মালা জপের কি সত্যিই কোনো সার্থকতা আছে?"

রামকৃষ্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলিলেন, "হ্যাঁগো, যদি তার পেছনে আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু আন্তরিকতাহীন নাম জপে কোনো ফলোদয়ই হয় না। যেমন ধরো, টিয়া পাখীর হরির নাম করা। পোষা পাখীকে রাধা-কৃষ্ণ বুলি শেখাও, সে পড়তে শিখবে এবং কারণে অকারণে সেই শিখানো বুলি পড়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করবে। কিন্তু যদি কোনোদিন তাকে বেড়ালে আক্রমণ করে, তখন কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর রাধাকৃষ্ণ বুলি বার হবে না। সে তখন প্রাণভয়ে নিজের ভাষায় 'ক্যাঁ ক্যাঁ' শব্দই করতে থাকবে। তার কারণ, রাধাকৃষ্ণ তার শেখা বুলি, অন্তরের কথা নয়, সেজন্যই সংকটকালে সে-বুলি ভুলে যায়।"

তিনি বলিয়া চলিলেন, "আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতাহীন ধর্মাচরণকারীদের অবস্থা টিয়াপাখীর মতোই হয়ে থাকে। ধর্মানুষ্ঠান তাদের জীবনের বহিরঙ্গ ব্যাপার, তাই সংকটমুহূর্তে তারা টিয়াপাখীর মতোই এটা বিস্মৃত হয়ে যায়—ফলে ধর্মের মুখোশ খুলে স্বরূপ প্রকাশ পায়। বিশ্বাস বা ভক্তির জোর না থাকলে ধর্মের ভাব অল্প আঘাতেই ছুটে যায়। যে বিশ্বাস জীবনের সংকটকালে টিকে থাকতে পারে না সে আবার বিশ্বাস নাকি?"

এরূপ ধরনের কথা বহুবারই শুনিয়াছি। কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সহজ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তাহার প্রত্যক্ষতা নূতনরূপ লইয়াই প্রত্যেকটি ভক্তের অন্তর স্পর্শ করিল।

[মায়া রায় অনূদিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে'
(Men I Have Seen) গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

স্মরণকালে তাঁর তুল্য কথক নেই

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মহাকাল কিভাবে না নিজ স্থান এবং পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে নেয়! রামকৃষ্ণ কিভাবে শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন সে সম্বন্ধে অমর্যাদাকর তর্কবিতর্ক শোনা গেছে। এমনও বলা হয়েছে, যদি-না কোনো এক বা একাধিক

বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আকস্মিক সাক্ষাৎকার হত, তাহলে দক্ষিণেশ্বরের এই অধ্যাত্মপুরুষের কথা কেউ জানতেই পারত না। যদি তাই সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে, হা হতভাগ্য মানবসংসার! কিন্তু এইসব কথার চালাকি যৎসামান্য মনোযোগেরও যোগ্য নয়। যে-সব মানুষ পরমহংস রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমন কেউই নেই যিনি ধর্মের ইতিহাসে বা সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সমস্তরের। যেসব ধনী ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছেন, কিংবা যাঁদের বাড়ীতে তিনি গিয়েছেন, তাঁদের প্রায় কাউকেই কেউ মনে রাখবে না—যদি রাখে তার একমাত্র কারণ, ঘটনাচক্রে রামকৃষ্ণ কথামৃতে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে বিস্মৃত, তাঁদের খেতাব আর অর্থসম্পদ ধুলায় বিলীন। কেউ-কেউ তাঁকে খ্যাপা মানুষ বলে দেখেছেন, অন্য অনেকের কাছে তিনি নিছক কৌতূহলের বস্তু। এইসব লোক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন, অপরদিকে মহাকাল মানবসংসারের মহান আচার্যদের সারিতে রামকৃষ্ণের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। যে কতিপয় তরুণকে তিনি নিজের কাছে আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই বিরাট আধ্যাত্মিক মহিমার অধিকারী হয়েছেন, আর তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং বন্দিত শিষ্য বিবেকানন্দ—তিনি দেশপ্রেমিক, আচার্য, নিজ দেশের জনগণের এবং প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং মহান বার্তাবহরূপে অবিনশ্বর খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন।

সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ছাড়াও পরমহংসের অনেক গৃহী শিষ্য ছিলেন। তাঁরা নানা বৃত্তির মানুষ। রামকৃষ্ণকে গুরু এবং প্রভু বলে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ—নট নাট্যকার হিসাবে বিখ্যাত।··· অভিনয়মঞ্চে এক স্মরণীয় রাত্রে ইনি ঘোষণা করেছিলেন—স্বয়ং ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন—রামকৃষ্ণ এসেছেন সকলের পরিত্রাণের জন্য। তা শুনে তখন সেখানে সে কি প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা! বোধহয় এঁর থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক গৃহী শিষ্য—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে 'মাস্টার মহাশয়' নামে পরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম এক গ্র্যাজুয়েট ইনি, শিক্ষকতা এঁর বৃত্তি। পৃথিবী এঁরই কল্যাণে লাভ করেছে রামকৃষ্ণ কথামৃত। মহেন্দ্রনাথ তাঁর নামের আদ্যক্ষর মাত্র গ্রন্থে দিয়েছেন। অনামা অজানা থেকেই তিনি সন্তুষ্ট। রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যরাই কেবল তাঁর নাম জানতেন। দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্রনাথ নিয়মিত গেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে কাটিয়েছেন রামকৃষ্ণর কথা শুনবার জন্য। কিন্তু যেহেতু তিনি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এবং তাঁকে নিজের সংসার দেখাশোনা করতে হত, তাই সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারেন নি। তিনি রামকৃষ্ণের খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পরমহংসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তিনি ওঁর উক্তি এবং শিক্ষার মৌলিকতা এবং গভীরতায় এমনই চমৎকৃত হয়েছিলেন যে, সেগুলি অবিলম্বে লিখে

রাখার বাসনা তাঁর মাথায় জেগেছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, রামকৃষ্ণের সঙ্গে কোনো এক সাক্ষাতের পরেই তিনি তাঁর কথাগুলি লিখে ফেলতে আরম্ভ করে দিতেন। একটি সাক্ষাতের সময়ে যা শুনেছেন, তা লিখতে তাঁর তিনদিন লেগে যেত। সেই উক্তি-সংগ্রহ পাঁচ খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। আমি সবিনয়ে কৃতজ্ঞভাবে সুতৃপ্তচিত্তে স্মরণ করতে পারি—আমার কথাতেই মহেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-দর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি আমার আত্মীয়, বন্ধুও বটে, যদিও কয়েক বৎসরের বড়ো ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরমহংসকে দেখার পরে আমি মহেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে কী দেখেছি এবং শুনেছি তা বর্ণনা করেছিলাম—দক্ষিণেশ্বরের ঐ অসাধারণ সাধুকে দর্শন করবার জন্য তাঁকে তাগিদ দিয়েছিলাম। মহেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের শেষ খণ্ডে (মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও যার শেষ প্রুফ তিনি দেখেছিলেন) ঐ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কত বৎসর পরে তাঁর উপদেশ এবং আলোচনাদি সংগ্রহ করে লিপিবন্ধ করা হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে বুদ্ধদেবের পূর্বে এবং পরে দীর্ঘকাল ধরে স্মৃতিযোগে শাস্ত্র-সংরক্ষণের পদ্ধতি ভারতে বলবৎ ছিল—অসামান্য তার নিখুঁত রূপ। লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হবার অনেক আগেই এইভাবে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, দর্শনসমূহ, এমনকি মহাকাব্যগুলিও মুখে-মুখে রচিত। গুরু থেকে শিষ্য পরম্পরায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেগুলি হুবহু আকারে পরবর্তীকালে নেমে এসেছে। এখনো এমন সব পণ্ডিতের দেখা মিলবে গোটা-গোটা বই যাঁদের কণ্ঠস্থ। সেইগুলি সামান্যতম ভুল না করে তাঁরা পুরো আবৃত্তি করে যেতে পারেন। তাই বুদ্ধ-উপদেশের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত। তাঁর দেহান্তের পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তাঁর শিক্ষা ও তার উপর নির্ভরশীল ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে বিরাট মহান সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুখৃস্টের মৃত্যুর অল্প পরে নিশ্চয় নিউ টেস্টামেণ্টের চারটি খণ্ড লিখিত হয়েছিল। লেখকরা অবশ্য স্মৃতির উপরেই প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিলেন। সর্বাপেক্ষা সুন্দর পবিত্র ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সেগুলি পড়ে। পয়গম্বর মহম্মদ শিক্ষিত ছিলেন না, তিনি মুখে কোরান বলে গিয়েছিলেন. তা আরবী ভাষার সুন্দরতম গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতে বিরাট পণ্ডিত, কিন্তু তিনি নিজে কিছু লিখে যাননি। মানবসমাজের পথপ্রদর্শক সকল মহান আচার্য-পুরুষই মুখে-মুখে শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা কিছু লেখেন নি। তাঁদের শিষ্যরা সযত্নে ঐসব প্রজ্ঞারত্ন সংগ্রহ করে লিপিবন্ধ করেছেন। আগে দ্রষ্টা, তারপরে পুঁথিলেখক। মুখের কথা বাতাসে পাখা মেলেছে, পরে লেখার খাঁচায় তাদের ধরা হয়েছে।

রামকৃষ্ণের কথামৃত কিন্তু একেবারে সাক্ষাৎ রচনা। প্রভুর ওষ্ঠ থেকে লেখার খাতায় তাদের জীবন্ত অবতরণ। সে লেখা তাঁকে প্রায়ই পড়ে শোনানো হত, সংশোধন এবং পরিবর্তনের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কোনো

কিছুতে কল্পনা বা অতিরঞ্জনের স্থান নেই। পূর্বতন আচার্যগণের জীবনের অনেক কিছুই অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা এবং অনুমানে আচ্ছন্ন। বুদ্ধ, খৃস্ট এবং চৈতন্য—কারোরই সঠিক মুখচ্ছবি আমরা পাই না। মুসলমান-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার চিত্রপ্রকাশ ঐ ধর্মের দ্বারাই নিষিদ্ধ। রামকৃষ্ণের ফটো সর্বত্রই মেলে। আর তিনি ঠিক যেভাবে বলেছেন, প্রায় ঠিক সেইভাবে তাঁর মুখের কথা আমরা পেয়ে গেছি।

রামকৃষ্ণ প্রায় নিরক্ষর। অল্পস্বল্প বাংলা পড়তে এবং দু'চারটি শব্দ লিখতে পারতেন কি পারতেন না। তাঁর কোনো পুঁথির পাণ্ডিত্য ছিল না, ইংরেজী একেবারেই জানতেন না। শহুরে লোকের মার্জিত ভাষা তাঁর অজ্ঞাত। গ্রাম্যভাষায় কথা বলতেন। এমন কি অশালীন দিব্যিও গালতেন। কথা পুরো সাবলীল নয়, মাঝে-মাঝে আটকে যেত।···কিন্তু যখন বলতে শুরু করতেন, এইসকল অসুবিধা জীর্ণ বস্ত্রের মতো খসে পড়ত। তখন তাঁর মুখ থেকে প্রবাহিত হত অব্যস্ত কিন্তু অবিরাম গতিতে অপূর্বতম প্রজ্ঞার ধারা। স্মরণকালের মধ্যে রামকৃষ্ণের মতো করে আর কোনো মানুষ কথা বলতে পারেন নি। প্রাচীন আর্যঋষিদের জ্ঞান, উপনিষদের দুরূহ শিক্ষা, বেদান্তের জটিল তত্ত্ব—সব কিছুই তাঁর সুপরিচিত, যেন সারাজীবন ধরে তাদের চর্চা করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা মনে হত প্রায় অপ্রাকৃতিক। সর্বশ্রেণীর মানুষের, এমন কি ধরা যাক জেলেদের জীবনযাত্রা পর্যন্ত, অতি নিকট-রূপে তিনি জানতেন। নারীদের দূরে রাখলেও তাদের ভাবভঙ্গি কথাবার্তার চমৎকার নকল করতে পারতেন। অসামান্য সুন্দর তাঁর উপমাদি অলংকার। সেগুলি প্রায়ই মৌলিক। যেসব নীতিগল্প বলতেন সেগুলি শুনে শ্রোতারা বিস্ময়ে চমৎকৃত। আর তাঁর সত্তা এমন ঊর্ধ্বে বিরাজিত যে, তাঁর সমীপবর্তী সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে স্তম্ভিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকেছে। অভিভূত মানুষ সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করেছে কিংবা একেবারে হতবুদ্ধি। যেমন অসাধারণ তাঁর বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা, তেমনি অপরিমেয় তাঁর প্রজ্ঞার গভীরতা।

রামকৃষ্ণ এবং কেশবচন্দ্র সেন—এই দুই বিখ্যাত পুরুষকে একত্রে অবস্থিত ও ও সংলাপরত অবস্থায় দেখেছেন—উভয়ের এমন কোনো শিষ্য এখনো জীবিত আছেন কিনা জানি না। সেই বিরাট সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কেশবের বিশেষ ইচ্ছানুসারে আমি একবার তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের দর্শনে গিয়েছিলাম। মন্দির-চত্বরে সে সম্মেলন হয়নি। কেশবের জামাতা কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের একটি ছোট স্টিমারে কেশব ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে উঠেছিলেন, আমিও তাতে ছিলাম। স্টিমার দক্ষিণেশ্বরে পেঁছিলে রামকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়কে নিয়ে তাতে ওঠেন। স্টিমার স্রোতের প্রতিকূলে চলতে শুরু করে। রামকৃষ্ণ এবং কেশব খোলা ডেকের উপর পা মুড়ে বসেছিলেন মুখোমুখি। তাঁরা পরস্পর খুব কাছাকাছি বসেছিলেন। রামকৃষ্ণের ভাবোন্মাদনা যখন বেড়ে

উঠল তখন তিনি কেশবের আরো নিকটে সরে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জানু কেশবের কোলের উপর স্থাপিত হল। আমি তাঁদের একেবারে পাশে প্রায় কেশবকে স্পর্শ করে বসেছিলাম। পরমহংস স্টিমারে প্রায় আধ ঘণ্টা ছিলেন। অল্প যে-কিছুক্ষণ সমাধিতে ছিলেন, তা বাদ দিলে তাঁর কথা বলার বিরাম ছিল না। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সময়ে (১৮৮২-১৯৩৩) অপর কোনো মানুষকে তাঁর মতো করে কথা বলতে শুনিনি। বাক্যবিনিময় বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু ঘটেনি। এই দীর্ঘ আট ঘণ্টা সময়ে অসাধারণ বাগ্মী ও বিশিষ্ট পণ্ডিত কেশব ডজনখানেক বাক্যও বলেছেন কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ ব্যবধানে কখনো একটা প্রশ্ন, বা কখনো বুঝিয়ে বলার জন্য অনুরোধ—এইমাত্র তিনি করেছিলেন। রামকৃষ্ণই ছিলেন একমাত্র বক্তা—তাঁর বাক্যধারা অবিরাম প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল, যেমন করে আমাদের নীচে বয়ে যাচ্ছিল তরঙ্গভঙ্গে গঙ্গার ধারা। তখন তাঁর সেই মধুর কোমল ঐকান্তিক কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছু শুনিনি, তপঃকৃশ দেহটি ছাড়া আর কিছু দেখিনি—যিনি আমাদের সামনে অর্ধমুদিত নেত্রে, কোলের উপর দুখানি হাত রেখে বসেছিলেন। তাঁর কম্পমান ওষ্ঠ থেকে সহজতম উক্তি নির্গত হচ্ছিল। কিন্তু তার অন্তর্গত ভাবের চেয়ে ঊর্ধ্ববিহারী বা গভীরে অবগাহনকারী আর কোন্ ভাব সম্ভবপর! প্রতিটি চিন্তাই দিব্যসত্যের উন্মোচক; প্রতিটি উপমা, রূপকল্প বা কাহিনী পরমাশ্চর্যের দ্যোতক। তিনি কত কথাই না বলেছিলেন—মানুষের মুখ দেখে কিভাবে তার চরিত্র বোঝা যায় সেকথা, নানা অধ্যাত্মপথ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, পরম সত্তার স্পর্শলাভের কালে অনন্ত অপরিমেয় অনুভূতিলাভের কথা। যখন তিনি নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেছেন, তখনই সমাধিমগ্ন। তাঁর মুখে তখন দিব্যানন্দের অপূর্ব আলোকছটা।...শরীর আড়ষ্ট স্থির, পেশী বা স্নায়ুর কম্পন নেই। কোলের উপর ন্যস্ত হাতের আঙুলগুলি একটু বাঁকা, অপূর্ব পরিবর্তন মুখমণ্ডলে, ঠোঁট-দুটি একটু ফাঁক, তার মধ্য দিয়ে সাদা দাঁতের ঝিলিক, যেন হাসছেন, অর্ধমুদিত নেত্র, অক্ষিতারকা অংশতঃ পরিদৃষ্ট, আর সমস্ত মুখের উপর পবিত্রতম ঐশ্বরিক ভাবের অনির্বচনীয় দ্যুতি। নীরবে, সসম্ভ্রমে আমরা তাঁর দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলাম। তারপর কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ের সঙ্গীতাচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল যন্ত্র-সহযোগে গান শুরু করলেন! কিছু পরে পরমহংস ধীরে চোখ মেললেন। চারিদিকে কয়েক মুহূর্ত জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আবার কথা শুরু করে দিলেন।

[অনুবাদ কিয়দংশে 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ২য় খণ্ড থেকে গৃহীত, কিয়দংশে সুদীপ বসু-কৃত]

মানবজাতির চিন্তা ও অনুভূতির আধার

ভগিনী নিবেদিতা

রামকৃষ্ণের জীবন অসীম প্রার্থনা ও অশ্রুতপূর্ব কৃচ্ছ্রতার ফলে এমন এক গভীর উপলব্ধিতে এসে পরিণতি লাভ করেছিল যে, অহং-এর সামান্যতমও অবশিষ্ট ছিল না। শিষ্যদের সম্মুখে যে-মানুষটি ছিলেন এবং চলাফেরা করতেন, সেটি একটি খোলা বই আর কিছু নয়। তাঁর হৃদয়াসীনা জগজ্জননীর ইচ্ছা ভিন্ন তাঁর পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব ছিল না। শোনা যায়, তিনি কখনও 'আমি' বা 'আমার' শব্দ ব্যবহার করতেন না। (নিজের হৃদয়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে) বলতেন 'এর মধ্যে যিনি আছেন তাঁর', কিম্বা সচরাচর বলতেন, 'আমার জগন্মাতার'।

প্রথম জীবনে তাঁর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ ভালো ছিল, কারণ যে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার ঝড় পঞ্চাশ বৎসর ধরে তাঁর মধ্যে প্রবলবেগে বয়ে গেছে, তার ধাক্কা তাঁকে সামলাতে হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশী আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর চরিত্রের জটিলতা, বহুমুখিতা ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি, যার ফলে তিনি প্রতি মানুষের মনের সমস্যার কথা বুঝতে পারতেন, যেন সেগুলি তাঁর নিজেরই সমস্যা। আধুনিক-কালে সম্ভবতঃ তিনিই যথার্থ বিশ্বমানব—সর্বাত্মক সর্বজনীন মনের অধিকারী।

সম্পদ ও বিদ্যা দ্বারা যে পৃথিবীতে কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি হতে পারে একথা তিনি একেবারেই জানতেন না। জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে ভ্রুকুটি করে সম্মুখ থেকে বিদায় করে দিলেন, কেননা ধনসম্পদ ও নামযশের অহঙ্কার নিয়ে সে এসেছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করে হয়তো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সাধারণ নারীর ঘরের কথা মন দিয়ে শুনতেন, কিংবা কোনো অখ্যাত বালককে শিক্ষা দিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতেন। তাঁর স্পর্শ গভীর দাগ না রেখে কদাপি যায়নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সুপরিচিত একজন ধর্মপ্রচারক [কেশবচন্দ্র সেন] তাঁর সংস্পর্শে আসার পরেই ঈশ্বরের মাতৃভাবকে সাধনার ও প্রচারের বিষয় করেন। বর্তমান ভারতের অনেক শক্তিমান ব্যক্তিই বাল্যকালে তাঁর পদপ্রান্তে বসেছেন। গ্রাম্য কৃষিজীবী ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে আগত, প্রায়-নিরক্ষর এই মানুষটি কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও ব্যাপক অনুশীলনের হিসাবে বিরাট পণ্ডিত। কারণ তাঁর ছিল এক অসামান্য তীক্ষ্ণ কান এবং স্মৃতিশক্তি, যার বলে তিনি অনুবাদসহ সংস্কৃত শব্দগুলিকে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারতেন। এবং নানা সময়ে বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ তাঁর কাছে পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অসাধারণ বিরাট হয়ে উঠেছিল।

যে সময়কার কথা আমরা বলছি, জীবনের এই শেষ কুড়িটি বছর তিনি ছিলেন একটি মহান আলোকবর্তিকার মতো ; সারা বাংলাদেশে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি ও নেপালে সিদ্ধপুরুষরূপে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেসব জায়গা থেকে বহুলোক তাঁর সাক্ষাতে আসত অনাড়ম্বর প্রাচ্য রীতিতে। তাঁর সংস্পর্শে এসে লোকেরা অনুভব করত এমন এক শক্তি, যারা কুলকিনারা তারা করতে পারত না ; এমন জ্ঞানরাশি তাঁর থেকে সমুদ্ভূত হত, যার গভীরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না তাদের। তিনি যেন একটি মহান সঙ্গীত ; ঐ সঙ্গীত যাঁর স্পর্শ বয়ে আনছে, তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তার আভাস যেন পেত সমাগত মানুষেরা, তারপর যখন আপন-আপন দৈনন্দিন কাজে তারা ফিরে যেত তখন তারা আরও প্রাজ্ঞ, আরও মধুর, আরও বলীয়ান হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই সমস্ত সময়টিতে তাঁর প্রকৃত জীবন কেটেছে একদল যুবকের মধ্যে, যাঁরা পৃথিবীর পরিচিত সুখ-সুযোগ ত্যাগ করে তাঁর শিষ্য বলে নিজেদের আখ্যাত করেছেন। তাঁদের দু'একজন সব সময়েই সঙ্গে থেকে তাঁর পরিচর্যা করতেন, অনেকে আবার সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি মাসের পর মাস, তাঁর কাছে কাটিয়ে যেতেন।

তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নেহাতই বালক। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে সেখানে ছিল হাসি ও রঙ্গ। তাঁদের গুরু কখনও নিরানন্দ হয়ে থাকতেন না। তাঁর নিঃশ্বাসবায়ুতে যেন বিরাজ করত এক প্রশান্ত প্রফুল্লতা। সেই পরিবেশের পরিবর্তন ঘটত মুহুর্মুহু আনন্দ-উদ্বেল সমাধিতে এবং সমাধিভঙ্গের পর ভাবের এক অপূর্ব উদ্দীপনে। 'সকল প্রাণীর কাছে যা রাত্রি, আত্মসংযমীর কাছে তা দিন ; আর যখন সকল প্রাণী জাগ্রত, জ্ঞানী সেখানে সুপ্ত' —এই বক্তব্যের সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে-করতে তিনি সকলকে গভীর রাত্রে জাগিয়ে দিতেন, তারপর বাইরে এসে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে ধ্যানে বসাতেন। তেমনি আবার কতদিন কেটে গেছে তাঁর নিজের হাতে লাগানো সুন্দর লতাগাছে দোলা খেয়ে, হাসি তামাশার মধ্যে, এবং বাগানে চড়ুইভাতি করে। সময়ের স্রোত বয়ে গেছে, যেন কোনো পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যই তার নেই—অথচ এদিকে সকলের অলক্ষিতে কয়েকটি যুগান্তকারী ভাবধারা সঞ্চারিত হচ্ছিল। তাঁর সাধনজীবনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি—পরম শান্তিপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী দারুণ সংগ্রামের রূপকে যা উদ্ঘাটিত করত—সেই কাহিনীগুলি শিষ্যদের মনে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি রচনা করে দিচ্ছিল। পার্থিব বস্তু ও মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার তারা লক্ষ্য করেছিল, সর্বোপরি তারা সেই পরম সত্যের মহাসমুদ্রে অবগাহন করছিল, তাঁর মধ্য দিয়ে যেখানে নিত্য প্রবেশাধিকার পেত তারা।

ধর্মসংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যে কল্পনা করা সম্ভব তিনি ছিলেন তারই পূর্ণ সিদ্ধি। 'বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরের নিকটে পৌঁছবার

'ভিন্ন-ভিন্ন পথ মাত্র'—এই মতবাদ সাধারণভাবে ভারতবর্ষে নূতন নয়। কিন্তু তিনি যেভাবে এই মত প্রচার করে গেছেন, যথা, তাঁর সেই দৃঢ় ধারণা—নিজের ধর্ম অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত কর্তব্য, কারণ বহু ভাবকেন্দ্র থাকলে পৃথিবীর মঙ্গল; তাঁর সেই সুগভীর প্রত্যয়—'ঈশ্বরকে যে-নামে বা যে-আকারেই জানতে চাও না কেন সেই নামে বা আকারেই তুমি তাঁর দর্শন পাবে'; তাঁর সেই আশ্বাস—ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, যেমন খোসার মধ্যে লুকিয়ে থাকে বীজ; সর্বোপরি সর্ব ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর একান্ত প্রেমপূর্ণ ঘোষণা—'অন্যেরা যেখানে নতজানু হয়ে ভক্তি নিবেদন করছে সেখানে তুমিও নত হও, নমস্কার করো, কারণ যেখানে অনেকের উপাসনা মিলিত হয় সেখানে ঈশ্বর প্রকাশিত করেন নিজেকে'—পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা মেলে না।···

বৃদ্ধ মানুষটি হয়ত ছেলেদের সঙ্গে বসে শান্তভাবে খোসগল্প করছেন তখন হয়ত চোখের ইশারায় তিনি একজনকে জাগতিক বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন—'ফোঁস করবে, কিন্তু কামড়াবে না।' অন্য কোনো গভীরতর মুহূর্তে আবার বলছেন—'বর্ণমালায় ছত্রিশটি অক্ষর আছে, তার মধ্যে তিনটি অক্ষরই (শ ষ স) বলছে, সহ্য করো।'

স্থানীয় লোকগাথা থেকে আরম্ভ করে অশিক্ষিতদের অদ্ভুত কুসংস্কার পর্যন্ত, সব কিছুর মধ্যেই শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে অবশ্য অধিকাংশ শিক্ষা পরশপাথরের কাহিনীতে গিয়ে পেঁছেছে; মানুষ আগে ঈশ্বর-পদের পরশপাথরকে স্পর্শ করুক, তারপর দেখবে, তার সব কিছু সোনা হয়ে গেছে। ছোটখাট যেসব ঘটনা ঘটত, সবই হয়ে উঠত তাঁর মন্তব্যের সূত্র, যার তাৎপর্য প্রায়ই হত সুগভীর। এমনকি একটি অর্ধসিদ্ধ সবজি পর্যন্ত তাঁর কাছে অলংকারের বিষয় হয়ে উঠত—আধাসিদ্ধ সবজি যেন সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষীর মতো, পূর্ণতায় উপনীত হতে না পেরে যে এখনও সম্পূর্ণ বিনীত ও নম্র হয়ে ওঠেনি। নিকটবর্তী মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি যখন ক্রমে অনুরণিত হতে-হতে নির্বিশেষ স্পন্দনে মিলিয়ে যেত, তখন তাঁর মনে জাগত, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুইই এবং দুয়েরই ঊর্ধ্বে।

এর উপর হাসি ও রঙ্গও ছিল। সেই ব্যক্তির প্রতি পরিহাসে তিনি হয়তো মুখর হয়ে উঠতেন, যে জাগতিক বিষয়ের উপর এত উদাসীন যে স্ত্রীকে দান-ধ্যান কমাতে মোটেই বাধা দেয়নি! পৃথিবীর কোনো ঋষিভাবই এহেন হাস্য পরিহাস থেকে তাঁকে বিরত করতে পারত না।

তারপর তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আবার কিসের টানে চলে যেতেন গভীরতর এক রাজ্যে। তাঁর মুখমণ্ডলে নেমে আসত এক অপূর্ব জ্যোতি, তাঁরা ভক্তিবিহ্বল দৃষ্টিতে বসে দেখতেন, তিনি চলে গিয়েছেন এক স্বর্গীয় আনন্দময় লোকে—জগন্মাতার আন্তর রূপদর্শনের অনুভূতিতে।

এটি কি একটি সুমহান মতবাদ নয় যে, প্রতিটি মানুষের ক্ষুদ্র গৃহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে আছে অনন্তের রাজপথের দিকে? এই আহ্বান কি অপরিসীম সান্ত্বনার কারণ

হয় না যখন শোনা যায় ঃ 'যে যেখানে আছো, সেখানে থেকেই, যা তোমার আছে তাই নিয়েই, তোমার প্রভু, তোমার ঈশ্বরে হৃদয় করো নিবিষ্ট, আর উন্মুক্ত রাখো দৃষ্টি—সত্যের দিকে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার নির্দিষ্ট মুদ্রাঙ্কন হল—পরবর্তীকালে তাঁর কাছে যিনিই এসেছেন, ফিরে যাবার সময় অনুভব করেছেন এক গভীর সাহস, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের শক্তির উৎসকে জাগিয়ে দিতেন, যার ফলে স্পর্শপ্রাপ্ত মানুষটি সীমাবদ্ধতাকে ছিন্ন করে পাখা মেলে দিত ঊর্ধ্বাকাশে।

প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা যে বৃথাবস্তু নয়, জগতের কাছে সেই সত্যের তিনি সাক্ষীস্বরূপ। একথা অবশ্য সত্য, আর কোনো দেশেই তাঁর জন্মগ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু একথাও ঠিক নয় যে, তিনি প্রধানত বা একমাত্র ভারতের আত্মাকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর মধ্যে সমগ্র মানবজাতির অনুভূতি ও চিন্তা এসে মিলিত হয়েছিল এবং সেই কালীগতপ্রাণ রামকৃষ্ণ মানবতার প্রতিনিধি।

[নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' গ্রন্থ থেকে সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

এক মৌলিক চিন্তার মানুষ

ফ্রেডারিখ্ ম্যাক্সমূলার

স্বর্গতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ [স্বামী দয়ানন্দের তুলনায় বহুগুণে অধিক চিত্তাকর্ষক সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত। তিনি কেবল যথার্থ মহাত্মা ছিলেন তাই নয়, মৌলিক চিন্তারও মানুষ ছিলেন। ভারতীয় সাহিত্য প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রবাদ-প্রবচনে পূর্ণ, কেবল সেগুলির কথনেই কোনো মানুষ স্বচ্ছন্দে গভীর জ্ঞানীর খ্যাতি অর্জন করতে পারেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে তা হয় নি। তিনি তাঁর নিঃসঙ্গ নির্জনবাসে থেকেই এই পৃথিবীর সম্বন্ধে গভীর মনঃসংযোগ করেছিলেন। তিনি ব্যাপক পড়াশোনা করেছিলেন কিনা বলা শক্ত কিন্তু অবশ্যই বলা যায়—তিনি বেদান্তদর্শনের ভাবে আদ্যন্ত নিষিক্ত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত উক্তিগুলি ঐ দর্শনের ভাবকেই প্রকাশ করেছে ; বস্তুতপক্ষে সেগুলি বেদান্তভূমির ফসলরূপেই কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে। তথাপি দেখে অত্যন্ত বিচিত্র মনে হয়—কিভাবে কিছু ইউরোপীয় চিন্তা, এমন-কি কিছু পরিমাণে ইউরোপীয় রীতি, যা দেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—তা এই ভারতীয় ঋষির দৈবীবাণী সমূহের মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে।…

রামকৃষ্ণের শিষ্যগণ তাঁদের 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় রামকৃষ্ণের যেসব উপদেশ ছেপেছেন তাদের অংশবিশেষে দেখা যায়, প্রাচীন বৈদান্তিক উপমাদি এই প্রথম

ইউরোপীয় চিন্তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের বিষয়ে আমরা যেসব সংবাদ পেয়েছি তার থেকে বুঝতে পারি, তাঁর কথা শুনতে সমবেত বিপুল-সংখ্যক শ্রোতাদের মনের উপর প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাবধারার এই মিশ্রণ অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি অনেক শিষ্য রেখে গেছেন, যাঁরা তাঁর সাম্প্রতিক মৃত্যুর পরে তাঁর আরব্ধ কার্যকে সম্পাদন করে চলেছেন; কেবল ভারতে নয় ইউরোপে পর্যন্ত তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। সন্দেহ নেই, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন প্লেটো কিংবা কান্টের দর্শনের মতই মনোযোগ লাভ করার সম্পূর্ণ অধিকারী।...

রামকৃষ্ণের ধর্মীয় ভাবোন্মাদনার...যেসব বর্ণনা মেলে সেইপ্রকার অবস্থাকে অনন্যসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার গভীরদর্শী পর্যবেক্ষকরা বারবার দর্শন করেছেন। ব্যাপারটি বস্তুতঃপক্ষে নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের কথা বলার মতো। পার্থক্য এই, এক্ষেত্রে বক্তার মন ধর্মীয় চিন্তা এবং শুভচেতনা ও পবিত্রতার সর্বোচ্চ ভাবের দ্বারা পরিপূরিত—তার ফল যা হয় রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে : কোনো আত্মসম্মোহিত অর্থহীন বকবকানি নয়, পরন্তু অপূর্ব কাব্যিক ভাষায় মণ্ডিত সুগভীর প্রজ্ঞার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ। তাঁর মন হীরা, মুক্তা, নীলকান্ত মণিতে পূর্ণ ক্যালাইডোস্কোপের মতো, যথেচ্ছ তাদের নাড়িয়ে ওলটপালট করা হয়েছে কিন্তু তারা সর্বদা মূল্যবান চিন্তারাজিকে সুন্দর রূপরেখায় অঙ্কিত করে উপস্থিত করে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, তাঁর উপদেশ ও প্রচারের অনেকখানি অংশ আমাদের কানে বিচিত্র ঠেকে কিন্তু প্রাচ্য কর্ণে বা প্রাচ্যের ভারতীয় কাব্যে অভ্যস্ত কর্ণে তা ঠেকে না। সবকিছুই তাঁর মনে পরিশোধিত হয়ে যেত। আমার ধারণা, ভারতে প্রচলিত কালীপূজা অপেক্ষা বিকট আর কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু কালীর মধ্যে যেসব বিকট ব্যাপার আছে রামকৃষ্ণের কাছে তাদের অস্তিত্বই ছিল না। তিনি কেবল দেবীর মাতৃভাবই দেখতেন। রামকৃষ্ণের কালীঅর্চনা ঈশ্বরের মাতৃভাবের উদ্দেশ্যে শিশুতুল্য সর্বমনপ্রাণের আবেগবিহ্বল আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছু নয়। নারীর মহিমময় শক্তি ও প্রভাবের প্রতীক ঐ দেবী। এই ঋষি, নারীর স্বাভাবিক পার্থিব রূপকে বহু পূর্বে পরিহার করেছেন। তাঁর পত্নী ছিল কিন্তু দাম্পত্যসম্পর্ক ছিল না। তিনি বলতেন, নারী মোহিত ক'রে ঈশ্বর থেকে সরিয়ে দেয়। বহু বৎসর ধরে নারীর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে তিনি চূড়ান্ত চেষ্টা করেছেন।...তিনি সফল হয়েছিলেন। যে জগৎজননীর কাছে অর্থাৎ দেবী কালীর কাছে তিনি প্রার্থনা করতেন, তিনি রামকৃষ্ণকে প্রতিটি নারীকে নিজেরই প্রতিমূর্তিরূপে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।... প্রার্থনাকালে তিনি বলেছেন, 'মা আমি ধনমান, দেহসুখ চাইনা। কেবল আমার মন-প্রাণ যেন গঙ্গা যমুনার মতো তোমারই দিকে বয়ে চলে। মা, আমি ভক্তিহীন, যোগহীন, আমি দরিদ্র বন্ধুহীন, আমি মান যশ চাইনা, শুধু চাই তোমার পাদপদ্ম।' সবচেয়ে অসাধারণ ব্যাপার হল, তিনি কেবল হিন্দুদেবদেবীর অর্চনাতে

আবদ্ধ থাকেন নি কিংবা হিন্দু রীতিনীতির পরিশোধনের কাজই করেন নি, তিনি মুসলমানেরা যেভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাকে উপাসনা করে, তার রূপ উপলব্ধির জন্য বহুদিন নানা কঠোর সাধনা করেছেন। মুখে শ্মশ্রু গজিয়ে উঠতে দিয়েছেন, মুসলমানী খাদ্য খেয়েছেন, অবিরাম কোরান পাঠ করেছেন। খৃস্টের জন্য তাঁর ভক্তি গভীর এবং আন্তরিক। যীশুর নাম শুনলেই তিনি মাথা নত করতেন। যীশুর ঈশ্বরপুত্র-তত্ত্বকে শ্রদ্ধা করতেন। একবার বা একাধিকবার গির্জার উপাসনায় যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রতিটি পূজাপদ্ধতি তাঁর কাছে ব্যক্তিধর্ম হিসাবে জীবন্ত এবং অতীব প্রেরণাদায়ক পথ। বস্তুতঃপক্ষে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন—পৃথিবীর ধর্মসমূহকে কিভাবে সম্মিলিত করা যায় : প্রতিটি ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ রূপকে দর্শন করা—সত্যের জন্য, ঈশ্বরবিশ্বাসের জন্য, মানবপ্রেমের জন্য যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা—তাই হল পথ। রামকৃষ্ণ নিজে কিছু লিখে যাননি কিন্তু তাঁর উক্তিসমূহ তাঁর অনুরাগীগণের স্মৃতিতে অক্ষয়।

[ম্যাক্সমুলারের 'দি রিয়েল মহাত্মন্' প্রবন্ধ থেকে অরুণ ঘোষ কর্তৃক অনূদিত]

মানব-নদীর মোহানা

রোমা রোলাঁ

কদাচিৎ কেহ উৎসের সন্ধানে যান। বাংলার এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য মানুষটি কান পাতিয়া নিজের অন্তরের বাণী শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি অন্তরতর সমুদ্রের পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই সমুদ্রের সহিত মিলন ঘটিয়াছিল এবং এইরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল উপনিষদের বাণী :

"আমি জ্যোতির্ময় দেবতাদের অপেক্ষাও প্রাচীন। আমি সত্তার প্রথম সন্তান। আমি অমরত্বের শোণিতবাহী শিরা-উপশিরা।"...

শিল্পী ও প্রেমিক-কবির জাতি বাঙালী। তাই বাঙালীরা এই পথকেই বিশেষ-ভাবে আপন করিয়া লইয়াছে। এ-পথের প্রেরণা ও নির্দেশ দিয়াছেন কৃষ্ণপ্রেমে ভাবোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য। এ-পথের সংগীত দিয়াছেন চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি—তাঁহাদের মধুমাখা গান। তাঁহারা ছিলেন দেবাংশ, বাংলা মাটির সুবাসিত ফুল—তাঁহাদের গন্ধে বাংলার মাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মাতাল হইয়া আছে। রামকৃষ্ণের আত্মাও সেই একই পদার্থে প্রস্তুত ছিল, সেই একই রক্তমাংস আহরণ করিয়াছিল।...

রামকৃষ্ণের দেহ ক্ষুদ্র, বর্ণ হরিদ্রাভ, গুম্ফ হ্রস্ব, এবং চক্ষু দুটি অর্ধনিমীলিত, সুন্দর।...এই চক্ষুর দৃষ্টি অন্তরে বাহিরে সুদূরে চালিত হয়। অর্ধ-বিকশিত

বদন, তাহারই ফাঁকে উজ্জ্বল শ্বেত দন্তে মৃদু মায়াবী হাসি। সেই হাসিতে স্নেহ ও দুষ্টামি দুই আছে। নাতিদীর্ঘ ক্ষীণকায়, অত্যন্ত দুর্বল মানুষটি। তাঁহার মানসিক অবস্থা ছিল অসাধারণ অনুভূতিশীল। দৈহিক মানসিক সুখদুঃখের সকল হাওয়াই অতি সহজে তাঁহাকে স্পর্শ করিত। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে যাহাই ঘটিত, তাহাই তাঁহার মধ্যে ভিতরে বাহিরে, দুই দিকেই প্রতিফলিত হইত। সত্যই তাঁহাকে জীবন্ত একটি মুকুর বলা চলে। তিনি অদ্বিতীয় শিল্প-প্রতিভার অধিকারী হওয়ায় তাঁহার আত্মা মুহূর্তে নিজেকে অন্যের আত্মার অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু তাহাতে নিজের অটল নগরদুর্গ—অনন্ত গতির অক্ষয় অস্থির কেন্দ্রটিকে কখনো হারাইত না। তিনি ঘরোয়া বাংলায় কথা বলিতেন।… ঈষৎ তোতলামি ছিল, তাহা ভালোই লাগিত। তোতলামি সত্ত্বেও তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া থাকিত। রামকৃষ্ণের ছিল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অতুলনীয় সম্পদ, তুলনা ও উপমার অফুরন্ত ভাণ্ডার, লক্ষ্য করিবার অতুলনীয় শক্তি, সরস সহাস্য রসিকতা, সর্বজনের প্রতি সমান সহানুভূতি এবং অবিরাম অনর্গল জ্ঞান।”…

যে-সকল দেবদেবী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন এবং নবরূপে জন্ম দিলেন। তিনি জাগাইয়া তুলিলেন “ঘুমন্ত অরণ্য-সৌন্দর্যের” নির্ঝরগুলিকে। এবং নিজের যাদু শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উত্তাপ-স্পর্শে করিয়া তুলিলেন উষ্ণ। সুতরাং তাঁহার অকৃত্রিম জপ-মন্ত্র—ভাবে, ছন্দে, সংগীতে এবং আবেগময়ী প্রীতির বন্দনায় তাঁহার নিজস্বই ছিল। তবে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ইহার কাব্যিক এবং সাংগীতিক উপাদানগুলি বাংলার জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চিত সম্পদ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণবকবিদের গানগুলি যাত্রা প্রভৃতি লোকাভিনয়ের প্রচলিত রূপের মধ্য দিয়া তাঁহার মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কবীরের একটি দোঁহা তিনি প্রায়ই গাহিতেন। কিন্তু আধুনিক কবি ও সাংগীতিকদের বহু রচনাও তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। প্রাচীন কবিদের মধ্যে তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামপ্রসাদ। মা'র নিকট রামকৃষ্ণ তাঁহার রচিত গানগুলি গাহিতেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার বহু চমৎকার উপমা রামপ্রসাদের রচনা হইতেই সংগ্রহ করেন। মায়ের কয়েকটি বিশেষ রূপের বর্ণনাও তিনি রামপ্রসাদ হইতে গ্রহণ করেন।

বাকী কথামৃতে আরো যে-সকল গীতি-কবির উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পণ্ডিত ও শাক্তকবি কমলাকান্ত; ঐ সময়ের অন্য একজন শাক্তকবি নরেশচন্দ্র; ঐ যুগের বাংলার বৈষ্ণব কবি ও জনপ্রিয় গীতি-রচয়িতা কুবীর; অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের কবি, কেশব-শিষ্য প্রেমদাস (আসল নাম ত্রৈলোক্য সান্যাল, তিনি রামকৃষ্ণের উক্তি হইতে তাঁহার বহু কবিতার প্রেরণা পাইয়াছিলেন); এবং বিখ্যাত নাট্যকার ও রামকৃষ্ণের শিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(তাঁহার 'চৈতন্যলীলা' এবং 'বুদ্ধচরিত' প্রভৃতি নাটকের গানগুলি) প্রধান।...

একদিন রামকৃষ্ণের জনৈক শিষ্য রামকৃষ্ণের জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করেন : 'আপনি এতো জ্ঞানের অধিকারী কিরূপে হইলেন?' রামকৃষ্ণ জবাবে বলেন, 'আমি পাড় নাই, পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়াছি। আমি তাহাদের জ্ঞান হইতেই মাল্য রচনা করিয়া গলায় পরিয়াছি এবং মার চরণে এই মাল্য অর্ঘ্যরূপে ডালি দিয়াছি।'...

আমি কেবল [লিপিবদ্ধ] বিবর্ণ বিশুষ্ক শব্দগুলিকে উদ্ধৃত করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার সেই জীবন্ত উপস্থিতি, তাঁহার ব্যক্তিত্বের জ্যোতির্বিকাশ, তাঁহার কণ্ঠস্বর, তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার সেই মৃদু বিমোহন হাসি, আমি কিছুই প্রকাশ করিতে পারি না। যিনিই রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই সেগুলিকে ঠেকাইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবন্ত স্থিরনিশ্চিত বিশ্বাসই তাঁহার দর্শকদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক অভিভূত করিত। অন্য লোকের মতো তাঁহার বেশভূষা ছিল না, তাঁহার অলংকার ছিল না। যাহা ছিল তাহা তাঁহার জীবনের অতল গভীরকে গোপন না করিয়া তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দিত। রামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁহার জীবনের সকল গভীরতাই কুসুমিত হইয়া প্রকাশ পাইত। এমনকি অধিকাংশ ধার্মিক মানুষের পক্ষেও ভগবান হইলেন একটা চিন্তার কাঠামো মাত্র, যে-কাঠামোকে আশ্রয় করিয়া এই "অজ্ঞাত মহাসৃষ্টির" উপরে একটি আবরণ টানিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণের বেলায় তাহা ছিল ঠিক বিপরীত। তাঁহার মধ্য দিয়া ভগবান পরিসৃষ্ট হইতেন, কারণ তিনি যখন কথা কহিতেন, তখন তিনি ভগবানে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি যেন স্নানার্থী, তিনি ডুবিতেছেন, ডুবিবার পরমুহূর্তেই আবার ভাসিয়া উঠিতেছেন, আর সেইসঙ্গে তিনি বহিয়া আনিতেছেন সমুদ্র-শৈবালের সুমিষ্ট গন্ধ, মহাসমুদ্রের লবণাক্ত আস্বাদ। এই গন্ধ ও আস্বাদের দুর্বার প্রলোভনকে কে উপেক্ষা করিতে পারে? পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক মন হয়ত উহার বিশ্লেষণ করিতে পারে। কিন্তু উহার উপাদান যাহাই হউক, উহা হইতে উৎপন্ন বাস্তবতাকে কেহ সংশয় করিতে পারে না। এই ডুবুরি যখন তাঁহার স্বপ্নের গভীরতা হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন মহা-মহা সংশয়ীরাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেন, তাঁহার দুই চক্ষের সমুদ্রজ পত্রপুষ্পের সেই প্রতিফলনকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। কেশব এবং তাঁহার কয়েকজন শিষ্য এই দৃশ্য দেখিয়াই মুগ্ধ বিমোহিত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাবক্ষে কেশবচন্দ্রের জাহাজ একদিক হইতে অন্যদিকে আনাগোনা করিতেছিল, রামকৃষ্ণ সেই জাহাজে বসিয়া অপূর্ব অদ্ভুত কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছিলেন। তিনি যেন ভারতীয় প্লেটো। তাঁহার সেই কথোপকথনগুলির যিনি বিবরণী দিয়াছেন, তিনি [মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত] পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে মানুষের মধ্যে যে, কখনো এই বিভিন্ন মানসিক গঠনের মিলন ঘটিতে পারে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিস্মিত হইয়া

ভাবিয়াছিলেন, এই ভগবৎ-উন্মত্ত মানুষটির সহিত এই সংসারী বুদ্ধিবাদী ইংরাজ-উন্মত্ত মানুষ কেশবচন্দ্রের মিলিবার মতো ঠাঁই কেমন করিয়া থাকিতে পারে ? জাহাজের কামরার দরজার সম্মুখে কেশবচন্দ্রের শিষ্যরা মধুমক্ষিকার মতো দলে-দলে ভিড় করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণের কথাগুলি মধুপ্রবাহের মতো তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল ক্ষরিত হইতেছিল এবং মক্ষিকারা তাহাতে নিমগ্ন হইতেছিলেন।...

রামকৃষ্ণ তাঁহার সুন্দর মধুর তোতলামির সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। এবার নিরাকার ব্রহ্মের বিষয় আসিয়া পড়িল।

তিনি দুই তিনবার নিরাকার কথাটি উচ্চারণ করিলেন এবং তারপর ধীর শান্তভাবে সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। যেন ডুবুরি, গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন।

একটি গান গাহিয়া রামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ করা হইল।...

জগন্মাতা এবং পরমপুরুষ এক, রামকৃষ্ণ এই গানটি গাহিলেন। গাহিলেন—মা আত্মার ঘুড়ি ছাড়িয়া দিয়াছেন, আত্মার ঘুড়ি পরমানন্দে উড়িতেছে, কিন্তু মায়ার সুতা দিয়া মা তাহাকে আপনার কাছে ধরিয়া রাখিয়াছেন। জগৎ লইয়া মা খেলা করেন। তাঁহার খুশী হইলে এইসকল ঘুড়ির মধ্য হইতে দুই-একটিকে তিনি মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে মুক্ত করিয়া দেওয়া তাঁহার খেলা মাত্র। তিনি যেন চোখ টিপিয়া দুষ্টামি করিয়া মানবাত্মাকে বলেন, 'আমি তোমাকে যতক্ষণ অন্য কিছু করিতে না বলি, ততক্ষণ তুমি সংসারে থাকো।'

অতঃপর মা'র অনুকরণে কেশবচন্দ্রের শিষ্যদের প্রতি সহাস্য শ্লেষে রামকৃষ্ণ বলেন ঃ

"তোমরা সংসারে আছো। সেখানেই থাকো ! সংসারত্যাগ তোমাদের জন্যে নয়। খাঁটি সোনা আর ভেজাল যেমন, কিংবা চিনি আর গাদ, তোমরাও ঠিক তেমনি। আমরা মাঝে-মাঝে একরকম খেলা করি, তাতে সতেরো ফোঁটা জিততে হয় ; আমি জেতার সীমা ছাড়িয়ে গেলাম, তাই কেঁচে গেছি।...কিন্তু তোমরা চালাক মানুষ, বেশী ফোঁটা জিতলে না, তাই এখনো খেলে যেতে পারছ। সত্যি, সংসারে থাকো, কি যেখানেই থাকো, যতক্ষণ ভগবানের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ থাকবে, ততক্ষণ কিছুই যায় আসে না।"

রামকৃষ্ণের কথাগুলির মধ্যে বিচার এবং উচ্ছ্বাস, শ্লেষাত্মক সাধারণ জ্ঞান এবং উচ্চতম কল্পনা অপূর্বভাবে সংমিশ্রিত থাকিত। আমরা ইতিপূর্বে ভগবান সম্পর্কে কতকগুলি ঘাটওয়ালা পুকুর এবং মা কালী সম্পর্কে মাকড়সার যে সুন্দর তুলনাগুলি ব্যবহার করিয়াছি, সেগুলি রামকৃষ্ণ এইভাবেই বলিয়াছিলেন। বাস্তবতা সম্পর্কে রামকৃষ্ণের অতি তীক্ষ্ণ একটি অনুভব-শক্তি ছিল। তিনি তাঁহার শ্রোতাদের অন্তরের গভীর তলদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। তাই তিনি মুক্তাত্মার যে ঊর্ধ্বলোকে আপনি প্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেখানে এইসকল শ্রোতাকে উন্নীত করিবার কথা কখনো কল্পনাও করেন নাই। রামকৃষ্ণ তাঁহার শ্রোতাদের জ্ঞান ও

শক্তির পরিমাপ করিতেন, এবং সেই জ্ঞান ও শক্তির সবটুকুই দাবি করিতেন। সর্বোপরি, রামকৃষ্ণ কেশব এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে জীবনের মূল শক্তি, সৃজনের প্রাণবীজ কি, তাহা একটি ব্যাপক বুদ্ধিজাত সহিষ্ণুতার সঙ্গে শিক্ষা দিতেন। এই সহিষ্ণুতার ফলে সত্যের বিভিন্ন দিককে স্বীকার করা সহজ হইয়াছিল—যে-দিকগুলি ইতিপূর্বে একই সঙ্গে স্বীকার করা বা গ্রহণ করা অসম্ভব মনে হইত।...

সক্রেতিসীয় ভঙ্গিতে তিনি সকল আলোচনা করিতেন। সেগুলির এক-একটি আধুনিক শ্রোতাদের চমকাইয়া দিবে। সেগুলি গ্যালিলিবাসী মানুষটির অপেক্ষা মঁতেনের এবং এরাস্‌মাসের সহিত অধিক সহধর্মী। সেগুলির সানন্দ রসিকতা এবং তির্যক শ্লেষ মানুষকে সজীবতা আনিয়া দিত। বাংলার উষ্ণ আবহাওয়া তরুণদের কাছে সেগুলির আবেদনকে দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিত, যে-তরুণরা অভিভূত হইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত।...

রামকৃষ্ণ ১৮৮১ খৃস্টাব্দ হইতে শিষ্য-পরিবৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে থাকেন। শিষ্যরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, ভালবাসিতেন। সুমধুর কলধ্বনিতে গঙ্গা তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিত। মধ্যাহ্নে আঁকিয়া-বাঁকিয়া দুই কূল ভাসাইয়া নদীতে আসিত জোয়ার। এইভাবে নদীর অবিরাম অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতের পটভূমিকায় রামকৃষ্ণ এবং তাঁহার শিষ্যদের সুন্দর সাহচর্য রচিত হইত, দেব-দেবীদের দিবস-রজনীকে চিহ্নিত করিয়া যে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিত, যে শঙ্খধ্বনি হইত, বংশী-মৃদঙ্গ করতাল বাজিত, উপাসনা চলিত, সেই সুরের ঐকতানে জাহ্নবীর কলতানও উদয়াস্ত মিশিয়া যাইত। বায়ুভরে উদ্যান হইতে বহিয়া আসিত ধূপ-গন্ধের মতো পবিত্র পাগল-করা পুষ্প-গন্ধ। চাঁদোয়া এবং ঝালর-ঝুলানো অর্ধবৃত্তাকার বারান্দার স্তম্ভগুলির অবকাশে ফুটিয়া উঠিত প্রবহমাণ নদীর সঙ্গে প্রবহমাণ অনন্তের ছবি।

কিন্তু মন্দিরপ্রাঙ্গণ আর একটি ভিন্নতর নদীর অবিরাম স্রোত-ধারায় স্পন্দিত হইত। এই নদী মানুষের নদী, তীর্থযাত্রীর, পূজারীর, পণ্ডিতের, সকল প্রকারের সকল অবস্থার ধর্মভীরু কৌতূহলী মানুষের নদী। ইঁহারা সকলেই আসিয়াছেন অদূরবর্তী মহানগরী হইতে বা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই অপূর্ব অনধিগম্য মানুষটিকে—যিনি এখনো নিজেকে তেমন কিছুই ভাবেন না—দেখিতে বা প্রশ্নের ভারে ব্যস্ত বিব্রত করিতে। অক্লান্ত ধৈর্যের সঙ্গে মধুর গ্রাম্য ভাষায় রামকৃষ্ণ তাঁহাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া যান। তাঁহার কথাগুলিতে একটি ঘনিষ্ঠ সরল সৌন্দর্য মিশ্রিত থাকে। অথচ তাহাতে গভীর বাস্তবতার সহিত আত্মীয়তাটুকু বিন্দুমাত্র ব্যাহত-বিচ্যুত হয় না। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া কিছুই, কোনো ব্যক্তিই, অলক্ষিতে যাইতে পারেন না। তিনি যেমন পারেন শিশুর মতো খেলা করিতে, তেমনি পারেন প্রাজ্ঞের মতো বিচার করিতে। এই নিখুঁত, হাস্যময়, স্নেহময়, অন্তর্ভেদী স্বতঃস্ফূর্তিই ছিল তাঁহার সম্মোহন শক্তি। মানুষের সহিত সম্পর্কিত কোনো কিছুই তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের খৃস্টান

জগতের সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁহার একটি পার্থক্য ছিল। তিনি দুঃখের সন্ধান করিতেন, দুঃখকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু দুঃখ তাঁহার মধ্যে গিয়া বিলুপ্ত হইত ; তাঁহার ক্ষেত্রে বিষণ্ণ কিছু, বিরস কিছু, বিরূপ কিছু জন্মিতে পারিত না। তিনি ছিলেন মানুষের মহান শুদ্ধিদাতা। তিনি মানুষের আত্মাকে তাহার ক্লেদাক্ত আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে ধৌত করিয়া, কলঙ্কমুক্ত করিতেন। ক্ষমাশীল মৃদু হাস্যের জোরেই তিনি গিরিশচন্দ্রের মতো মানুষকেও সাধুতে পরিণত করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের গোলাপ ও রজনীগন্ধার গন্ধভারে আমোদিত সুন্দর উদ্যানের আবহাওয়ার মধ্যে নির্লজ্জ পাপের অসুস্থ চিন্তাকে কখনো তিনি প্রবেশ করিতে দিতেন না। তিনি বলেন ঃ

"কোনো-কোনো খৃস্টান আর ব্রাহ্ম পাপ-বোধের মধ্যে ধর্মের সার কথা আছে মনে করে। 'প্রভু হে, আমি মহাপাপী। তুমি আমার পাপ মার্জনা করো'—এই বলে যারা প্রার্থনা করে, তাদের মতে, তারাই হলো সবচেয়ে বড়ো ধার্মিক। তারা ভুলে যায় যে, পাপবোধটা আধ্যাত্মিক উন্নতির একবারে গোড়ার, সব চেয়ে নিচেকার ধাপ। তারা অভ্যাসের জোরটাকে দেখে না। তুমি যদি চিরদিন কেবলই বলতে থাকো, 'আমি পাপী, আমি পাপী'—তবে তুমি চিরদিনের জন্য পাপীই রয়ে যাবে।··· তার চেয়ে বরং তোমার বলা উচিত ঃ 'আমি বন্ধ নই, আমি বন্ধ নই।···কে আমায় বাঁধবে ? রাজার রাজা যে ভগবান, আমি তাঁরই ছেলে।' তোমার ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাও, তুমি মুক্তি পাবে ! যে শালা নিজেকে কেবলই 'বন্ধ বন্ধ' করে, সে সত্যি-সত্যিই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যে-লোক বলে 'আমি সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত। ভগবান কি আমাদের পিতা নন ?'—সে লোকই মুক্ত।···বন্ধনটা যেমন মনের, মুক্তিটাও তেমনি মনের।"

তিনি তাঁহার চারিদিকে আনন্দ এবং মুক্তির বায়ু বহিতে দিতেন। গ্রীষ্মদগ্ধ আকাশের ভারে মুহ্যমান বিষণ্ণ আত্মাগুলি আবার তাহাদের দল মেলিয়া ধরিত। তিনি নিরাশতমকেও আশ্বাস দিতেন। "ভয় কি, ধৈর্য ধরো। বৃষ্টি আসিবেই। আবার তুমি সবুজ হইয়া উঠিবে।"

[ঋষি দাস অনূদিত রোমাঁ রোলাঁর 'রামকৃষ্ণের জীবন' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

পৃথিবীতে এক অনন্য জীবনীকার

অলডাস হাক্সলি

সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাসে কদাচিৎ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। ঐ প্রতিভা-সম্পর্কিত সাক্ষাৎ তথ্যসংগ্রাহক ও বিবরণীলেখক আরও কম মেলে। পৃথিবীতে

বহুশত সমাদরযোগ্য কবি ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু এই বহুশত কবি ও দার্শনিকের মধ্যে সামান্য কয়েকজনমাত্রই কোনো এক বস্ওয়েল বা একারম্যানকে আকৃষ্ট করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

শিল্প-সাহিত্যের জগৎকে ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের জগতে প্রবেশ করলে যোগ্য সাক্ষাৎ-বিবরণী লেখকের স্বল্পতা আরও চোখে পড়ে। মহান দিব্যজ্ঞানী সন্তপুরুষ ও অন্তর্মগ্ন ধ্যানী পুরুষদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা কিছু জানি না। একথা সত্য যে, তাঁদের অনেকেই নিজেদের মতবাদ লিপিবন্ধ করেছেন এবং সেন্ট অগাস্টাইন, সুসো এবং সেন্ট টেরেসার মতো কেউ-কেউ সর্বোচ্চ মূল্যের আত্মজীবনী রেখে গেছেন। সকল মতবাদমূলক রচনাই কিয়দংশে বহিরঙ্গ চরিত্রের ও নৈর্ব্যক্তিক; আর আত্মজীবনীকারদের প্রবণতা হল—যেগুলি তাঁরা তুচ্ছ মনে করেন সেগুলিকে বাদ দিতে চান; অপরের জীবনকে কিভাবে তাঁরা প্রভাবিত করেছেন—তা বলার অসুবিধাও তাঁদের আছে। আর অধিকাংশ সাধু-সন্ত তো কোনো রচনা বা আত্মকথা রেখে যান নি; তাঁদের জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা জানার জন্য আমরা তাঁদের শিষ্যদের লিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হই, যেসব শিষ্যরা অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রতিবেদক ও জীবনীকাররূপে নিজেদের নিরতিশয় অযোগ্য প্রমাণিত করেছেন। সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত্যহিক জীবন ও কথোপকথনের এই সুবিপুল খুঁটিনাটি বিবরণ বিশেষপ্রকার কৌতূহলের বস্তু।

অতীব নম্রতার সঙ্গে যিনি নিজেকে 'শ্রীম' নামে চিহ্নিত করেছেন—এই কার্যের জন্য তাঁর বিশেষরকম যোগ্যতা ছিল। প্রভুর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা, প্রভুর শিক্ষার প্রয়োগমূলকতা সম্বন্ধে তাঁর নিবিড় ধারণা—এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রতিদিনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়কর স্মৃতি, এবং সেগুলিকে চিত্তাকর্ষক বাস্তবতার সঙ্গে লিপিবন্ধ করার সামর্থ্য। নিজের স্বাভাবিক শক্তির, তৎসহ যে-পরিবেশকে লাভ করেছিলেন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে 'শ্রীম' অনুপমভাবে এমন একটি পুস্তক রচনা করতে পেরেছিলেন যা আমি যতদূর জানি, ধর্মপুরুষদের জীবনীসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য সৃষ্টি। 'শ্রীম'র তুল্য সমর্থ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ী বস্ওয়েলকে অন্য কোনো সন্তপুরুষ লাভ করেন নি; কদাপি কোনো ধ্যানীপুরুষের প্রতিদিনের জীবনের ছোটখাট ঘটনা এইপ্রকার নিবিড় খুঁটিনাটির ঐশ্বর্যে বর্ণিত হয়নি; কদাপি কোনো ধর্মাচার্যের অসতর্ক যথেচ্ছ উক্তিসমূহ এইপ্রকার নিখুঁত বিশ্বস্ততার সঙ্গে লিখিত হয়নি।

পাশ্চাত্যে পাঠকদের কাছে এই বিশ্বস্ততা ও এই খুঁটিনাটি সম্ভার কখনো-কখনো অস্বস্তিকর, কারণ যে-ধর্মীয় ও বুদ্ধিগত পরিবেষ্টনীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন এবং অনুভূতিকে প্রকাশ করেছিলেন, তা সম্পূর্ণতঃ ভারতীয়। কিন্তু প্রাথমিক কিছু বিস্ময় ও বিভ্রান্তির পরে আমাদের কাছে শ্রীম'র বর্ণনালব্ধ বস্তুগুলির বিচিত্র আকার, এবং তার মধ্য থেকে উদ্ভাসিত মানুষটির বিচিত্র খ্যাপামি,

অদ্ভুতরকম উজ্জীবক ও শিক্ষাপ্রদ মনে হতে শুরু করে। নিছক তত্ত্ববিচারী দার্শনিক পণ্ডিতগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের যেসব ঘটনাকে "অ্যাকসিডেণ্ট" বলে বিবেচনা করবেন, সেগুলি নিতান্তই হিন্দু-ব্যাপার, তদনুযায়ী পাশ্চাত্যে আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ; কিন্তু তাদের সারাংশ তীব্র গভীরভাবে অধ্যাত্মরহস্যময়, তদনুযায়ী সর্বজনীন। এই কথোপকথনগুলিতে—অর্থপূর্ণ ধর্মীয় রহস্যতত্ত্বের সঙ্গে অপরিচিত ধরনের রসিকতার বুনন রয়েছে ; হিন্দু পুরাণের উদ্ভট অংশের সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে নিত্যসত্য সম্পর্কিত অতি প্রগাঢ় সূক্ষ্ম উক্তিসমূহ। সেগুলি পাঠ করার অর্থ—নম্রতা, সহিষ্ণুতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্তকে স্থগিত রাখার মহান্ শিক্ষা লাভ করা।··· এই গ্রন্থ জীবনতথ্য হিসাবে অতীব চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক ; সেইসঙ্গে মহামূল্য, কেননা তা নিত্যসত্তার বোধ দান করে। [দেবাশিস্ মিত্র কর্তৃক অনূদিত]

স্মরণীয় মানব-দলিল

টমাস মান

ইংরাজীতে অনূদিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী এবং উপদেশের যে-পাণ্ডুলিপি আপনি [স্বামী নিখিলানন্দ] আমাকে পাঠিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ। লক্ষণীয় ভালবাসা এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে অনুবাদের যে-বিরাট কাজ আপনি করেছেন সেজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। অতীব স্মরণীয় এই মানব-দলিলের প্রকাশ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে গৃহীত হবে। এর কোনো-কোনো অংশ পাশ্চাত্য মনের কাছে উদ্ভট ও অশালীন বলে প্রতীয়মান হতে পারে (বিশেষতঃ পার্থিব কার্যাদি সম্বন্ধে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের চরম বৈরাগ্যের ব্যাপারটি)। কিন্তু গ্রন্থটি বিরাট এক অতীন্দ্রিয়বাদীর ব্যক্তিত্বকে এমন নিবিড়, নিকট, প্রত্যক্ষ ও মহাবিস্ময়কর আকারে উপস্থিত করেছে যে, মানব-সম্বন্ধীয় যে-কোনো বিষয়কে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত, এমন মনস্বিতার কাছে এই গ্রন্থ অভিজ্ঞতার সম্পদবৃদ্ধিকারী বস্তুরূপে বিবেচিত হবে।

এই বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯—৪৫) পরে নতুন পৃথিবীকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠন করতে হলে, এবং তার স্থায়িত্ববিধান করতে হলে, প্রয়োজন হবে গভীর ও দৃঢ় মৌল নীতিভিত্তির। মানবসমাজকে প্রজ্ঞার শক্তিসমূহকে সম্মিলিত করতে হবে ; মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করতে হবে, তার অর্জনে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। রাশিয়া ও চীনের চিন্তাধারা, এবং অ্যাংলো-স্যাক্সনদের পশ্চিমী মৌল চিন্তাধারার পরে, পার্থিব জগৎ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে শান্তিদায়ক ভারতীয় চিন্তাধারা ভাবী পৃথিবীর গঠনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করবে।

[শংকরীপ্রসাদ বসুর সংগ্রহ। সুদীপ বসু কর্তৃক অনূদিত]

রামকৃষ্ণের যাদুরহস্য উন্মোচক গ্রন্থ

হেনরি আর জিমার

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বস্ত শিষ্য শ্রীম-রচিত আশ্চর্যজনক [বাংলা] দিনলিপির [স্বামী নিখিলানন্দ-কৃত] এই প্রথম সম্পূর্ণ এবং প্রামাণ্য অনুবাদ থেকে আমরা রামকৃষ্ণের অতীব মনোমুগ্ধকর কথাচিত্র পেয়েছি । মানব-সমাজের জন্য ভারতের ধর্মপ্রজ্ঞা এবং বাণীর সুবিখ্যাত ও বিরাট বিগ্রহ রামকৃষ্ণ এই গ্রন্থে তাঁর যাদুরহস্য উন্মোচন করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অত্যন্ত ব্যগ্র, ঈশ্বরভক্তিতে পূর্ণ রামকৃষ্ণ প্রতিটি ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্মপথে সঞ্চরণ করেছেন । [যে-কোনো মূর্তিগ্রহণে সমর্থ গ্রীক-দেবতা] প্রোটীয়াসের মতো প্রাণশক্তিসম্পন্ন, বাসনাময় আবেগে নব রূপান্তরে পারদর্শী তাঁর আত্মা একদিকে আকাশ-উচ্চ দিব্যতাকে, অন্যদিকে অতলস্পর্শী গহ্বরকে পরিমাপ করতে সক্ষম ছিল। ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্য জগতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের তুলনারহিত সমন্বয় ও সংহতিসাধনের শক্তি তিনি দেখিয়েছেন। ক্যালাইডোস্কোপ যন্ত্রে যেভাবে নানা রং ও বর্ণের আবির্ভাব হয়, সেইভাবে অন্তর্জগতে ধারাবাহিক বর্ণ ও রূপের সত্যকে তিনি যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেমনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারকে অতিক্রম করে নিরাকার ঈশ্বরচৈতন্যে নিমজ্জিত হয়েছেন। [সুদীপ বসু কর্তৃক অনূদিত]

পৃথিবীর ধর্মচিন্তায় নুতন সংযোজন

আরউইন এডম্যান

'গসপেল অব রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে রামকৃষ্ণের সংলাপ থেকে, এবং স্বামী নিখিলানন্দ-লিখিত তার প্রশংসনীয় ভূমিকা থেকে, রামকৃষ্ণের জীবনের আকার এবং রামকৃষ্ণের উন্মোচিত সত্তার রূপ দর্শন করে আমরা বলতে পারি—এই গ্রন্থ ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে মনোযোগী গভীরস্বভাব পাঠকের কাছে এক নিমগ্নকারী অসামান্য নথি-পুস্তক বলে গৃহীত হবে। ধর্মীয় রহস্যবাদ এবং পবিত্র ঋষিত্বের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ এক অতি বিরল সদ্‌বস্তু, তা এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রাচীন মহান ধর্মনায়কদের বিরাট ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত তিনি । এই গ্রন্থে অপূর্ব জীবন্তভাবে তাঁর শিক্ষা এবং অধ্যাত্মচেতনা প্রকাশিত। পাশ্চাত্য পাঠকরা ধর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁদের পূর্ব ধারণার সঙ্গে নববোধ যুক্ত করতে পারবেন—এই গ্রন্থপাঠে ।

[স্বামী নিখিলানন্দকে লিখিত পত্রাংশ]

দর্শন এবং ধর্মের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগৎ অন্যায়ভাবে নিজ সীমায় আবদ্ধ। পাশ্চাত্যের দর্শন সর্বদাই আরম্ভ হয় প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল থেকে; তার রহস্যবাদ আরম্ভ হয় প্লেটো কিংবা প্লটিনাস থেকে; আর তার ধর্ম—জিউস, জিহোভা অথবা যীশুখৃস্ট থেকে। সাধু-সন্তের ব্যাপারে পাশ্চাত্যবাসীদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন—একালে ওঁদের অস্তিত্ব সম্ভবপর! সাধু-সন্তদের অবস্থিতি কেবল বহুবর্ণ কাচ-চিত্রে কিংবা মধ্যযুগীয় গল্পে।

তিয়াত্তর পৃষ্ঠায় ঠাসা ভূমিকা-সহ স্বামী নিখিলানন্দ-অনূদিত 'দি গসপেল অব রামকৃষ্ণ'—পাশ্চাত্য পাঠকদের ধর্মচিন্তা এবং অধ্যাত্মরহস্যবাদ সম্পর্কিত গ্রন্থসংগ্রহে এক যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ ও বিচিত্র সংযোজন। এই গ্রন্থের রামকৃষ্ণ পার্থিব দৃষ্টিতেও এক যথার্থ সন্তপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের এই আধুনিক এবং উত্তরোত্তর যান্ত্রিক সমাজে তিনি সমুচ্চ আধ্যাত্মিক এক ধর্মের মন্ত্রসিদ্ধ আচার্য। সেইসঙ্গে তিনি অধ্যাত্মচেতনার যথার্থ সর্বজনীন রূপের অসাধারণ প্রভাবশালী উদ্‌গাতা। ঐ সর্বজনীন বোধের প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দুধর্ম, খৃস্ট ধর্ম এবং ইসলামের ধর্মধারণাকেও ব্যবহার করেছেন।

এই গ্রন্থের পরিবেশের প্রধান অংশ এবং বিষয়বস্তুর প্রধান অংশও অবশ্য হিন্দু-ছাঁচে ঢালাই, তা অতি বিশুদ্ধ দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ। একথা সুপরিচিত—ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ— কৃষ্ণ এবং বুদ্ধের সমস্তরের আধ্যাত্মিক পুরুষ হিসাবে স্বীকৃত।

রামকৃষ্ণের বাস্তব কথাবার্তার মধ্যে এমন বস্তু আছে যা বলে বোঝানো কঠিন। তার মধ্যে রয়েছে প্রাচীন দৈববাণীর প্রজ্ঞারূপ, সক্রেটিসের তীক্ষ্ণধার উক্তি-বৈশিষ্ট্য, কনফুসিয়াসের ঘরোয়া সহৃদয়তা এবং ডাঃ জনসনের ব্যক্তিগত টুকরো কাহিনীর চেহারা।

স্পষ্টই দেখা যায়, রামকৃষ্ণ ঈশ্বরসান্নিধ্যের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষার অধ্যাত্মকেন্দ্র রয়েছে অতীব মানবিক এবং সহিষ্ণু নীতির আশ্রয়ে। পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে, ঠিকভাবে বলতে গেলে তাদের কাছে উপস্থিত জনশ্রুতিতে—হিন্দুধর্ম হল প্রধানতঃ এক বিমূর্ত ছায়াচ্ছন্ন সুদূরবর্তী দার্শনিক মতবাদ; কিংবা তা কোমল ভাবালুতায় পূর্ণ অধ্যাত্মবাদ। রামকৃষ্ণ-উক্তিসমূহের এই অনুবাদ এবং তাঁর এই জীবনী—পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তার কঠিন মর্মকেন্দ্রে ভারতীয় ধর্মের মানবিক ঐতিহ্যের এক নব উপহার হাজির করেছে।

['এশিয়া এন্ড দি আমেরিকাজ' পত্রিকায় আরউইন এডম্যান-কৃত আলোচনা। শংকরীপ্রসাদ বসুর সংগ্রহ। অনুবাদ সুদীপ বসু]

নিত্য বর্তমানের কথা—কথামৃত

ক্রিস্টোফার ইশারউড

রামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থটিতে মোট ৫২টি অধ্যায় আছে। ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে ১৮৮৬র এপ্রিল পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে এই গ্রন্থে দেওয়া আছে। ১৮৮৬র ২৪শে এপ্রিল তারিখে সস্ত্রীক শ্রীম ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কিছুদিন আগেই আর এক ছেলের মৃত্যু হয়েছে। সেই থেকে প্রায় পাগলের মতন হয়ে গেছেন শ্রীম'র স্ত্রী। রামকৃষ্ণ ব্যাপারটি জানতেন, তাই শ্রীমকে পরিবার নিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন। রামকৃষ্ণ নিজেও তখন গুরুতর পীড়িত। সারদাদেবী সর্বক্ষণ তাঁর সেবা করছেন। তবুও শ্রীম'র পত্নীকে কাছে ডেকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন, তারপর সারদার সঙ্গে কিছুদিন বাস করতে বললেন। শ্রীম অভিভূত। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গসুখ লাভ করে তাঁর স্ত্রী যে নিশ্চিত সান্ত্বনা পাবেন তা ভেবে শ্রীম কৃতার্থ। রাত প্রায় ন'টা। শ্রীম তাঁকে হাতপাখার বাতাস করছেন। ভক্তেরা রামকৃষ্ণের গলায় একটি ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে গেছেন। গলা থেকে মালাটি খুলে রামকৃষ্ণ আপন মনে কি যেন বললেন, তারপর মালাটি শ্রীমকে দিলেন। শ্রীম লিখছেন, 'সেদিন ঠাকুর ছিলেন আশ্চর্য কৃপাপরবশ।' শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীম'র এটিই শেষ প্রত্যক্ষ বিবরণ। এর পরও রামকৃষ্ণ সাড়ে তিনমাস মর্ত্যলোকে ছিলেন। এই দিনগুলির বিবরণ শ্রীম'র দিনলিপিতে লেখা নেই। তখন রামকৃষ্ণের শরীর দিন-দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। তবুও সন্ন্যাসী-ভক্তদের ডেকে সাধনার ধারা শিখিয়ে দিতেন। হয়ত, সেই কারণেই গৃহীভক্তদের দিকে কৃপাদৃষ্টি দেবার অবসর তিনি পান নি। তবুও প্রায় প্রত্যহই শ্রীম তাঁর কাছে আসতেন। অনুমান হয়, শ্রীম ইচ্ছাকৃতভাবেই রামকৃষ্ণের ক্যান্সার রোগের যাতনাময় দিনগুলির কথা দিনলিপি থেকে বাদ দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই যে আলোকচিত্রটি নেওয়া হয়েছিল, সেখানে শ্রীমকে একেবারে শেষের সারিতে দীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ১৮৮৬র ১৬ই আগস্ট তারিখের অপরাহ্ণে ছবিটি তোলা হয়েছিল।…

রামকৃষ্ণের দেবত্ব সম্পর্কেও শ্রীম'র সত্যবোধ প্রশ্নাতীত ছিল। এ ব্যাপারে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে, পৃথকভাবে রামকৃষ্ণের মহিমা প্রচারের কথা তাঁর মনেও হয়নি। রামকৃষ্ণ যা বলতেন, যা করতেন, সে সবই শ্রীম'র কাছে পবিত্র মনে হ'ত। যা তিনি দেখেছেন, শুনেছেন তার কিছুই বাদ দেননি, বদলও করেননি। কথামৃতের বিবরণের মধ্যে রামকৃষ্ণকে আমরা অখণ্ড চৈতন্যসত্তারূপে প্রত্যক্ষ করি। কখনও তিনি ঈশ্বরবৎ; কখনও বালকবৎ; কখনও মহান, কখনও বিচিত্র; কখনও সর্বোচ্চ জ্ঞানের কথা বলছেন, কখনও জীবজন্তুদের নিয়ে কৌতুককর নীতিগল্প শোনাচ্ছেন, কখনও

উন্মাদবৎ হয়ে নৃত্যগীত করছেন, কখনও-বা আনন্দাতিশয্যে মাতালের মতন স্খলিত চরণে পথ চলেছেন। যখন ভক্তদের ভর্ৎসনা করছেন তখন কী প্রগাঢ় পরিণত জ্ঞান! কিন্তু পরক্ষণেই হয়ত কটিদেশের বস্ত্রখণ্ডটি শিথিল হয়ে গেল, আর বালকের মতন নগ্ন হয়ে তিনি পথ হাঁটতে লাগলেন।

যারা ঈশ্বরজ্ঞান পেতে চাইত রামকৃষ্ণ তাদের দর্শন দিতেন। এদের কারো মধ্যে যশোলিপ্সা দেখলে, পুঁথিগত জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ দেখলে, কিংবা কেউ অনাসক্তির ভাণ করে ইহসুখের জন্য লালায়িত হলে—তাঁর আচরণে এতটুকু বিদ্বেষ দেখা যেত না। কিন্তু নবব্রতীদের সম্পর্কে তাঁর শাসন খুব কঠোর হ'ত। কারণ, তিনি জানতেন, ত্রুটিগুলি শোধন করে নিলে নবব্রতীরা শুদ্ধ হবে। যারা যথার্থই জ্ঞানী তাদের কাছে রামকৃষ্ণ খুব সহজ হতেন। বলতেন, যারা নেশা করে তারা নেশাখোরদের সঙ্গই ভালবাসে। শিশুবালকদের যেমন ভালবাসতেন তেমনি তাদের সমীহও করতেন। এই সহাস্য প্রেমের এক অপরূপ বৃত্তান্ত শ্রীম কথামৃতে উল্লেখ করেছেন। ঘটনার তারিখ ৩রা জুলাই ১৮৮৪। ছয় কি সাত বছরের এক বালিকা রামকৃষ্ণকে প্রণাম করল। কিন্তু রামকৃষ্ণ খেয়াল করেননি। মেয়েটি তাই ধমক দিয়ে বলল, 'আমি নমস্কার করলুম, দেখলে না?' এই ব'লে বালিকা আবার তাঁকে নমস্কার করল। রামকৃষ্ণও তখন হাসতে-হাসতে বালিকাকে প্রতিনমস্কার করলেন। পরে বালিকাকে একখানি গান শোনাতে বললেন। বালিকা বলল, 'মাইরি, গান জানিনা।' রামকৃষ্ণ আবার তাকে গান গাইতে বললেন। বালিকা বলল, 'মাইরি বললে আর বলা যায়?' রামকৃষ্ণ তখন নিজেই গান ধরলেন। সবাই আনন্দ করছে, হাসছে। রামকৃষ্ণ গাইলেন, 'আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি। তোর ভাতার এলে বলবে কি!' গান শেষ ক'রে রামকৃষ্ণ ভক্তদের বললেন, 'পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মতন। সব চৈতন্যময় দেখে।'...

কথামৃতের যে-কাহিনী তা নিত্যকালের। এ আখ্যায়িকায় অতীত নেই, ভবিষ্যতও নেই। বর্তমানই এর কাল। আমরা অধিকাংশ মানুষ অতীত ও ভবিষ্যতের ভাবনাতেই মগ্ন থাকি। হয়, যা ঘটে গেছে তার জন্য দুঃখবোধ করি, নয়ত আগামী দিনের প্রত্যাশা নিয়ে সুখস্বপ্ন দেখি। শ্রীম তাঁর কথামৃতে এখন এক সত্তার কথা বলেছেন, যিনি নিত্যভাবে বর্তমানের মধ্যে বিরাজ করছেন। বাস্তবিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অতীত বা ভবিষ্যৎ থাকে না। তিনি ছিলেন বা থাকবেন তা নয়, তিনি সর্বক্ষণই আছেন। রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাবার অর্থ হলো—সেই বর্তমানের মধ্যেই থাকা। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যাঁরা আসতেন তাঁরা সবাই যে এই সত্যটি উপলব্ধি করতেন তা নয়। কিন্তু শ্রীম তাঁর প্রথম দর্শনের দিনটি থেকেই সত্যটি যথাযথ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই রামকৃষ্ণের কাছাকাছি হবার সুযোগটি তিনি ভাগ্যের কৃপা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। আখ্যায়িকার প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে তাই আমরা একজন নগণ্য স্কুল মাস্টারের বিস্ময়মুগ্ধ কৃতার্থ মনের পরিচয় পাই, পাই তাঁর

শ্রদ্ধা। প্রতিটি ঘটনারই অন্তর্গত মাহাত্ম্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন। অতি তুচ্ছ বর্ণনার মধ্যেও যে যাদু আছে তা পাঠ করে আমরা উদ্দীপিত হই। সেইরকম সাধারণ এক ঘটনার বিবরণ কথামৃত থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ

'গাড়ি চলিতে লাগিল। ইংরেজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুই দিকে সুন্দর-সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা, স্থানে-স্থানে হার্মোনিয়াম, পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে-করিতে যাইতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ বলিলেন, "আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে; কি হবে?" কি করা যায়। নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের নিকট গাড়ি থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাসে করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্লাসটি ধোয়া তো?" নন্দলাল বলিলেন, "হাঁ।" ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন।

'বালকের স্বভাব। গাড়ি চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন গাড়ি-ঘোড়া চাঁদের আলো দেখিতেছেন। সকল তাতেই আনন্দ। পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছেন। তাহাতেও আনন্দ।'…

রামকৃষ্ণকে অনেক রূপে অনেক পরিমণ্ডলে শ্রীম আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁকে দিনে দেখিয়েছেন, রাতে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে, বলরাম-ভবনে এবং অন্য ভক্তগৃহেও। দেখিয়েছেন কেশব সেনের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহারে, দেখিয়েছেন কলকাতার রাস্তায় অশ্বশকটে। অনেক মানুষ তাঁর কাছে আসতেন। শিষ্যেরা আসতেন, আসতেন গৃহীভক্তরাও, আবার সাধারণ দর্শনপ্রার্থী মানুষও আসতেন। রামকৃষ্ণের কাছে এদের জানবার বিষয় একরকমই হত; তাই রামকৃষ্ণের উত্তরের মধ্যেও পুনরুক্তি থাকত। শ্রীম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব ঘটনাই লিপিবদ্ধ করেছেন; এমন কি রামকৃষ্ণ যে-গানগুলি বারবার গাইতেন তারও যথাযথ নকল রেখেছেন। নবাগত পাঠকের কাছে কথামৃতের এই পুনরুক্তি-দোষ প্রথম-প্রথম একঘেয়ে মনে হতে পারে; কিন্তু যথেচ্ছ পাঠের বদলে পাঠক যদি ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহলে প্রত্যহের খুঁটিনাটির মধ্যেই জীবনধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহটি তিনি খুঁজে পাবেন। যিনি কখনও পুনরুক্তি করেন না তিনি যত্ন ক'রে জীবনকে শিল্প-মণ্ডিত ও পরিচ্ছন্ন করতে সক্ষম হলেও প্রাণের ছোঁয়া সেখানে থাকে না।

প্রথম অধ্যায় থেকেই রামকৃষ্ণের শিক্ষণ-ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে যায়। প্রতিটি নীতি-উপদেশের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়ে মুখ্য বাণীগুলি তিনি ভক্তদের বুঝিয়ে দিতেন। কখনও আপন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা সরাসরি ব্যক্ত করে ভক্তদের উপদেশ দিতেন, কখনও-বা উপাখ্যান সহযোগে উপদেশ দিতেন। এইসব গল্প-উপাখ্যান বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের জীবনধারার মধ্যে থেকেই কুড়িয়ে আনা। তার মধ্যে যেমন কৌতুক থাকত, তেমনি থাকত সংসারের কঠিন বাস্তব-জ্ঞানের সঙ্গে

মিশ্রিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান। যেমন, 'সাপ ও তার ফোঁস' করার গল্প। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, শ্রীম ছিলেন মুখ্যত গৃহীভক্ত—সুতরাং রামকৃষ্ণ তাঁর সন্ন্যাসী-ভক্তদের যে-উপদেশগুলি দিয়েছেন তাদের উল্লেখ কথামৃতে নেই। কথামৃতের মধ্যে আমরা যা পাই সে সবই সংসারী-ভক্তদের জন্য।

তা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণের যথার্থ ভাবরূপটি, সন্ন্যাসী গৃহী সব ভক্তই দেখেছেন। তাঁর সমাধি এবং সেই ভাবঘনরূপের মধ্যে কখনও আত্মকথন, কখনও উদ্দীপন এবং সেই আরূঢ়ভাবে অবস্থিত থেকে নৃত্যগীত—এসব দর্শনে শুধু যে সন্ন্যাসী এবং গৃহী-ভক্তেরা ধন্য হয়েছেন তা নয়, দক্ষিণেশ্বরে হঠাৎ এসে-পড়া সাধারণ মানুষও এই দুর্লভ দর্শন লাভ করে রোমাঞ্চিত হয়েছেন। এই চিদানন্দরূপটিই তাঁর যথার্থ পরিচয়। ঈশ্বর যে আছেন, তা তাঁর এই দিব্যভাবরূপের মধ্যেই প্রতিফলিত হত। অতি বড় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কিংবা অনুভূতিহীন মানুষ ছাড়া আর সবাই সেদিন এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর এই ভাবরূপের কাছে অন্যের সারগর্ভ উপদেশ ম্লান হয়ে গেছে।

প্রতিটি দর্শনের পরেই রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণীগুলি শ্রীম আদ্যোপান্ত টুকে রাখতেন। কথিত আছে, দর্শনের পরের তিনটি দিন চলে যেত সেগুলি লিপিবদ্ধ করতে। তবুও পুস্তিকাকারে প্রকাশের আগে উপকরণগুলি সাজাতেই তাঁর জীবনের পঁয়ত্রিশটি বছর কেটে যায়।

শ্রীম প্রথমদিকে পুস্তিকা প্রকাশে একেবারেই আগ্রহ দেখান নি। তিনি বলতেন, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই তিনি এই দিনলিপি রচনা করেছেন। কিন্তু পরে, অনেকগুলি কারণের সম্মিলিত প্রেরণায়, তাঁকে মত বদলাতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেছেন ; নবীন সন্ন্যাসীরা বরানগরে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন শ্রীম ছিলেন তাঁদের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। সে সময় তিনি দুটি ইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। একটির বেতন দিয়ে সংসার চালাতেন ; অন্য বেতনের সবটুকু মঠের ভাইদের প্রতিপালনে ব্যয় করতেন। মঠের এইসব ভাইরাই শ্রীমকে দিনলিপি প্রকাশে উৎসাহ দিতেন। তবুও গ্রন্থপ্রণয়নে শ্রীম তেমন ব্যাকুল হন নি। এর অনতিকাল পরেই সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে এবং শ্রীম তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হন। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদা দিনলিপিটি শুনতে চাইলেন। সম্পূর্ণ শোনার পর মাতা সারদা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সম্পূর্ণ লিপিটি ছেপে প্রকাশ করতে আদেশ দেন। জগন্মাতার সে আদেশ শ্রীম শিরোধার্য করেছিলেন।...

শ্রীম যদি জানতেন যে, অলডাস হাক্সলি একদিন তাঁকে জীবনীলেখক বসওয়েলের সঙ্গে তুলনা করবেন এবং 'কথামৃত'কে জীবনীসাহিত্যের মধ্যে অদ্বিতীয় সৃষ্টিরূপে অভিহিত করবেন, তাহলে অবশ্যই তিনি অভিভূত হতেন। তবে একথা ঠিক যে, হাক্সলির এই স্তুতিবাদ ঘটনার স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছু না। পরবর্তী যুগের মানুষের সেবায় শ্রীম যে-কাজটি ক'রে গেছেন তাকে বাড়িয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

তেমন একটি মহৎ কাজের দায়িত্ব পেলে যে-কোনো আত্মগর্বিত লেখকই বিনয়ে গদগদ হয়ে উঠতেন। কিন্তু শ্রীমর মধ্যে এতটুকুও আত্মশ্লাঘা দেখা যায় নি।

রামকৃষ্ণের এই জীবনাদর্শ গৃহীভক্তদের জন্যই শ্রীম প্রচার করে গেছেন। আমরা তাঁকে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং যোগ্য শিক্ষকরূপে জানি। এও জানি যে, মর্যাদার সঙ্গেই তিনি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তবুও নিজেকে তিনি অন্যের সমকক্ষ ভাবতেন না; নিজেকে সকলের দীন সেবক মনে করতেন। এমন বাসনাশূন্য একজন মানুষকে সংসার কোনো কিছু দিয়েই জয় করতে পারে না; এমনকি ভালবাসা দিয়েও নয়। তবুও যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই শ্রীমকে ভালবেসেছেন। শোনা যায়, বড়-বড় অট্টালিকার গাড়ি-বারান্দার নিচে তিনি নিজের বিছানাটি পেতে গৃহহীনদের মধ্যে রাত কাটাতেন। শ্রীম নিজেকে রামকৃষ্ণের নীতিগল্পের সেই দাসীটির মতো ভাবতেন, যে পরের ঘরে কাজ করলেও মনে-মনে জানত তার আসল ঘর অন্যত্র।

শ্রীম'র প্রয়াণ হয় ৪ঠা জুন ১৯৩২। যাবার বেলায় তাঁর শেষ কথাটি ছিল, 'মা—ঠাকুর, আমাকে তোমাদের কোলে তুলে নাও।'

[ক্রিস্টোফার ইশারউডের 'রামকৃষ্ণ অ্যান্ড হিজ্ ডিসাইপলস্' গ্রন্থের রবিশেখর সেনগুপ্ত-কৃত অনুবাদ 'রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ' থেকে সংকলিত]

তোমার ধ্যানে নূতন তীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মহাত্মাগণ সত্যের সর্বাত্মক ধারণায় সমর্থ। পরম তত্ত্বের বিভিন্ন রূপের তাৎপর্য অনুধাবন করবার শক্তি তাঁদের আছে—তাঁরা বহুর মধ্যে একত্বের অনুভব করেন।…পরমহংসদেবকে আমি শ্রদ্ধা করি কারণ ধর্মক্ষেত্রে বিশুষ্ক নৈরাজ্যের যুগে তিনি উপলব্ধিযোগে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তা সম্ভব হয়েছে যেহেতু তাঁর বিশাল সত্তা ধর্ম-সাধনার আপাতবিরোধী পথগুলিকে সম্মিলিত করতে পেরেছিল—এবং তাঁর সহজ স্বরূপ পণ্ডিত ও ধর্মধ্বজীদের বিদ্যাভিমান ও আড়ম্বরবাহুল্যকে হতমান করেছিল চিরদিনের জন্য।

[১৯৩৬, রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষণ থেকে সংকলিত ও অনূদিত]

যুগের অবতার রামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণীর প্রামাণিকতা

শ্রীঅরবিন্দ

[ধর্মজগতে গোঁড়া মানুষেরা] বলে, 'আমার গুরুই একমাত্র গুরু, বাকি সকলে হয় ভণ্ড, না হয় তুচ্ছ।…কিংবা বলে, 'আমার অবতার পূর্ণ ভগবান, অন্যের অবতার—অংশাবতার।' তারা বলেই থাকে, 'আমার ইষ্টদেবতা ঈশ্বর, অন্যের ইষ্টদেবতাগণ তাঁর খণ্ডরূপ।'

আত্মা যখন ক্রমেই ঊর্ধ্বে উত্তরণ করে তখন তা নিজ ভাব, অভিজ্ঞতা, ধারণা, মেজাজ, গুরু, ইষ্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত পক্ষপাত বোধ করে, কিন্তু তাই বলে অপরের দিকে অজ্ঞ বা ঠুলিবাঁধা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। 'পথ এক নয় অনেক'—তাঁরা ঘোষণা করেন—'সকল পথই সমভাবে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। সকল মানুষই, পাপীরাও, নাস্তিকরাও, সাধন-জগতে আমার ভ্রাতা। পরমপ্রিয় প্রভু তাদের সকলকে তাদেরই পথ দিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করছেন—সেখানে আছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।' তারপর যখন পূর্ণজ্ঞানের উদয় হয় তখন সকল অভিজ্ঞতাকে আমরা নিজের মধ্যে গ্রহণ করি, আমরা তখন জেনেছি—সকল ভাবই সত্য, সকল মতই প্রয়োজনীয়—সর্বজনীন ও সর্বাত্মক অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষেত্রে সকল অভিজ্ঞতা ও মনোভাব বিভিন্ন উপায় ও অধ্যায়, সকল গুরুই অসম্পূর্ণ প্রণালী—কিংবা তাঁরা এক ও অদ্বিতীয় আচার্যের নব রূপ, সকল ইষ্ট ও অবতার স্বয়ং ঈশ্বর।

এই সকল কথাই রামকৃষ্ণ তাঁর জীবন ও সাধনার দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—সে কারণে তিনি যুগাবতার—তিনি সেই পরম পুরুষ যিনি ভাবী মানবসমাজকে প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু তাঁকে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের গুরু করার, তাঁকে সংকীর্ণ আসক্তি, অসহিষ্ণু ভক্তি, সাম্প্রদায়িক উপাসনার বিষয়বস্তু করে তুলে তাঁর জীবন ও শিক্ষাকে জড়বস্তু করে তোলার বিপদ আছে। সে প্রয়াস থেকে দূরে থাকতে হবে। ধর্মসংগঠনের ক্ষেত্রে এই এক মহা অভিশাপ।…ভবিষ্যতের জন্য প্রথম প্রয়োজন বন্ধনভঙ্গ, স্বাধীনতার উপলব্ধি, শৃঙ্খল ছেদন। মুক্তি দিতেই রামকৃষ্ণ এসেছিলেন, নতুন বন্ধন সৃষ্টি করতে নয়।

রামকৃষ্ণ অশিক্ষিত মানুষ, বুদ্ধিজীবী নন, কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর প্রকাশ-ক্ষমতা এমন নিখুঁত ছিল যে, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরাও তাঁর সামনে মাথা নত করেছেন।

সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও কার্যাবলীর খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রামাণিকতা

সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতো সুদক্ষ পর্যবেক্ষক তাঁর দৈনন্দিন বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

['শ্রীঅরবিন্দ রচনাবলী' থেকে সংকলিত]

জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন—ধর্মকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার কাহিনী। তাঁর জীবন আমাদের ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করার সামর্থ্য দিয়েছে। তাঁর জীবন-চরিত পড়লে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, অন্য সকলই মায়া। রামকৃষ্ণ ঈশ্বরত্বের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর উক্তিসমূহ নিছক পণ্ডিতের উক্তি নয়; সেগুলি জীবনগ্রন্থেরই পৃষ্ঠা, সেগুলি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উদ্ঘাটন। তাই সেগুলি পাঠকের মনে যে ছাপ রেখে যায়, তার থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। এই সংশয়ের যুগে রামকৃষ্ণ, বিশ্বাসের জীবন্ত ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যা সহস্র-সহস্র নরনারীর জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করেছে। তাঁর দৃষ্টান্ত-ভিন্ন ঐ সকল নরনারীরা আধ্যাত্মিকতার আলোক লাভ করতে পারত না। রামকৃষ্ণের জীবনে আছে অহিংসার পরম শিক্ষা। তাঁর প্রেম ভৌগোলিক বা অন্যবিধ সীমাকে স্বীকার করত না।

[অমিত ঘোষ কর্তৃক অনূদিত]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর উক্তি-প্রসঙ্গ

বিনোবা ভাবে

[ভূদান যজ্ঞের ঋষি বিনোবা ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মভূমি কামারপুকুরে উপনীত হয়ে তাঁর কর্মযজ্ঞের এক পর্বের পূর্ণাহুতি দান করেন। এ সম্পর্কে চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী সম্পাদিত 'ভূদান যজ্ঞ' পত্রিকার ২৭ এপ্রিল, ১৯৬৩ সংখ্যা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে—]

দান-যাত্রা সমাপ্ত : ত্যাগ-যাত্রা আরম্ভ
গত ১৮ এপ্রিল ভূদান যাত্রার যুগপূর্তি দিবসে
কামারপুকুরে সন্ত বিনোবাজীর ঘোষণা

"১২ বৎসর পূর্বে ঠিক এই দিনটিতে আমি প্রথম ভূমিদান লাভ করি। দান হিসাবে আমি সহস্র-সহস্র গ্রামদান এবং লক্ষ-লক্ষ একর ভূমিদান পাইয়াছি এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে তাহা বিতরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আজ হইতে আমার দানযাত্রার পরিবর্তে ত্যাগযাত্রা আরম্ভ হইবে। ত্যাগের মধ্যে দান তো লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে। গ্রামদান করিয়া গ্রামবাসীরা এই ত্যাগের অভিযান আরম্ভ করিবে।"

গত ১৮ এপ্রিল আচার্য বিনোবা ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরে প্রার্থনাভাষণে উপর্যুক্ত মন্তব্য করেন।

প্রার্থনা সভায় বিনোবাজীকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা প্রসঙ্গে অশ্রুবিসর্জন করিতে দেখা যায়। তিনি ঠাকুরের বাণী স্মরণ করিয়া বলেন যে, গীতার ভাষ্য অনেকে অনেকরকম ভাবে করিয়াছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো এত সহজ ও গভীর ব্যাখ্যা আর কেহ দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, গীতা মানে ত্যাগী। 'গীতা গীতা' উচ্চারণ করিলে 'ত্যাগী ত্যাগী' উচ্চারিত হইবে। বিনোবাজী আশা প্রকাশ করেন যে, সকলে ঠাকুরের বাণী স্মরণ করিয়া ত্যাগ, ভক্তি ও শান্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবে।...

বিনোবাজী তাঁহার ভাষণে আরও বলেন, আপনারা জানেন, রামকৃষ্ণ বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না। বাল্যকালে সেজন্য তাঁর মনে দুঃখও ছিল। [?]। ভগবতীর উপর তাঁর ভক্তি ছিল। তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন, তিনি যেন তাঁকে কিছু বিদ্যা দেন। স্বপ্নে একদিন তাঁকে দর্শনও দিলেন, এবং বললেন, তুমি তো বিদ্যা চাও? ঐ যে আবর্জনার স্তূপ দেখছ, ওখানে খুব বিদ্যা পড়ে আছে, যত নেবার নাও। রামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, ঐ আবর্জনারাশির বিদ্যা তাঁর প্রয়োজন নাই।

বিনোবাজী বলেন, বিদ্যা দুই প্রকারের; এক আবর্জনাস্তূপের, আর দ্বিতীয় সাফাইয়ের বা পরিচ্ছন্নতার। পরিচ্ছন্নতার বিদ্যার আধার হল হৃদয়শুদ্ধি, আর দ্বিতীয় বিদ্যা হল দাসীর বিদ্যা—সে বিদ্যা পয়সার দাসী।

['ভূদান যজ্ঞ' পত্রিকার একই সংখ্যায় মনকুমার সেন 'সর্বোদয় ও বেদান্ত' প্রবন্ধে বর্ণনা করেন, বিনোবাজী কিভাবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রতিপাদিত বেদান্ত-পথ গ্রহণ করেছেন। ঐ প্রবন্ধের শেষ অংশ—]

"গত ১৮ এপ্রিল বিনোবাজীর ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনের এক যুগ পূর্ণ হয়েছে। নতুন যুগের ভোরে বেদান্তের এই নবীন অভিযাত্রী প্রবেশ করেছেন বেদান্তদর্শনের বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মগ্রাম কামারপুকুরে, নিজেকে সাধনায় নিবেদন করেছেন পরমহংসের সন্তানরূপে। বিনোবাজী ঘোষণা করেছেন, 'আজ থেকে আমার ত্যাগযাত্রা শুরু হল।' ত্যাগের মন্ত্রে যিনি জগৎ জয় করেছেন, তাঁর পুণ্যময় জন্মভূমিতে সর্বত্যাগী-যাত্রার দীক্ষা নিয়েছেন বিনোবাজী।"

[শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সংগ্রহ]

আধুনিককালে হিন্দুধর্মের সর্বোত্তম ভাষ্য

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

উনিশ এবং বিশ শতকে অনেক বিরাট পুরুষ জনগণের কাছে হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দুধর্মকে অন্য ধর্মের পোশাক পরিয়েছিলেন। উনিশ শতকে হিন্দু ধর্মসত্য বোঝাবার জন্য অপর ধর্মের সাহায্য নিতে হয়েছিল। একথা বললেই যথেষ্ট হবে, ব্রাহ্মসমাজ খৃস্টীয় বোতলে পুরে হিন্দুধর্মকে উপস্থিত করেছিল উত্তম ঔষধরূপে। থিওসফিক্যাল সোসাইটি হিন্দু-ধর্মকে আধুনিক রহস্যবাদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছিল। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল—রাম এবং কৃষ্ণকে খৃস্টের অধীনে শিক্ষানবিশী করতে হচ্ছিল যাতে লোকে তাঁদের গ্রহণ করে। এহেন পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাটত্ব ও অনন্যত্ব এই—তিনি ষোলোআনা হিন্দু।

তিনি কিছু লিখে যাননি, বই পড়েননি—অন্য মানুষেরা তাঁর চিন্তা ও উক্তিকে লিখে গেছেন। এই রকম ঘটনার একটা পূর্ব-দৃষ্টান্ত আছে। নিউ টেস্টামেন্টের নায়ক মহান যীশুখৃস্ট কোনো বই লেখেননি কিন্তু তাঁর চারপাশে এমন মানুষরা ছিলেন যাঁরা তাঁর চিন্তা ও কর্মের বিবরণ লিখেছেন। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ এমন জীবন-যাপন করেছিলেন, এমন সব কথা বলেছিলেন, তাতে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁর নিকটস্থ মানুষেরা অনুভব করেছিলেন—এই সকলের বিবরণ থাকা উচিত। তারই ফলে রামকৃষ্ণকথা আমরা পেয়েছি। একটি বিশেষ কারণে এই প্রসঙ্গ এনেছি। প্রায়ই আমার কাছে লোকজন এসে বলে—আমি উত্তম জীবন যাপন করতে চাই, আমি কি করব, কি পড়ব, বলে দিন। বিদেশীরা এসে বলে, হিন্দুধর্মের মর্মসত্য বুঝতে পারব কি পড়লে, তা বলুন। আমি এ-বিষয়ে অনেক চিন্তা করবার পরে তাদের সকলকেই—যে-বিদেশীরা হিন্দুধর্মসত্য বুঝতে চায় তাদের, যে-হিন্দুরা উত্তম জীবন যাপন করতে চায় তাদের—বলেছি, একটি উপায়ের কথা আমি জানি, তার থেকে ভালো উপায় সম্ভব নয়; রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি নামক গ্রন্থ সংগ্রহ করো—ইংরেজি, তামিল বা যে-কোনো ভাষাতেই হোক—সেই বইটি পড়ো, তাহলে তোমরা হিন্দুধর্মকে বুঝতে পারবে এবং উত্তম মানুষ হয়ে উঠবে। আমি সকলকে একই কথা বলেছি। হিন্দুধর্মের উপর প্রাচীন আধুনিক অনেক বই আছে, ভগবদ্‌গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি। সেসব বই পণ্ডিতদের জন্য। তাদের পড়লে উপকারই হবে। কিন্তু কোনো কিছুই হিন্দুধর্মের মর্মসত্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তিসমূহের মতো করে প্রকাশ করতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে যদি তোমরা উপনিষদ অথবা ভগবদ্‌গীতার উপর উত্তম ভাষ্য চাও

তাহলে বলব, "সেইংস্ অব শ্রীরামকৃষ্ণ" বইটি পড়ে নাও। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য পড়বার চেষ্টা করো না, তা বুঝবার মতো পাণ্ডিত্য তোমাদের নেই। তাই তার দ্বারা বেশী উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যথেষ্ট সময় বা অবসর না থাকলে কেবল চুপচাপ মূলগ্রন্থ পড়ে যাও। ওসব নিয়ে তর্কবিতর্ক করো না; তা না করলে উপকার হতে পারে। আর যদি সত্যই বোধগম্য ভাষ্য চাও তাহলে "সেইংস্ অব শ্রীরামকৃষ্ণ" পড়ো। দেখতে পাবে, গোটা বইটির প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা ভগবদ্গীতা এবং উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্য।

কিভাবে এ জিনিস সম্ভব হল? হবার কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এমন সর্বাত্মকভাবে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিপুরুষ যে, অসচেতনভাবে তিনি হিন্দুধর্মের মহান শাস্ত্রসমূহের ভাষ্য হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর উক্তিসমূহ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ উন্মোচক রচনা হয়ে উঠেছে। আধুনিককালে এর চেয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতর অন্য কোনো ভাষ্য রচিত হয়নি। এই গ্রন্থ কিভাবে সঠিক চিন্তা করতে হয়, শ্রেয় জীবনযাপন করতে হয়, তা তোমাদের শিক্ষা দেবে। আমি রাজনৈতিক ব্যক্তি। আমরা রাজনীতির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে উন্নীত করতে চাই। কিন্তু আমাকে একথা বলতেই হবে, আমি যতই রাজনৈতিক হই না কেন, রাজনীতির দ্বারা ভারতবর্ষকে বাঁচাতে পারব না, ভারতবর্ষকে সুখী করতে পারব না। তা করতে পারব যদি উত্তম মানুষ হয়ে উঠি। আর উত্তম মানুষ হতে গেলে একমাত্র উপায়—শ্রীরামকৃষ্ণের অর্চনা। তাঁকে পুরোপুরি পুজো করতে হবে। যদি পুজোর মনোভাব নিয়ে, প্রেমের মনোভাব নিয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির সম্মুখীন হওয়া যায়, তাহলে তাঁর সকল কথার মধ্যে এক নূতন তাৎপর্য এবং নূতন কার্যক্রমের সূত্র পাওয়া যাবে।

ধর্মের চেয়ে বাস্তব ব্যাপার আর কিছু নেই। ধর্ম ও দর্শনকে অবাস্তব বা অপার্থিব মনে করার কারণ নেই। ঐ রকম মনে করা মানে পণ্ডিত হয়ে পড়া। তখন কেবল বক্তৃতা করবে, মোটা মাইনে পাবে, এইসব। কিন্তু কদাপি অপরের সেবক হতে পারবে না। আর যদি ধর্মকে বাস্তব জিনিস বলে মনে করো তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি পাঠ করে উপকার পাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি সহজ সরল। সাধারণ মানুষ তা বুঝতে সমর্থ। তাতে আছে সহজ বুদ্ধির প্রকাশ, বাস্তব জীবনযাপনের নির্দেশ।

আমি মহান আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরক্ত। তাঁর কথা বলতে অত্যন্ত আনন্দ হয়। তিনি একালের ঋষি। প্রাচীনকালের অনেক ঋষির কথা আমরা শাস্ত্রে পড়েছি; তাঁদের লম্বা দাড়ি থাকত, তাঁরা বনে-জঙ্গলে বাস করতেন; তাঁদের নাকি এমন শক্তি ছিল যে, যদি তাঁরা বলতেন—হে ব্রহ্মা, নেমে এসো, হে বিষ্ণু, নেমে এসো, অমনি ব্রহ্মা বিষ্ণু নেমে আসতেন। কিন্তু সেসব এখন কাহিনীমাত্র, তাঁদের দর্শন এখন পাওয়া যায় না—একমাত্র দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের সিনেমায়, নানা বিচিত্র পোষাকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কালের যথার্থ ঋষি। তিনি আমাদের মধ্যে

এসেছিলেন, বাস করেছিলেন। এই মহাঋষিকে অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছেন। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তেমন কিছু মানুষকে আমি দেখেছি, স্পর্শ করেছি। আমার মহাসৌভাগ্য, বিরাট স্বামী বিবেকানন্দকে, বিরাট রামকৃষ্ণানন্দকে, যখন তাঁরা মাদ্রাজে এসেছিলেন, সত্যই তাঁদের দেখেছি এবং স্পর্শ করেছি। আমি তখন ল' কলেজের উদ্ধত ছাত্র, নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবতাম। সেইসময় স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো থেকে ফেরবার পথে মাদ্রাজে এসেছিলেন। যে-দল তাঁর মানপত্রগুলি রচনা করেছিল সেই দলে আমি ছিলাম। তখন আমার তরুণ বয়স। অল্প আগে উনিশ শতকের শেষ দশকে আমি যখন আর্টস কলেজের ছাত্র, তখন মহা সংস্কৃত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী পত্রিকায় 'এ রিয়্যাল মহাত্মন্" প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'মহাত্মা' শব্দটি তখন বিশেষ ব্যবহৃত হত না; গান্ধীজী তখনও মহাত্মা হননি। ঐ সময় ম্যাক্সমুলার যথার্থ মহাত্মা প্রবন্ধটি লিখলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে যথার্থ মহাত্মা বলে চিহ্নিত করলেন। তাতে আমার মনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে কিছু ঔৎসুক্য জাগল। কিন্তু ঐ প্রবন্ধ থেকে খুব বেশী কিছু পেলাম না। তারপর যখন স্বামী বিবেকানন্দ এলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেবাধর্ম তিনি প্রচার করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হল, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসমূহ প্রকাশিত হল, তখন আমি ঠিক-ঠিক বুঝতে পারলাম শ্রীরামকৃষ্ণের তাৎপর্য কি! যতপ্রকার রাজনীতি আছে সকলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, দেশের যত দুঃখকষ্ট আছে তা দেখবার পরে, আমাদের দেশের যন্ত্রণা সম্বন্ধে অপরের মুখে সবকিছু শোনবার পরে, আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—এ দেশের ভাগ্যের উন্নতি করা সম্ভব নয় যদিনা আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা উত্তম হিন্দু হই—মুসলমান এবং খৃস্টানরা উত্তম মুসলমান এবং খৃস্টান হন—আর উত্তম হিন্দু মুসলমান এবং খৃস্টান হতে গেলে, দেশকে বাঁচাতে হলে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করার চেয়ে শ্রেয়তর পথ কিছু নেই।

[বেদান্ত কেশরী, মে ১৯৪৭। অরুণ ঘোষ কর্তৃক অনূদিত]

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে উপনিষদ বলা মোটেই অত্যুক্তি নয়। প্রাচীন ঋষিদের মতোই এক মহাজ্ঞানী আমাদের কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন।...তিনি কোনো বই লেখেন নি, কোনো বক্তৃতা করেন নি। তিনি খাঁটি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছিলেন—বিদায়ও নিয়েছেন সেইভাবে। যেসব শিষ্যরা তাঁর কাছে বসে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর কথা শুনতে চাইতেন, তাঁদের কাছে তিনি কথা বলতেন। শিষ্যরাই গুরুর কথাগুলি লিখে নিয়েছেন।...ঐশ্বরিক জীবন যাঁরা যাপন করেন তাঁদের কথায় এক অদ্ভুত শক্তি থাকে। সাধারণ পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবীর রচনায় যা নেই, সেই শক্তি আছে সেখানে। যখন কোনো মহর্ষি কথা বলেন, তখন তাঁর সমস্ত জীবনই ব্যক্ত হয় তাঁর মুখে—তা কেবল বুদ্ধিজগতের ব্যাপার নয়। দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব,

মতবাদ, যত সুন্দর হোক, তার মধ্যে যত বস্তুই থাক, ঈশ্বর-প্রাণিত ব্যক্তির মুখোচ্চারিত কথার সঙ্গে কদাপি তার তুলনা চলতে পারে না।

['বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

আমার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

মোরারজি দেশাই

১৯২৪ সালে গোধরার পঞ্চমহলে কালেক্টরের একান্ত সচিব-রূপে কার্যকালে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' নামক বইটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। বইটি 'সস্তা সাহিত্য-মণ্ডল' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ঐ সংস্থা-প্রকাশিত সিরিজের আমি গ্রাহক ছিলাম। কথামৃত পড়ে আমার ধর্মানুভূতি স্পষ্টতর হয়েছে, দৃঢ়তর হয়েছে আমার ঈশ্বর-বিশ্বাস। মানুষের পক্ষে সত্যপথ অনুসরণ করে, নিজ বিশ্বাস রক্ষা করে, জীবনপথে চলা উচিত—আমার এই প্রত্যয় সুনির্দিষ্ট হয়েছিল গ্রন্থটি পড়ে। এরই শক্তিতে বলীয়ান আমি বসন্ত রোগের ব্যাপারে কালেক্টরের কাছে নিজ বক্তব্য নির্ভয়ে বলতে পেরেছিলাম, সেইসঙ্গে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনয়নের ব্যাপারেও নির্ভয়ে ভোট দিতে পেরেছিলাম। আমার মন থেকে সর্বপ্রকার ভয় চলে গিয়েছিল। আমি চাকরি সম্বন্ধে বা নিজস্বার্থ সম্বন্ধে কোনো উদ্বেগই বোধ করিনি। এই সকল অভিজ্ঞতার ফলে চাকরি ছাড়বার জন্য আমার মনের তাগিদ বেড়ে যায়। শেষপর্যন্ত আমি পদত্যাগই করেছিলাম যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজ অর্জনের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল।

এরপর আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন সম্বন্ধে আরও অনেককিছু পড়েছিলাম। আমার এই গভীর বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনি এক বিরাট অধ্যাত্মপুরুষ। প্রতিটি ধর্মমত সম্বন্ধে সমপরিমাণ শ্রদ্ধাবোধের আদর্শ-সাধনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ঈশ্বর-উপলব্ধির বিভিন্ন ধর্মীয় প্রণালীতে সাধনা করে তিনি জগৎ সমক্ষে প্রমাণ করেছিলেন—সকল ধর্মমতের শিক্ষাই এক, এবং সকল ধর্মমতই ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী এবং উপদেশাবলী পাঠ করার ফলে নির্লিপ্ত কর্মসাধনার আদর্শকে আমি গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। এখনো পর্যন্ত তার প্রভাব আমাকে শক্তি দেয় এবং সর্বপরিস্থিতিতে মনের সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার পর সর্বমোট সাত বৎসর জেলে কাটিয়েছি। কারাবাসের পর্বগুলিতে, উক্ত ধর্মীয় প্রভাবের ফলে আমি অন্তর্দর্শন ও আত্মপরীক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতে পেরেছি যা আমার জীবনকে উন্নততর এবং ফলপ্রসূ করছে।

[মোরারজি দেশাইয়ের 'দি স্টোরি অব মাই লাইফ' (প্রথম খণ্ড) থেকে সুহৃদ্ মিত্র কর্তৃক অনূদিত]

রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাব

সুভাষচন্দ্র বসু

আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে তখন সবে পনরয় পড়েছি। তারপর আমার মধ্যে শুরু হল এক বিপ্লব, এবং সমস্ত কিছু ওলটপালট হয়ে গেল।···বিবেকানন্দ থেকে ক্রমে-ক্রমে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়েছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, এবং বহু পুস্তক প্রকাশ করেছেন যেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে দুর্লভ নয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রায় একেবারে নিরক্ষর ছিলেন বলে তেমন কিছু করেন নি। তিনি নিজের মতো চলেছেন আর তাঁর জীবন ব্যাখ্যা করা ছিল অন্যের কাজ। তথাপি তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে যে-সমস্ত শিক্ষালাভ করা গেছে তার মূলকথা সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যরা বহু পুস্তক বা দিনপঞ্জী প্রকাশ করেছেন। এইসব বইয়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান হল সাধারণভাবে চরিত্রগঠন, ও বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব নির্দেশ। তিনি অবিরতই একথা বলতেন যে, ত্যাগের দ্বারাই শুধু সিদ্ধিলাভ সম্ভব—সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করা যায় না। তাঁর শিক্ষার মধ্যে নূতনত্ব কিছু ছিল না, ভারতীয় সভ্যতার মতোই তা প্রাচীন। হাজার-হাজার বছর আগে উপনিষদ বলেছে যে, পার্থিব আকাঙ্ক্ষাসমূহকে পরিত্যাগ করতে পারলেই তবে অবিনশ্বর জীবনলাভ করা যায়। তবুও, রামকৃষ্ণের উপদেশের সার্থকতা ছিল এই যে, তিনি যেকথা বলতেন সেইভাবেই চলতেন, এবং তাঁর শিষ্যদের মতানুসারে, আধ্যাত্মিক দিক থেকে তাঁর চরমোন্নতি ঘটেছিল।···

বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে যে দর্শন আমি খুঁজে পেয়েছিলাম তা আমার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে প্রায় যথেষ্ট ছিল এবং তাকে ভিত্তি করে আমার নৈতিক ও বাস্তব জীবন নতুন করে গড়ে তুলতে পেরেছিলাম। এর সাহায্যে কয়েকটি মূল নীতি আমি শিখেছিলাম যার দ্বারা আমার সামনে যখনই কোনো সমস্যা বা সংকট দেখা দিত তখনই আমার আচরণ কিংবা কার্যধারা নির্ণয় করা সম্ভব হত।

[সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী 'ভারত পথিক' থেকে সংকলিত]

মনে পড়ে একটা চিত্র। কালীমন্দির দক্ষিণেশ্বরে। সম্মুখে খড়্গহস্তা মা কালী, আনন্দময়ী—শিবের আসনের উপর অধিষ্ঠিতা—শতদলবাসিনী—তার সম্মুখে একটি বালক—বালক হইতেও বালপ্রকৃতি—আধ-আধ স্বরে কাঁদিতেছে এবং কাকে যেন ডেকে-ডেকে বলিতেছে—"মা, এই নাও তোমার ভাল—এই নাও মন্দ। এই নাও

তোমার পাপ—এই তোমার পুণ্য।" করালমুখী ভীষণদ্রংষ্ট্রা মা অল্পেতে সন্তুষ্ট নয়—সব গ্রাস করিতে চায়—তাই ভালও চাই, মন্দও চাই—পুণ্যও চাই, পাপও চাই। বালককে সবই দিতে হইবে—না দিলে শান্তি নাই—মা-ও ছাড়িবে না।

বড় কষ্ট—মাকে সবই দিতে হইবে। মা কিছুতেই সন্তুষ্ট না—তাই কাঁদিতেছে এবং বলিতেছে—"এই নাও—এই নাও।" দেখিতে দেখিতে অশ্রুধারা বন্ধ হইল—গণ্ডস্থল ও বক্ষ শুকাইল—হৃদয় জুড়াইল—হৃদয়ে আর কিছু নাই। যেখানে ভীষণ কণ্টক যন্ত্রণা দিতেছিল—তার চিহ্নও নাই—সবই শান্তিময়। হৃদয় মধুতে ভরিয়া গেল—বালকটি উঠিল—আপনার বলিয়া তার আর কিছু নাই—সব দিয়ে ফেলেছে।

বালকটি রামকৃষ্ণ। [পত্র, ৩. ১০. ১৯১৪]

আমি দেখিলাম, sensual pleasure বাঙালীর হাড়ে-হাড়ে প্রবাহিত—আর ইহাই মস্তিষ্কবান বাঙালীর দুর্বলতার প্রধান কারণ।

এর উপায় কি? আমার মনে হয় counteract করিবার জন্য একদল কঠোর puritanic principles-বিশিষ্ট যুবকবৃন্দ চাই। দেশের লোকদের চোখ খুলে দেওয়া চাই। বাস্তবিক রামকৃষ্ণ জাতীয় চরিত্রের মূল ধরেছিলেন।

[পত্রাংশ, ৮. ১২ ১৯১৫]

রামমোহনের বেদান্ত প্রচারের মধ্যে যে সমন্বয়ের সূচনা আমরা দেখিতে পাই তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার জীবনের অপূর্ব ও অলৌকিক সাধনার বলে বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির (যেমন কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান) মধ্যে সমন্বয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে (যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, যোগী, শৈব ইত্যাদি) সমন্বয়, এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে (যেমন খৃীস্টীয় ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি) সমন্বয় স্থাপন করিয়া গেলেন। পরমহংসের অনুভূতি ও সাধনার উত্তরাধিকারী হইলেন প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তারপর সমগ্র বঙ্গবাসী। এই সমন্বয় স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া—কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ক্রীড়া ও ব্যায়ামকৌশলে সৃষ্টি ও নূতন প্রচেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত সমাজে পূর্ণ সাম্য স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে—এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালী জাতি সাহিত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

[৩০ মার্চ, ১৯২৯, রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণের অংশ]

রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে-সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্বধর্মসমন্বয় ও সকল মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তার সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না।

[২১ জুলাই, ১৯২৯, হুগলি জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণের অংশ]

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ছাত্রমহলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণ সমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই। তার পরিবর্তে নাকি লঘুতাপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে। একথা কি সত্য ? যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্যসমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তার মনোবৃত্তি তদ্রূপ গড়িয়া ওঠে। চরিত্রগঠনের জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।

['দলাদলির হোক অবসান' প্রবন্ধ (১৯৩৩) থেকে] [অংশগুলি 'সুভাষচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী' ১ম খণ্ড এবং 'সুভাষ রচনাবলী' ২য়, ৪র্থ খণ্ড থেকে সংকলিত]

৩. সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের দৃষ্টিতে

…কথামৃতের এই দৃষ্টান্তটিতে কত সহজে মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপশক্তি বোঝা গেল। সমস্ত দর্শনশাস্ত্র ঘেঁটেছি—এমন দৃষ্টান্ত কোথাও নেই…

…সংসারে আমরা কালি মাখিনি এমন কথা কেউ জোর করে বলতে পারব না। কালিমা থেকে মুক্তির উপায় কথামৃত—কল্মষাপহম্…

এক বাঙালী মেরিন ইঞ্জিনীয়ার ছোকরা আমেরিকায় মিশন-কেন্দ্রে গিয়েছে। সেখানে তাকে সবাই ধরে বসল, তুমি বাংলায় কথা বলো—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় কথা বলো…

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন হিমালয়-শিখর থেকে কথামৃতের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রের প্রাণধারা বইয়ে দিলেন।… এমন একদিন আসবে যখন কেবল হিন্দুরা নয়, অন্য সকল ধর্মের মানুষ কথামৃতকে নিজেদের শাস্ত্র বলে গ্রহণ করবে…

কোনো ঐশ্বর্য আড়ম্বর না রেখে কথামৃত প্রতি পংক্তিতে একটানা ভগবানের কথা বলে গেছে, তাই অতুলনীয় এই ধর্মগ্রন্থ…

একদিন দেখি কি, তিনি সরকারী লালবাড়ির সিকিউরিটি কুটুরিতেও বসে আছেন। লাল, নীল, হলদে, যে ফ্ল্যাগই তুলুন তিনি থাকবেনই…সর্বগ্রাসী রামকৃষ্ণ…

বইটি পড়ে ফেললাম…অবিলম্বে শিহরণ…বিশ্বাস হল গভীরতর, পূর্ব প্রত্যয়ের উপর আঁকা হয়ে গেল নিশ্চয়তার মুদ্রণ…

মালার পর মালা গেঁথে তিনি নৈবেদ্য সাজিয়েছেন…পাঁচখণ্ডের পাঁচখানি নৈবেদ্য…নিবেদন করেছেন শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে…

…জীবনের শুরুতে পড়েছিলাম 'এম' কবিরাজের পাল্লায়।…'এম' কবিরাজের বড়ি, কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্…

তাঁর দ্বার খোলা…গল্প হাসি নৃত্য গীত অভিনয়…কিন্তু কম্পাসের কাঁটা ভগবানের দিকে স্থির…

প্রথম বয়সে একদিন এক প্রাচীন সাধু আমাকে বলেছিলেন, কথামৃত বুঝতে পেরেছ ? বলেছিলাম, পেরেছি। জীবনসায়াহ্নে বুঝছি, কিছুই বোঝা হয়নি, কেবল আভাসমাত্র পাওয়া গেছে…

কথামৃত সূত্রে

স্বামী ওঁকারানন্দ

ঠাকুর বলেছেন, আমার মতটা, আমার ধর্মটা ঠিক, আর অন্য লোকেরটা ঠিক নয়, এইটি ভাল নয়। ঠাকুরের এইরূপ উদার মত থেকে আমরা যেন মনে না করি যে, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্য যা-হোক একজনকে যখন-তখন চিন্তা করব, বা তাঁদের সম্বন্ধে কথকতা বা গান শুনব বা গাইব। সাধকের প্রথম অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক। একটাতে নিষ্ঠা রেখে সেইটেরই জপধ্যান ও চিন্তায় ডুবে থাকতে হবে। ঠাকুর সাধক-অবস্থায় প্রথমে মা-কালীকে ধরে ছিলেন এবং শেষপর্যন্ত একমাত্র মা-ই তাঁর অবলম্বন ছিলেন। যখন অন্য সাধনা করছেন তখন সেই সাধনাতেই ডুবে থাকতেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সেই সাধনার অনুষ্ঠান করতেন। যখন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হলেন, তখন ঘর থেকে দেবদেবীর ফটো সব সরিয়ে ফেললেন।

ঠাকুর ও মায়ের নাম যখন আপনারা নিয়েছেন, তখন এতেই আপনাদের মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ হবে আমাদের শাস্ত্র, স্বামীজীর বই হবে এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা।

ঠাকুর বলেছেন, কলিতে বেদ-মত চলে না। যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র, বিধি অনুসারে করতে হয়। ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পূজা হয় না, দেবতা গ্রহণও করেন না; ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না—কলিকালে এই বেদোক্ত কর্ম করবার সময় কোথায়? এ ছাড়া কর্মযোগ—বড়ই কঠিন। নিষ্কাম করতে না পারলে বন্ধনের কারণ হয়। তাই কলিতে পুরাণ-মত অর্থাৎ ভক্তিপথই শ্রেয়ঃ। পুরাণ-মতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয় তারও মুক্তি হবে। একারণ ঠাকুর বারবার বলছেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি—কিনা তাঁর নাম-গুণগান ও স্মরণ-মনন। তারপর বলছেন—জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। গোপনে তাঁর নাম করতে-করতে তাঁর কৃপা হয়, তারপর দর্শন হয়।

তারপর বলছেন—পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, ভাবের চেয়ে মহাভাব, প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল।

সাধারণ মানুষের কাছে ভাব, মহাভাব বা প্রেম, এসব ধারণাতীত। এমন কি ধ্যানমগ্ন হওয়ায়ও পূর্ব-জন্মের সাধন-সংস্কার না থাকলে আদৌ সম্ভব নয়। সংসারীর পক্ষে প্রশস্ত বিধি বা পথ হল, তাঁর নামজপ ও স্মরণ-মনন। জপের বা স্মরণ-মননের আদৌ কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই। সব অবস্থায় মনে-মনে জপ করে যাওয়াই বিধেয়। এইভাবে চললে ঈশ্বরে অনুরাগ আসবেই। ঠাকুর বলছেন, জপ করবে মনে, বনে ও কোণে। বর্তমানে বন ও কোণ সুদূরপরাহত, অতএব মনই এক-মাত্র স্থান, যা সবসময় নিজের সঙ্গেই রয়েছে। এ-কারণে স্থান-কাল সময়-অসময়,

শৌচ-অশৌচ যে-ভাবেই শরীর থাকুক না কেন, লিপ্ত মনকে যেন নামগুণগান থেকে সরিয়ে এনো না। মন ফাঁকির সর্দার। সুড়ৎ করে সরে পড়বে। এ কারণে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে, মন যেন ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ না পায়।

ঠাকুর বলছেন—'হাজরা বলে, ব্রাহ্মণশরীর না হলে মুক্তি হয় না। আমি বললুম—সেকি ? শবরী ব্যাধের মেয়ে। রুইদাস—যার খাবার সময় [সে অস্পৃশ্য বলে অপরকে সাবধান করতে] ঘণ্টা বাজত—এরা সব শূদ্র। ভক্তির দ্বারাই এদের মুক্তি হয়েছে। হাজরা বলে—তবু !'

ভক্তি বলতে ঠাকুর কামনাশূন্য অহৈতুকী ভক্তির কথা বলেছেন। গোপীদের এই ভক্তি ছিল। ভক্তির যে পূর্ণ পরিণতি 'মহাভাব' তা ঈশ্বরকোটি ছাড়া কারুর হয় না। সাধারণ গোপীদেরও হয় নি। একমাত্র শ্রীমতীর ছিল। মহাভাবে নিজের শরীর-জ্ঞান থাকে না। প্রকৃত ভক্তের সবল পুরুষকার ও তেজ থাকবে। বৈষ্ণবদের দীনহীন ভাব, ওতো মরার লক্ষণ। মহাপ্রভুর চেলাদের এই পুরুষকার ও তেজ ছিল। তাঁরা যখন কীর্তনে মেতে হুঙ্কার ছাড়তেন প্রভুর কাছে আসার সময়—রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁদের দেখে বলত—'দেখছ, নেড়াদের কি তেজ-বীর্য, দেখছ !'

ঠাকুর বলেছেন—তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এই জীবের স্বরূপ হল পরমাত্মা। কিন্তু জীব তা জানে না। তার কারণ মায়া। মায়ার প্রভাবে জীব ভাবে—সে আর পরমাত্মা ভিন্ন। প্রভেদটা মনে—তত্ত্বতঃ কোনো ভেদ নেই।

জীব আর পরমাত্মা যদি এক হয় তবে বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীবকে যে ঈশ্বরের অংশ বলা হয়, তা কি করে সম্ভব হয় ? পরমাত্মা অসীম অনন্ত। অসীমের অংশ হয় না। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।' দ্বৈত মত তত্ত্বতঃ ঠিক নয়।

কিন্তু যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে আমরা 'সোঽহং' বলতে পারি না। সেব্যসেবক ভাব নিয়ে থাকতে হয়। প্রভেদ রাখতে হয়। কিন্তু সেটা তত্ত্ব নয়।

বৈষ্ণবশাস্ত্রেও অদ্বৈততত্ত্ব আছে, কিন্তু বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তা মানতে চান না। শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দের সঙ্গে যখন সাধ্য-সাধনতত্ত্বের আলোচনা করছেন—তখন মধুরভাবের উল্লেখ শুনেও মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বলছেন—'ইহ বাহ্য আগে কহ রায়।' তখন রায় রামানন্দ স্বরচিত গানটি গেয়ে শোনালেন—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জনি ॥

'না সো রমণ ন হাম রমণী'—এই লাইনটিতে অদ্বৈততত্ত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। মহাপ্রভু গান শুনতে-শুনতে অধীর হয়ে, আর শুনতে না পেরে, 'চুপ চুপ' বলে

নিজের হাতে রায় রামানন্দের মুখ চেপে ধরলেন। তাঁর মনের ভাব—এই হয়েছে, আর নয়। অর্থাৎ তত্ত্বে পৌঁছেছেন। এই তত্ত্বই অদ্বৈততত্ত্ব।

'স্বাধীন ইচ্ছা' বলে কিছু আছে কিনা ?—ছোট নরেন জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুরকে। উত্তরে ঠাকুর বললেন—"আমি কে, খোঁজো দেখি। 'আমি' খুঁজতে-খুঁজতে 'তিনি' বেরিয়ে পড়বেন। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। চীনের পুতুল চিঠি হাতে করে দোকানে যায়, শুনেছ ? ঈশ্বর কর্তা। আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করবে।" অর্থাৎ আমাদের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে *Free Will*-এর সপক্ষে অনেক যুক্তিবাক্য আছে—এ কারণে বর্তমান পাশ্চাত্ত্য দর্শনে শিক্ষিত অনেকে সেটা মানেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে অদ্বৈতমতে এক ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই। ব্রহ্মই শক্তিরূপে লীলা করে জীবজগৎ এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যেখানে আমার আমিত্ব নেই, সেখানে আমার স্বাধীন ইচ্ছা থাকা কিভাবে সম্ভব ?

কিন্তু যতক্ষণ আমি-বোধ আছে, ততক্ষণ বোধহয় স্বাধীন ইচ্ছাও আছে ; আর যতক্ষণ পাপপুণ্যে জ্ঞান আছে, ততক্ষণ স্বাধীন ইচ্ছার জ্ঞান না থাকলে মানুষ ধর্ম-পথে চলবে না—স্বেচ্ছাচারী হবে।

ঠাকুর বলছেন—তাঁর কৃপার উপর সবই নির্ভর করছে। কিন্তু কায়মনোবাক্যে তাঁকে ডাকতে হবে, চুপ করে থাকলে চলবে না। পরস্পরবিরোধী কথা এটি। সবই যদি তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করছে, এবং তাঁর কৃপা কিসে হবে না-হবে তা জানা নেই—কতটুকু ডাকলে তাঁর কৃপা হবে,বা ডাকলে কৃপা যে হবেই, তার কোনো স্থিরতা নেই—তখন কি তাঁকে ডাকতে হবে না ? না, তাঁকে ডাকতে হবেই। ডাকতে-ডাকতে, সাধন-ভজন করতে-করতে, সাধক যখন বুঝতে পারবে যে, তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তখন সাধক নিজের চেষ্টা ত্যাগ করে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তখন অহং ত্যাগ হয় এবং তখনই তাঁর কৃপা হয়। যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ তাঁর দয়া হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নিজে মার দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে খড়্গ দ্বারা নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলেন, তখনই মা কৃপা করে দেখা দিলেন। সাধনটা হল আসলে 'ডানা ব্যথা' করা। পাখী অকূল সমুদ্রে, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, চতুর্দিকে উড়ে ঘুরে-ঘুরে যখন কোথাও কূলকিনারা দেখতে পায় না, তখন সে ক্লান্ত হয়ে মাস্তুলকে আশ্রয় করে চুপ করে বসে। তার নিজের চেষ্টা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। আমি তাঁকে সাধনার দ্বারা লাভ করব—এই মনোভাবই অহং-এর সুস্পষ্ট রূপ। যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—মহারাজ, তুমি বাইরে শত্রু জয় করেছ, অন্তরের শত্রুকে জয় করতে পারো নি। যুধিষ্ঠিরের ধর্মের অভিমান ছিল।

সাধনভজন করলেও তার মধ্যে অহং ঢুকবে। ভাব এই—আমিই সব করছি। এই অহং যাওয়া খুবই কঠিন। অহং না গেলে ভগবৎ-কৃপা হবে না। এজন্য চাই নির্বাসনাসহ শরণাগতি।

ঠাকুর মহিমাচরণকে বলছেন—আপনি বললেন সাধন করলেই এরকম হয়, তা নয়। নিজের শরীর দেখিয়ে ঠাকুর বললেন—এতে কিছু বিশেষ আছে।

এই বিশেষটি হচ্ছে আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তিরই অবতার। অবতারের জ্ঞান পূর্ব থেকেই আছে। তবে মনুষ্যশরীর ধারণ করলে বাল্যে তা আবৃত থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ণজ্ঞানের উন্মেষ হয়।

শাস্ত্রে কি আছে, মা সব দেখিয়ে দিয়েছেন। মা হচ্ছেন অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার—বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখান থেকেই পাওয়া যায়। তাই ঠাকুরের জ্ঞানে কোনো ভুল বা গোঁজামিল নেই। মহামায়ার মায়া যে কি, মা তাঁকে দেখালেন। যেন মস্ত দীঘির সব জল পানায় ঢাকা। হাওয়াতে পানা একটু সরে গেল, অমনি জল দেখা গেল—কিন্তু দেখতে-দেখতে চারদিকের পানা নাচতে-নাচতে এসে আবার ঢেকে ফেললে। দেখালেন—এই জল যেন সচ্চিদানন্দ, আর পানা যেন মায়া। মায়ার দরুণ সচ্চিদানন্দকে দেখা যায় না—যদি একবার চকিতের জন্য দেখা যায় তো মায়া আবার ঢেকে ফেলে।

এই দৃষ্টান্তে কত সহজে মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপশক্তি বোঝা গেল। আমি সমগ্র দর্শনশাস্ত্র ঘেঁটে দেখেছি—এমন দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। অথচ এটা যে কত সত্য এবং শাস্ত্রসম্মত কথা, তা বুঝতে হলে বহু শাস্ত্রালোচনার দরকার।

এইরকম 'কিরূপ লোক এখানে আসবে আসবার আগে মা দেখিয়ে দেন।' এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, অবতারের লীলার জন্য সব ছক তৈরী আছে। আর পরপর সময়মত ঘটে যায়। শেষে ঠাকুর বললেন—তাই ভাবি, এর (নিজের) মধ্যে মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন।

অবতারেরা যখন লীলা করেন, নিজেরই একটা প্রতিরূপের সঙ্গে তা করেন। নতুবা তাঁর সঙ্গে লীলা করবার সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনিই কখনো ভক্তরূপে, কখনো ভগবানরূপে লীলা করেন।

মায়ের কাছেই তিনি সব কিছু জানতে চান—কারণ একমাত্র তিনিই সব জানাতে পারেন। যখন ইন্দ্রাদি দেবতারা ব্রহ্মের শক্তি দেখেও তাঁকে চিনতে পারলেন না, তখন 'উমা' আদ্যাশক্তি দেবতাদের চিনিয়ে দিলেন যে, ইনিই ব্রহ্ম।

ছেলে বাবাকে চেনে না—মা তাকে বলে দেয়, সে তাই বিশ্বাস করে ও বাপের কাছে যায়।

ঠাকুর শেষে বলছেন—আচ্ছা এই ব্যারাম (ক্যানসার) হয়েছে কেন ? এর মানে আছে। যারা শুদ্ধভক্ত তারাই থাকবে, আর যারা সকাম তারা ব্যারাম দেখে সরে পড়বে।

অবতার মনুষ্যদেহ ধারণ করলেও যে অসুখে ভুগবে, এটা সকাম ভক্ত ভাবতেও পারে না। তারা বলে, অবতারের আবার অসুখ কি ? মনুষ্যদেহ ধারণ করলে দেহের স্বধর্ম পালন করতে হবে, একথাটা তাদের ধারণায় আসে না। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের তীরে

দেহত্যাগ করলেন। শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন ও শরীর ছাড়লেন। বুদ্ধদেব জরা ও রোগগ্রস্ত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

তাছাড়া ঠাকুরের পূর্বোক্ত উক্তি থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, তাঁর ব্যারাম—ভক্তদের যাচাই করার জন্য। ঠাকুর যে অবতার, সে সম্বন্ধে স্বামীজীর এত গভীর বিশ্বাস ছিল যে, রক্তপুঁজময় ঠাকুরের মুখামৃত অম্লানবদনে পান করেছিলেন। কারণ তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, অবতারের শুদ্ধ-সত্ত্ব দেহ-নিঃসৃত কিছুই অশুদ্ধ নয়।

ঠাকুর শিওড়ে চলেছেন—যেতে-যেতে দেখলেন—তাঁর ভিতর থেকে ১৫।১৬ বছরের দুইটি ছোকরা পরমহংস, পূর্ণরূপধারী, বেরিয়ে এসে মাঠে দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা ও নানারকম ফষ্টিনষ্টি করতে-করতে চলেছে।

তত্ত্ব এই যে, অবতার—ঈশ্বর—তাঁর উপযুক্ত খেলার সাথী তিনি ছাড়া কেউ নেই। তাই নিজেই নিজের সাথে এইভাবে খেলেন। বস্তুতঃ এটাও বোঝালেন, তিনি ছাড়া জগতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিজ্ঞানীর মতো ঠাকুর এই জড়জগৎকে চৈতন্যময় দেখছেন—এটাই ঠাকুরের ভাবের বৈশিষ্ট্য। অন্য অবতারে এই ভাব বিদ্যমান নেই।

হাজরা একসময় ঠাকুরের মতবাদের বিরুদ্ধ-কথা বলতে থাকেন। তাতে ঠাকুর বলেন যে, সে এখানকার মত উল্টে দিতে চায়। তখনও ঠাকুর এই অদ্বৈতভাবকেই উল্লেখ করলেন।

ঠাকুরের এই ভাবকে সব সময় মনে রেখে লীলাপ্রসঙ্গ, রামকৃষ্ণ-পুঁথি, বিশেষ করে কথামৃত পড়লে তাঁর ভাব, তাঁর কথা সম্যক্ বোঝা যাবে, নতুবা নয়। তিনি কে? তাঁর সঙ্গে এই ব্যক্ত জগতের কি সম্বন্ধ, আগে জানতে চেষ্টা করতে হবে। ঠাকুরের অবদান ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করে, তাঁর অবতারত্ব সম্যক অনুধাবন করে, তাঁর সগুণ নির্গুণ লীলাধ্যানে মশগুল হয়ে যাও। শুধু তাঁর মূর্তি বা পটের সামনে বসে ফুল-চন্দন ও ধূপ দিলেই কাজ হবে না। অনেকের ধারণা, ধর্ম মানে ঠাকুরের পূজা, ফুল-চন্দনাদি দেওয়া, আরতি করা ও ভোগ দেওয়া। আবার অনেকে শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। শাস্ত্রপাঠ-দ্বারা ঈশ্বরলাভ হয়না সত্য, কিন্তু শাস্ত্র অধ্যাত্ম-সাধনার পথের দিশারী। পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসসহ মনঃসংযোগে শাস্ত্রপাঠ করলে ও তাঁর কৃপা ভিক্ষা করলে, শাস্ত্রের মর্মার্থ উদ্ঘাটিত হবে, নচেৎ শাস্ত্রপাঠ বৃথা।

ঠাকুর বলছেন—কেশব সেনকে বললাম, যদৃচ্ছালাভ—যে বড়ঘরের ছেলে তার খাবার জন্য ভাবনা হয় না—সে মাসে-মাসে মাসোহারা পায়। তবে নরেন্দ্র অত উঁচু ঘর—তার হয় না কেন? ভগবানে সব মন সমর্পণ করলেই তিনি সব যোগাড় করে দেবেন। নরেন্দ্রর মন এখনো ঈশ্বরে সমর্পিত হয়নি, তাই তার এইসকল দুর্গতি (খাওয়া পরার অভাব) চলছে—ঠাকুর এখানে সেই ইঙ্গিত করছেন।

বিষয়ী লোকেরা ভাবে, আগে খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করি, বিষয়ের বন্দোবস্ত করি, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরচিন্তা করব। কিন্তু তারা জানে না যে, বিষয়চিন্তা

ও ঈশ্বরচিন্তা পরস্পর-বিরোধী—দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। পূর্বদিকে যেতে হলে পশ্চিমকে পিছু ফেলে আসতে হবেই। তাই ঠাকুর আরও বললেন—তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার—পাতকুয়া ; আত্মীয় স্বজন—কালসাপ। তখন টাকা জমাব, বিষয় ঠিক করব—এসব হিসেব থাকে না।

তা হলে কি সংসারে থেকে ঈশ্বরচিন্তা হবে না? প্রথম-প্রথম সংসারে থেকেই ঈশ্বরচিন্তা করতে হবে। কারণ সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ সম্ভব নয়। কিন্তু যত ঈশ্বরের দিকে এগোবে, তত বিষয়চিন্তা কমে যাবে, অর্থাৎ সংসারত্যাগ ঘটবে।

ঠাকুরের দেহত্যাগ আসন্ন—মাত্র কয়েক মাস বাকি। সময় অল্প, এর মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে তাঁর যন্ত্রস্বরূপ প্রস্তুত করতে হবে! তাই নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন।

ব্রহ্ম আর মায়া সম্বন্ধে বলছেন—'ব্রহ্ম অলেপ'—ত্রিগুণ আছে তাতে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। আত্মা নির্লিপ্ত। মানুষই সেই 'শুদ্ধ আত্মা'।

মায়াতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হচ্ছে—মায়া ত্রিগুণময়। ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করে লীলা করছেন। এই মায়া কোথায় ছিল, কোথা থেকে এল? নিশ্চয়ই ব্রহ্মে 'অব্যক্ত' ছিল। কারণ, ব্রহ্ম ছাড়া জগতে দ্বিতীয় কিছুই নেই। কিন্তু ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত—মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি মায়াধীশ—মায়াধীন নহেন। জ্ঞানী নেতি-নেতি করে যখন প্রপঞ্চময় জগতের ঊর্ধ্বে উপনীত হন—তখন ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। অতএব মায়া অনিত্য। একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য ও সত্য। তাই জ্ঞানীরা বলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

ঠাকুর বলেছেন—জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত—এই তিন অবস্থাই জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়। ভক্তেরা এ সব অবস্থাই লয়—যতক্ষণ আমি আছে ততক্ষণ সবই আছে। ভক্ত আমি ত্যাগ করতে পারে না। কারণ—সে ভক্তি নিয়ে থাকে। ভক্ত ভগবানের দ্বৈতভাব নিয়ে থাকে।

আমিটাই মায়া। ঠাকুর মায়া কিরূপ বুঝিয়ে বললেন—মায়া আবরণস্বরূপ। এই দেখ না, গামছা আড়াল করলাম—আর প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে না। ভক্তকে এই আবরণের মধ্য থেকে ঈশ্বর-দর্শনের চেষ্টা করতে হয়। তাই সে মহামায়ার পূজা করে, আর শরণাগত হয়ে বলে—মা, পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।

বৈষ্ণব গোস্বামীরা এই মায়া স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, আর শ্রীরাধা তাঁর স্বরূপ-শক্তি বা চিৎশক্তি। মায়া বহিরঙ্গ শক্তি। শ্রীরাধিকা হচ্ছেন যোগমায়া। তাই গোস্বামীরা শক্তির উপাসনা অর্থাৎ দুর্গাপূজা করেন না। কিন্তু ঠাকুর স্পষ্টই বলেছেন—মহামায়ার শরণাগত না হলে, শক্তি উপাসনা না করলে, ব্রহ্মজ্ঞান হবে না।

ঠাকুর আবার বলেছেন,—মায়াবাদ শুকনো। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এই হল

মায়াবাদ। মায়াবাদীরা জগৎ উড়িয়ে দেয়। অতএব তাদের দ্বারা জগতের কল্যাণসাধন হয় না। জগতের কল্যাণ করতে হলে 'বিদ্যার আমি' রাখতে হয়। এ কারণে ঠাকুরের ভয়—পাছে নরেন্দ্রনাথ শুকনো জ্ঞানী হয়ে যান। তাঁকে দিয়ে যে, জগৎ-কল্যাণের কাজ করাবেন। তাই ঠাকুর বার-বার নরেন্দ্রের হাত-মুখ স্পর্শ করছেন, আর বলছেন—এসব (নরেন্দ্রের সব কিছুই) ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর আলাদা লক্ষণ—চেহারা, মুখ, চোখ সবই শুকনো হয়।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—সকলেই অবতার, কিন্তু কারো সাথে কারো মিল নাই। রাম ও কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়-কুলসম্ভূত। তাঁদের কাজকর্ম ক্ষত্রোচিত। রাম সর্বক্ষণ ধনুকধারী, রাক্ষসকুল নিধন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পার্থসারথি হয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধরথ চালনা করছেন ও মন্ত্রণা দিচ্ছেন। দুজনেরই অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তির ঐশ্বর্য বাল্যাবধি দেখা যায়। বুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেও অহিংসা ধর্ম প্রচার করলেন। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, নিজে একজন শাস্ত্রজ্ঞ অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়েও, সর্বত্যাগী সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভগবৎপ্রেমে কেঁদে আকুল হয়ে জীবন কাটালেন। শ্রীচৈতন্য অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধা। বিরহের আনন্দ উপভোগ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এবার শ্রীচৈতন্য হয়ে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে, কুলগত আচার ও শিক্ষা ত্যাগ করে, ভগবানলাভের জন্য উন্মাদ। বিবাহ করে স্বপ্নেও স্ত্রীসম্ভোগ করেন নি। আর তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্যের এত তীব্রতা ছিল যে, তিনি কামিনী বা কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারতেন না। কোনো ঐশ্বর্যের বিকাশ তাঁতে ছিল না। প্রেম ও করুণায় তাঁর হৃদয় সদা-বিগলিত ছিল। তাঁর সঙ্গে পূর্ব পূর্ব অবতারের অন্য কোথাও মিল নেই—একমাত্র এই প্রেমের বিকাশ ছাড়া। তাঁতে একাধারে শিব ও শক্তির মিলন ছিল। মহাপুরুষ-মহারাজ একদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, সমাধি অবস্থায় দুটি জ্যোতিরেখা—একটি সামনে, একটি পিছনে, ঠাকুরের স্বাধিষ্ঠান থেকে উঠে সহস্রারে মিলিত হল। তখন তাঁর কেশ, শ্মশ্রু ও লোমরাজি খাড়া হয়ে উঠেছিল।

[স্বামী ওঁকারানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

কথামৃত নাম কেন?

স্বামী ভূতেশানন্দ

কথামৃতের পরিচয় দিতে গিয়ে কথামৃতকার শ্রীম, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তথা মাস্টারমশাই, ভাগবতের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শ্লোক হ'ল ঃ—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ১০/৩১/৯

—তোমার এই যে কথারূপ অমৃত, কি রকম? না, তপ্তজীবনম্—সংসারতাপে তপ্ত যে মানুষ, মৃতপ্রায় দগ্ধ যে মানুষ, পুড়ে মরছে যে মানুষ, তার কাছে জল-স্বরূপ। তার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করে—তাকে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে, সংসার-দুঃখ থেকে বাঁচায় এই কথারূপ অমৃত।

তারপর বলছেন 'কবিভিরীড়িতম্'। কবি অর্থাৎ জ্ঞানী যাঁরা, শাস্ত্রমর্ম যাঁরা জানেন, তাঁরা এই কথামৃতের প্রশংসা করেন। তাঁরা সর্বদা এই কথামৃতের স্তুতি করেন এই ব'লে যে, এই কথামৃত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়—মানুষ যে মরণশীল নয়, এই জ্ঞান দেয়।

আরও এই কথামৃত কিরূপ? না, 'কল্মষাপহম্'।—আমাদের সমস্ত কল্মষ, পাপ, কলুষ, কালিমা এই কথামৃত দূর ক'রে দেয়। সংসারে আমরা অনেক কালি মেখেছি, কারও গায়ে যে কালি লাগেনি এমন কথা কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না। সুতরাং, এই কালিমা থেকে মুক্ত হবার উপায় কি? হয়তো অনেকের মনে অনুতাপ আসে যে, এই কালিমা থেকে মুক্তির আর কোনো পথ নেই। তাইবলছেন, না, উপায় আছে—এই কথামৃত 'কল্মষাপহম্'।

শুধু তাই নয়, পুরাণে বলে, অমৃত পান ক'রেই অমরত্ব লাভ হয়। এ-অমৃত কিন্তু পানও করতে হয় না, কেবলমাত্র শুনেই জীবের কল্যাণ হয়—'শ্রবণমঙ্গলম্'।

তারপর যদি মনে হয়—আচ্ছা, শ্রবণেতে কল্যাণ হোক, কিন্তু আমার রুচি হবে কি না? তার উত্তরে বলছেন 'শ্রীমদ্'—সৌন্দর্যবিশিষ্ট। এ-কথার ভিতরে এমন সুষমা আছে যে, মানুষকে অনায়াসে আকর্ষণ করে স্বাভাবিকভাবে।

আর, এই কথামৃত এতটুকু নয় যে, ফুরিয়ে যাবে। তাই বলছেন, 'আততম্'—বিস্তৃত। বিস্তৃত বলতে অপার এবং সহজলভ্য। যেমন আকাশ চারিদিকে বিস্তৃত থাকে; তাকে খুঁজে বার করতে হয় না, যেমন বায়ু চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকে, অন্বেষণ ক'রে আবিষ্কার করতে হয় না, সেইরকম এই কথারূপ অমৃত অপার অনায়াসলভ্য।

এই কথামৃত তাহলে আমরা সকলে পান করি না কেন ? তার উত্তরে বলছেন, 'ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ'—যারা বহু দান করেছে অর্থাৎ বহু সুকৃতি সঞ্চয় করেছে, তাদের এই কথারূপ অমৃতে স্বাভাবিক রুচি হয়—তারাই এর স্তুতি করে, কীর্তন করে, আলোচনা করে। রুচি কারো হয়, কারো হয় না। তার কারণ—পূর্বজন্মকৃত কর্ম। পূর্ব-পূর্ব জন্মের সঞ্চিত অনেক সুকৃতি যদি থাকে, তাহলে মানুষ আবাল্য এই রুচি নিয়ে জন্মায়। সহজাত হয় তার এই রুচি। সুকৃতি যদি কম থাকে, তাহলে হয়তো আঘাত পেয়ে তারপরে এই কথায় রুচি হয়। এই রকম বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে। কিন্তু সকলেরই জন্য এই কথামৃত কল্যাণকর এবং এই কথামৃতের অনুশীলন করতে যে খুব একটা কষ্ট হবে তা নয়। রুচি থাকলেই এতে আনন্দ পাবে সকলে।

এই শ্লোকটি মাস্টারমশাই কথামৃতের গোড়াতেই উদ্ধৃত করেছেন। বইটির নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' কেন রাখলেন তা যেন ভাগবতের এই শ্লোকটি উদ্ধার ক'রেই জানিয়ে দিচ্ছেন। যিনি শ্রীরামচন্দ্ররূপে জগতের কল্যাণের জন্য সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণরূপে নানাভাবে উপদেশ দিয়েছেন, যার সার আমরা গীতা-ভাগবতে পাই। তিনিই আবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে সকলের সহজবোধ্য হয় এমন ক'রে এই কথামৃত এখন বলছেন—এই কথাটুকু আমরা মাস্টারমশায়ের এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দেওয়ার অভিপ্রায় বলে মনে করি।

শতবর্ষের আলোকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) কথামৃত সংকলন করে এমন জিনিস দান করে গেছেন যা মানুষের স্মৃতিলোকে অক্ষয় হয়ে আছে। আমরা সবাই জানি, কথামৃত তাঁর দিনপঞ্জী। উনি ছাত্রজীবন থেকেই ডায়েরি লিখতেন, তবে ধারাবাহিকভাবে বরাবর লিখে উঠতে পারেননি। একসময়ে তাঁর জীবনে বড় এক সংকট এসে উপস্থিত হয়। এমন সংকট যে তিনি পিতৃগৃহ ছাড়তে বাধ্য হন। একদিন স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু কোথায় যাবেন স্থির নেই। প্রথমে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু অবিলম্বে বুঝলেন বন্ধু তাঁকে চাইছেন না। আবার বেরিয়ে পড়লেন। পথে গাড়ি ভেঙ্গে গেল। অন্য গাড়ি নিয়ে কোনরকমে তিনি বরাহনগরে তাঁর একজন আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠলেন। সেখানে আছেন কয়েকদিন। আত্মহত্যার ইচ্ছা, বাঁচতে আর সাধ নেই। এই সময় সিধু (সিদ্ধেশ্বর মজুমদার) নামে এক বন্ধুর সঙ্গে এ-বাগানে ও-বাগানে ঘুরতেন। একদিন বন্ধু বললেনঃ 'গঙ্গার ধারে একটা চমৎকার বাগানবাড়ি আছে। সে বাগানটা দেখতে যাবে? সেখানে একজন

পরমহংস আছেন। সেখানে গিয়ে শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দেখলেন। বিদায় গ্রহণের সময় ঠাকুর শ্রীমকে বললেন ঃ 'আবার এসো।' প্রথম দর্শনের পর পরম আশ্চর্য হয়ে শ্রীম লিখলেন—'এ সৌম্য কে?' সৌম্য পুরুষের প্রথম দর্শনে এমন মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, অল্প পর থেকেই তাঁর সম্বন্ধে দিনপঞ্জী রাখতে লাগলেন। তারপর থেকে তাঁর জীবনের সবই শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে। প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দেখেন খুব সম্ভব ১৮৮২ খৃস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার। সেই ১৮৮২ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে ঠাকুরের দেহান্ত পর্যন্ত চার বছরে যতবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেছেন ততবার সেখানে যা-যা ঘটেছে, যা-কিছু শুনেছেন, সমস্তই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি এইসব কথা কিন্তু লিখেছিলেন কেবল নিজের জন্যে। বাড়িতে ফিরে গিয়ে তিনি দিনপঞ্জী লিখতেন, আর তাতে তাঁর স্মরণ-মনন হত। অসাধারণ শিল্পী তিনি, দু এক আঁচড়ে একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। প্রথমে একটা আঙ্গিক বর্ণনা—ভাগীরথী কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে, মৃদু মন্দ বায়ু ইত্যাদি কথা, ছোট ছোট শব্দ, তা দিয়ে এক সুন্দর ছবি। তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। তিনি মঞ্চে আসছেন। তিনি এলেন, তার পরিবেশ তৈরী হল দু' চারটে কথার ভিতর দিয়ে। তারপর ক্রমান্বয়ে এল শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও ভাবাবেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন, শ্রীম-ই, অন্য কেউ নয়, তাঁর কথা লিখে রাখুন। তাই দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য ভক্তদের, যেমন স্বামী শিবানন্দকে, তাঁর কথা লিখতে নিষেধ করেছেন, 'থাক, ও তোমাকে করতে হবে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে যেন আগে থেকেই নির্বাচন করে রেখেছিলেন। কথামৃতে লক্ষ্য করা যায়, কঠিন প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'তুমি বুঝেছ তো?' শ্রীম খুব ভাল ছাত্র ছিলেন, আবার কৃতী শিক্ষকও। কাজেই সেসব কথা হুবহু লিখে রাখার যোগ্যতা তাঁর ছিল। উনি নিজেই বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন মণি-মুক্তা ছড়াচ্ছেন, যে যতটা পারে কুড়িয়ে নিচ্ছেন, হরির লুটে যেমন হয়। শ্রীম সব কিছু কুড়িয়েছেন, কিছু বাদ দেননি। শ্রীমা, আমাদের মা, একবার বলেছিলেন—এ যুগের লোক কি কম গা, অবতারপুরুষ এসেছেন, তাঁর ছবিটি তুলে রেখেছে। আর বলেছেন, এই দেখ না, তিনি যা বলেছেন মাস্টার সব কথা লিখে রেখে দিয়েছে।

কথামৃত সম্বন্ধে শ্রীম বলেছেন, তিনি যেদিন শুনেছেন সেইদিনই লিখে নিয়েছেন। 'সেইদিন'-এর উপর জোর দিয়েছেন, কারণ একদিন দুদিন পরে হলে ভুল হতে পারে। যেখানে লোকমুখে শুনে কিছু লিখেছেন, তাও জানিয়েছেন। সবকিছু তিনি চোখের সামনে ছবির মতো দেখতে চাইতেন। ঠাকুরের জীবনকালে শ্রীম কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। কামারপুকুরে যাচ্ছেন, হাঁটতে-হাঁটতে চলেছেন, দূর থেকে লোকে দেখিয়ে দিচ্ছে—ঐ কামারপুকুর। কামারপুকুর তখনো অনেক দূর। তারপর যখন কেউ বলল, ঐ যে গাছটা দেখছ—ঐ হচ্ছে কামারপুকুর—তখন প্রণাম করছেন গাছটাকে, প্রণাম করছেন কামারপুকুরের মাটিকে। তারপর যখন ফিরে গেছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ

ওঁকে সস্নেহে বললেন—'তুমি ডাকাতের দেশে গিছলে ? ওটা যে ম্যালেরিয়ার ডিপো—ওখানে তুমি গিছলে ? আহা কত ভালবাসো আমাকে !'

শ্রীম কামারপুকুরে গিয়ে ঠাকুরের কথা বিভিন্ন লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন। যাঁরা তাঁকে জানতেন—তখন তো তেমন লোক অনেক বেঁচে আছেন। তাঁদের কাছ থেকে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন।

শ্রীম জানিয়েছেন, ওঁর কাছে যেসব উপকরণ আছে তাতে আরো পাঁচ-ছয় খণ্ড বই হয়ে যেতে পারে, কিন্তু পাঁচ খণ্ডের বেশি লিখে যেতে পারেননি। পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হবার আগেই শরীর গিয়েছিল। শেষের দিকে দারুণ স্নায়বিক ব্যথায় হাত চলত না। তবু পঞ্চম খণ্ডের প্রুফ দেখা শেষ করেছিলেন, তারপর 'মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও' বলে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছিলেন।

শ্রীমকে দেখেছেন এমন অনেকে এখনো জীবিত আছেন। আমিও তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গও করেছি। কত বিনয়ী ছিলেন। নিজেকে মুছে ফেলেছিলেন যেন। কথামৃতে মাস্টার, মোহিনীমোহন, মণি, একজন ভক্ত—এইসব নামের মধ্যে আত্মগোপন করে রেখেছেন নিজেকে। কী তফাত অন্য মানুষের সঙ্গে। আমরা যদি স্মৃতিচারণ করতে চাই কিংবা পরিচিত কারো বিষয়ে লিখতে চাই, তাহলে নিজের কথাই বেশি বলে ফেলি। এখানে নিজের কথা প্রায় নেই।

কথামৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এই গ্রন্থ প্রামাণিক। যীশুখৃস্টের গস্পেল যীশুখৃস্টের শিষ্যরা লিখেছেন ; দেখা যাবে—এক গস্পেলের সঙ্গে অন্যটার মিল নেই, কেননা তাঁরা সমকালে লিখে রাখেননি। তাঁরা লেখাপড়া জানতেন কিনা সন্দেহ—দরিদ্র ধীবর ইত্যাদি। তাঁরা অন্যের কাছে যা বলেছেন তাই হয়ত অনেক পরে লিখে নেওয়া হয়েছে। আবার যীশুখৃস্ট বলে কেউ ছিলেন কিনা তাতেও অনেকের সন্দেহ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁর কথা ব্রাহ্মসমাজের পত্র-পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। তাঁদের উৎসবে তাঁর উপস্থিতি আনন্দের জোয়ার এনে দিত। তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য ও কিন্নর কণ্ঠের গানের কথা বলেছেন। কেশব সেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' বলে ছোট বই ছাপিয়েছিলেন। অন্য নানা সূত্র থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পাওয়া যায়। যেমন স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' আছে, আছে সুরেশ দত্তর বা রামচন্দ্র দত্তর সংকলিত রামকৃষ্ণ উপদেশ। এই সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপদেশের সঙ্গে কথামৃতের শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার ঐক্য আছে। সুতরাং কথামৃতের প্রামাণিকতায় সন্দেহ করা যায় না। প্রামাণিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ—শ্রীশ্রীমায়ের একখানা চিঠি। মা সেখানে বলছেন ঃ 'বাবাজীবন, এইসব কথা ঠাকুর একদিন তোমার কাছে রেখে দিয়েছিলেন।' কথাটার তাৎপর্য দেখুন। এই যে মণিমুক্তা, এসব যার-তার কাছে তো রেখে যাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ তা ভবিষ্যতের মানুষের জন্য গচ্ছিত রেখে গেছেন শ্রীম'র কাছে। মাতাঠাকুরাণী বললেন, তুমি নির্ভয়ে এইসব কথা প্রকাশ করো। 'নির্ভয়ে' বলছেন এইজন্যে যে,

প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীম'র মনে দ্বিধা ছিল, এ ও'র ব্যক্তিগত দিনপঞ্জী। তবে কেউ-কেউ ওর বিষয়ে জানতেন। মাঝে-মাঝে উনি সেটা পড়তেন লুকিয়ে-লুকিয়ে—কিন্তু লোকে লক্ষ্য করেছে। একদিন গিরিশ ঘোষ বললেন, 'আচ্ছা, তুমি নাকি কি লিখছো? একবার দিয়ো তো আমাকে দেখতে।' উনি বললেন, 'সে আমি কখনো দিতে পারবো না।' তারপর দ্বিধা কাটিয়ে নানা পত্রপত্রিকাতে ছোট-ছোট করে তিনি এইসব ছাপাতে লাগলেন। কিন্তু যে-ই পড়ল সেই মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা বলল, একি অপূর্ব বস্তু। তারপর মাকে যখন সেটা অর্পণ করলেন তখন শ্রীমা অভয় দিলেন, 'তুমি ভয় পেয়ো না। তুমি যা লিখেছ সব সত্য। এ প্রকাশ না হলে মানুষের শান্তি হবে না, কল্যাণ হবে না, তুমি মানবকল্যাণের জন্য এগুলি প্রকাশ করো।' স্বামীজীও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মাস্টারমশাইকে।

একটা কথা ওঠে—কথামৃতে যেসব কথা আছে তাই কি সব? শ্রীরামকৃষ্ণ কি তার বাইরে আর কিছু বলেননি? না, তা ঠিক নয়, কথামৃতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র রূপটা পাই না, তবে অনেকটা পাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শ্রীম যেতেন ছুটির দিনে। উনি তো মাস্টারি করতেন, স্কুলের ছুটি হলে তবে উনি যেতেন। ও'কে আবার অনেকে ঠাট্টা করে বলত—স্কুল-পালানো মাস্টার। সাধারণত শুনি, স্কুল-পালানো ছাত্র—কিন্তু এখানে স্কুল-পালানো মাস্টার। মানে, স্কুলের ফাঁকে উনি যদি শুনলেন ঠাকুর এসেছেন বলরাম মন্দিরে—শ্যামপুকুরে ছিল ও'র স্কুল—স্কুল থেকে উনি টিফিন পিরিয়ডে ঠাকুরের কাছে গেলেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি গো তুমি যে এখানে, তুমি কি করে এলে, স্কুল নেই?' তখন সেখানে যাঁরা আছেন, তাঁরা বলছেন—ও স্কুল-পালানো মাস্টার। কিন্তু আসলে তিনি কখনো দায়িত্বে অবহেলা করেননি। খুব ভালো শিক্ষক ছিলেন, ছিলেন খুব যোগ্য প্রধান শিক্ষকও। যাই হোক, তিনি তো ছুটির দিন ছাড়া ঠাকুরের কাছে যেতে পারতেন না—কাজেই আমরা কথামৃতে যা পাই তা কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্ররূপ নয়—সমস্ত ঘটনা ওতে নেই। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ নানা জনের কাছে নানাভাবে কথা বলতেন। তিনি তরুণ ছাত্রদের কাছে একভাবে বলেছেন, খৃস্টান মিশনারিদের কাছে আর একভাবে, সংসারী ব্রাহ্মদের কাছে ভিন্নভাবে। জ্ঞান ভক্তি কর্ম—সকল প্রকার কথা। তাইতো ম্যাক্সমূলার একবার একটা চিঠি লিখেছিলেন, তোমরা যদি বলো শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তবাদী ছিলেন, জ্ঞানমার্গী ছিলেন—আমি সেকথা মেনে নেব না, তিনি ভক্ত ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক যাঁরা কথামৃত খুঁটিয়ে পড়েছেন তাঁরা দেখবেন—কথামৃতের মধ্যে জ্ঞানের কথাও প্রচুর রয়েছে, বেদান্তের কথা প্রচুর রয়েছে। দেখা যাবে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটির দিনে, রবিবারে, যখন অনেক ভক্ত উপস্থিত, যাঁদের অধিকাংশই বিবাহিত, সংসারে আছেন, তাঁদের উপযোগী করে কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজী তাই বলেছেন, আদর্শ শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষকের লক্ষণ হচ্ছে, আমি যাদের কাছে বলছি তাদের উপযোগী করে কথা বলতে হবে। আবার

দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের যাঁরা খুব অন্তরঙ্গ, যাঁদের তিনি বলছেন এরা ঈশ্বরকোটি, যুগে-যুগে আমার সঙ্গে আসে, এই যেমন স্বামীজী ইত্যাদি—এঁদের জন্যে বলছেন আলাদা করে। এঁদের সঙ্গে কথা বলার আগে বলতেন, দেখে আয়তো, কেউ আশে-পাশে আছে কি না? দরজা বন্ধ করে দে। আলাদা করে তাদের কাছে কথা বলেছেন। আবার এঁদের মধ্যেও আলাদা করেছেন। যা নরেনকে বলছেন, তা হয়তো বাবুরামকে বলছেন না, তা হয়তো রাখালকে অথবা তারককে বলছেন না। কাজেই আমরা যদি মনে করি, কথামৃতে যা আছে তাই সব, তা ছাড়া আর কিছু ঠাকুর বলেননি, তা বললে ভুল করব। তবে এও সত্য, কথামৃতে সব রকম কথাই আছে। যদি এই কথামৃত পড়ি তাহলে দেখব, এর মধ্যে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ আছে, সাকার-নিরাকার আছে, শাক্ত-বৈষ্ণব আছে, যোগ তন্ত্র বেদান্তবাদ আছে। বস্তুতঃ শ্রীমার ভাষায় বললে, হাঁচি টিকটিকি থেকে আরম্ভ করে একেবারে অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে কোনো একটি বিশেষ বিশেষণ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি শাক্ত না বৈষ্ণব? তিনি সাকারবাদী না নিরাকারবাদী? তিনি কি কেবল হিন্দু? তা হলে অন্য পন্থায় ঈশ্বরসাধনা করতে গেলেন কেন? অন্ততঃ যে-কালে যে-মতে তিনি সাধনা করেছেন সেইকালে তিনি সেই মতের মানুষ। স্বামীজী তাই বলেছেনঃ 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব-ধর্ম-স্বরূপিণে।' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন। তিনি সকল ধর্মকেই ধরে রেখেছেন। তাঁকে আপনি হিন্দু বলতে পারেন, মুসলমান বলতে পারেন, খৃস্টান বলতে পারেন, বৌদ্ধ বলতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে একজন খৃস্টান বলছেন, আপনি আমার যীশুখৃস্ট।

কথামৃত পড়লে দেখা যাবে, সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা সেখানে আছে। মনে রাখা দরকার, সেই যুগে শাস্ত্রের সাথে সাধারণ মানুষের বিশেষ পরিচয় ছিল না। হিন্দুর মূল শাস্ত্র উপনিষদ্, গীতা, আর ব্রহ্মসূত্র। তারপর ভাগবত। কিন্তু এসব খুব কম লোকেই পড়ত। কেননা এখনকার পক্ষে কঠিন সংস্কৃতে ঐ শাস্ত্র লেখা। কথামৃতে আছে ঐ সকল শাস্ত্রের সার। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন হিমালয়-শিখর থেকে তাঁর কথামৃতের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রের প্রাণধারা বইয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষাতে এল গভীরতম সত্য। এসব কথা কিন্তু মনগড়া নয়। আমাদের দেশে আপনি গুরু হতে পারেন কিন্তু আপনার কথা কেউ নেবে না যদিনা আপনি শাস্ত্রসম্মত কথা বলেন। আপনার নিজের মনের কথা বা মনগড়া কথা গ্রাহ্য হবে না। শাস্ত্রকে আমরা অপৌরুষেয় বলি, সনাতন বলি। তা কে লিখেছে আমরা জানি না, কিন্তু এই শাস্ত্র ধরে রেখেছে—সমাজকে, জাতিকে, ধর্মকে। সেই শাস্ত্র হল উপনিষদ্, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, ভাগবত। কথামৃতে এ-সবের কথাই রয়েছে, কিন্তু কি সহজ ভাষায়, কত সাবলীল ভঙ্গীতে। কেন তাঁর কথা আমাদের বিশ্বাস হয়? কারণ সে-সব তাঁর অনুভূতিসিদ্ধ, অপরোক্ষ অনুভূতির ফল। চোখে না দেখলে কাশী কি-রকম জায়গা সেটা কি ধারণা হবে? বইয়ে আছে কাশীর বর্ণনা। তা পড়ে

কাশীকে জানা যায় না। কাশীতে গিয়ে মন্দির দেখলে, গঙ্গা দেখলে, ঘাট দেখলে, সাধু দেখলে—কাশীর সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হবে। প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেকটি কথা এত প্রাণস্পর্শী। উপনিষদের উচ্চতত্ত্ব যদি সাধারণ মানুষ পড়তে যায়—একটুখানি পড়বার পর মাথা ধরে যাবে। কি কঠিন এবং কত জটিল সে-সব তত্ত্ব। সে-সব যদি বাংলায় অনুবাদ হয়, তাহলে আরও দুর্বোধ্য। কিন্তু কথামৃত পড়ার পরে যদি আপনি উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, এমন কি তন্ত্রও পড়েন—সব বুঝতে পারবেন। কি সুন্দর সব তাঁর উপমা। তাঁর কথায় সব যেন হয়ে উঠেছে জীবন্ত মূর্তি। দু'একটা উদাহরণ দিই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—একটা তত্ত্বকথা। সব ব্রহ্ম—আপনি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, জীব জগৎ সব ব্রহ্ম, গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত ব্রহ্ম। কি রকম, না একটা কলসী জলে ডুবিয়ে রাখা হল, তার ভিতরেও জল, বাইরেও জল। আবার সকলের মধ্যে একই ব্রহ্ম বোঝাবার জন্য বললেন, যেমন পুলি-পিঠে, নানা খোল কিন্তু ভিতরে একই পুর। নিজের অনুভূতির কথা বললেন—কাঁচের আলমারির মধ্যে যেমন সবকিছু দেখা যায়, তেমনি সকলের মধ্যে নারায়ণ দেখছি। বললেন, বর্ষায় যেমন পৃথিবী জরে' থাকে তেমনি চৈতন্যে জগৎ জরে' আছে। এমনই সব ঘরোয়া কথায় উচ্চ-উচ্চ তত্ত্ব। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'পয়স্তরঙ্গয়োর্দ্বিত্ব'। জল ও জলের তরঙ্গ আলাদা বলে মনে হয়, তেমনি ব্রহ্ম ও জীবজগৎ আলাদা বলে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র। জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি, বুদ্‌বুদ—তাতেই জন্ম, তাতেই লয়। এ ব্রহ্মসমুদ্রে আমরা সবাই বুদ্‌বুদ। আমরা তা থেকেই এসেছি আবার তার মধ্যেই মিশে যাব। কতবড় কঠিন তত্ত্বকথা শ্রীরামকৃষ্ণ কত সহজে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর উপমার পরে 'পয়স্তরঙ্গয়ো'র অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমরা গীতাতে পাই—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। সব ত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'। তোমার সমস্ত পাপ থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করবো। 'মা শুচঃ'! তুমি শোক করো না অর্থাৎ ভয় পেয়ো না। এই যে আত্মসমর্পণের কথা গীতাতে রয়েছে, তা বোঝাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: জাহাজের মাস্তুলে একটা পাখী বসে আছে, জাহাজটা নোঙর ফেলে রয়েছে; তারপর কখন ছেড়ে দিয়েছে, সমুদ্রে ভেসে চলেছে। অনেক দূর যাবার পরে পাখীর খেয়াল হল, আরে এ আমি কোথায় এলাম। আমায় এবার বাসায় ফিরতে হবে। তখন সে একবার উত্তর দিকে গেল, কূলকিনারা নেই, ফিরে এলো। তারপরে গেল দক্ষিণে,তারপরে গেল পূর্বে, তারপরে গেল পশ্চিমে। কোথাও কূলকিনারা নেই। শেষকালে ভাবল, কোথায় আর যাবো, মাস্তুলেই বসে থাকি। ঠাকুর বললেন, সংসারে থাকো পাঁকাল মাছ হয়ে। গীতায় দেখি, "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" বললেন, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো। আবার বলছেন, কচ্ছপ যখন চরতে বেরোয়, তখন মনটা আড়ায় রেখে দেয় কেননা আড়ায় তার সন্তান

রয়েছে, তেমনি মনটা তুমি ভগবানের দিকে রেখে সংসার করো। এইভাবে শাস্ত্রের কথাই সমস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ছোট-ছোট উপমা দিয়ে, আর আমাদের কাছে অর্থটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্র বলছে, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। তাঁর আলোতেই সব কিছু প্রকাশমান। তিনি থাকলে সব থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কি রকম জানো—এক লিখে তার পিঠে শূন্য দাও, দশ হবে, আর একটা শূন্য দাও একশ, আর একটা শূন্য—হাজার। শূন্য যতই দিচ্ছ অঙ্ক বাড়ছে। কিন্তু যেই 'এক'টা মুছে ফেললে সব শূন্য, এতগুলি শূন্য সব বৃথা। তেমনি ঈশ্বর যদি থাকেন সব আছে,নইলে কিছু নেই। বলা হয়, 'উপমা কালিদাসস্য'। অর্থাৎ উপমায় কালিদাস অতুলনীয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কালিদাসকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর উপমার শেষ নেই'। আর তার বৈচিত্র্যই বা কত। যেন মা তাঁকে রাশ ঠেলে দিচ্ছেন। তাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ এইকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পীরা বলছেন: 'উপমা রামকৃষ্ণস্য'।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'কালে ঘরে-ঘরে এর পুজো হবে'। তার সত্যতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আবার দেখছি, ঘরে-ঘরে তাঁর কথামৃতের প্রবেশ। ঘরে-ঘরে ছবি, ঘরে-ঘরে কথামৃত। আমাদের নিউইয়র্কের স্বামীজী বলেন, কথামৃত ছেপে তাঁরা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। ইংরেজিতে অনূদিত কথামৃত সম্বন্ধে একটা কথা বলি—তার রূপ খুব মার্জিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে যা আসত সব বলে যেতেন, শালা-টালা—এবং আরও নানা সভ্যজগতের দৃষ্টিতে অমার্জিত শব্দ—বিদেশী লোকেরা কি মনে করবে ভেবে অনুবাদে সেসব বাদ দেওয়া হয়েছে। কথামৃত ইংরাজি থেকে জার্মানে অনুবাদ হয়েছে। একজন জার্মান ভক্ত, তিনি ইংরেজীতে অনূদিত কথামৃত পড়েছেন, পড়েছেন বাংলায় মূল কথামৃতও। তিনি বলেছেন: শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন ঠিক সেই জিনিস চাই, কোনো পরিমার্জন চলবে না। তিনি অবতার, তাঁর মুখের কথার বদল করা চলবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীম'র সাক্ষাতের পরে শতবর্ষ পার হয়ে গেল। এর মধ্যে কথামৃত বাংলার একালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ হয়ে উঠল। শত-শত বৎসর ধরে এই বই চলবে। এখন এই বই হিন্দুর এক শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র। এমন দিন আসবে যখন কেবল হিন্দুর নয়, মুসলমান, খৃস্টানসহ অন্য ধর্মের মানুষেরা একে নিজের ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করে নেবে। কেননা এই গ্রন্থ সর্বশাস্ত্র-সার। হংস যেমন জল মেশানো দুধ থেকে জল বাদ দিয়ে দুধ গ্রহণ করে, তেমনি পরমহংস সর্বশাস্ত্রের তরল অংশ বাদ দিয়ে ক্ষীর-অংশ গ্রহণ করেছেন। 'কথামৃত' তারই পাত্র। তাই 'কথামৃত' অমৃতকুম্ভ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—নবযুগের ভাগবত

স্বামী গহনানন্দ

'শ্রীম'—মাস্টারমশাই—কথামৃতের প্রারম্ভে শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে এই শ্লোকটি দিয়ে মঙ্গলাচরণ করেছেন :

"তব কথামৃতম তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥

অর্থাৎ—তপ্তজীবন সুশীতলকারী, ক্রান্তদর্শী দ্বারা বর্ণিত, পাপহরণকারী, শ্রবণমাত্রে সকলের কল্যাণকারী, তোমার অমৃতময়ী বাণী যাঁরা জগতে প্রচার করেন তাঁরা ধন্য।

মাস্টারমশাই অতি ভাগ্যবান। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীভগবান সাক্ষাৎ নরশরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গকালীন তাঁর অমৃতময়ী বাণী তিনি যেভাবে লিপিবন্ধ করেছেন—ইতিহাসে কোনো অবতারপুরুষের জীবনচরিত এমনভাবে লেখা হয় নি। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে লিখেছিলেন : এখন বুঝতে পারছি কেন আমরা তাঁর জীবনী লেখার চেষ্টা করিনি। এই মহৎ কাজটি আপনার জন্যই রাখা ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টারমশাইকে একদিন বলেছিলেন—"মা ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে সংসারে রাখেন, নয়তো ভাগবত কে শোনাবে?"

কথামৃত হচ্ছে—সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী—নবযুগের ভাগবত।

মঙ্গলাচরণের পর কথামৃতে প্রথমে পাই—একটি পাখীর ছবি। নীচে লেখা রয়েছে :—যোগীর চক্ষু—।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অথাৎ মাস্টারমহাশয়ের প্রতি)—যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পারো?

মণি—যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করব যদি কোথাও পাই।

একশ বছর আগে, ১৮৮২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে, মাস্টারমশাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত লিপিবন্ধ করতে আরম্ভ করেন। যখন ছুটি পেয়েছেন ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন, তাও খুব বেশী নয়। আমরা ১৮৮৬ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিবরণ পাচ্ছি। ঐ সময় তিনি সংক্ষেপে যে-যে নোট রেখেছিলেন সেগুলি পরে সুবিন্যস্ত করে লিপিবন্ধ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে কেউ-কেউ তাঁর কথা যা শুনতেন, নিত্য লিখে

রাখতেন। তিনি জানতে পেরে তাঁদের বলেন—তোদের ওসব কিছু করতে হবে না। সেই থেকে তাঁরাও ঐ কাজ থেকে বিরত হন। 'কথামৃত' প্রকাশিত হলে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কথা শ্রীম'র জন্য গচ্ছিত রেখেছিলেন।

শুধু তাই নয়, শ্রীম যেসব কথা শুনতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দিয়ে সময়-সময় আবার পুনরুক্তি করিয়ে নিতেন—"আজ কী-কী কথা হ'ল বলো দেখি?" শ্রীম পুনরাবৃত্তি করলে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার সংশোধন করে দিতেন। এদিকে মাস্টার-মশাইর স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর ছিল। ছাত্রও ভাল ছিলেন। তবুও তাঁর কথা যথাযথভাবে রক্ষিত হচ্ছে কিনা তার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাই মাস্টারমশাইর শ্রুত বিষয় নিজেই edit করে দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারে কথামৃতের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা কথামৃত যেভাবে পেঁছে দিয়েছে আর কোনো গ্রন্থ বোধহয় তেমন করেনি। এই সেদিন কলকাতার বইমেলাতে কথামৃত যত বিক্রী হয়েছে এমন কোনো গ্রন্থ বিক্রী হয়নি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় দেশেবিদেশে বিভিন্ন ভাষায় কথামৃতের অনুবাদ হয়েছে। বহু মনীষী কথামৃত সম্বন্ধে বহু কথা বলে গিয়েছেন।

কিছুদিন আগে একজন প্রফেসর এসেছেন—রাশিয়া থেকে—উত্তর ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে এসে খোঁজ করছেন রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো কেন্দ্র সেখানে আছে কিনা? তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিশন-কেন্দ্রে। তিনি কিছু প্রামাণ্য বই—'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ দি গ্রেট মাস্টার', 'ওয়ার্কস্ অফ সিস্টার নিবেদিতা'—এই সব বইগুলি বেছে-বেছে নিলেন। সেখানের অধ্যক্ষ-স্বামীজী উৎসুক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কমিউনিস্ট কাণ্ট্রি থেকে এসেছেন, আপনার এত আগ্রহ কেন এইসব বই-এ? তিনি আরো জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করে এইসব বই-এ আকৃষ্ট হলেন? তখন তিনি বললেন, তিনি হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে স্টাডি করছেন। পরিশেষে তিনি বললেন—'আপনারা দেখবেন পঞ্চাশ বছর পরে এই যে-সব ভাবধারা এখানে প্রকাশিত, সেটাই টিকবে। এত উদার, এত বিশ্বজনীন, সর্বজনীন ভাব। ও'রা কাউকে বাদ দেন নি।'

কিছুদিন আগে এক ইহুদী ভদ্রলোক লিখেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত বেদান্তধর্ম সব জায়গায় প্রচার করা উচিত, ইজরাইলে একটা রামকৃষ্ণ সেণ্টার হওয়া উচিত। তিনি তার জন্য অগ্রণী হয়ে এসেছেন, সেখানে কিছু করতে হবে বলে। আর একজন আফ্রিকা থেকে চিঠি লিখেছেন—তিনি কিছুদিন আগে এদেশে ঘুরে গেছেন—তিনিও তাঁদের দেশে একটি রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার চান। তিনি লিখেছেন, যদিও ওটি খৃীস্টান দেশ, তবু এই বেদান্তই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ।

যখন আমি মঠের একটি পাবলিকেশন ডিপার্টমেণ্টে ছিলাম, তখন দেখেছি, আমেরিকা থেকে ভক্তরা লিখছেন:—আমরা 'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' পড়ছি,

কিন্তু আমরা মূল বাংলা পড়তে চাই। তাঁদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণ পরিচয়', বেঙ্গলী টু ইংলিশ ডিকসেনারী, ইংলিশ টু বেঙ্গলী ডিকসেনারী. আর বাংলা কথামৃত পাঠানোর পর তাঁরা বাংলা পড়তে শিখেছেন। কিছুদিন পর তাঁরা জানাচ্ছেন, 'আমরা কথামৃত পড়ছি আর মনে হচ্ছে, তিনি আমাদের সামনে বসে আছেন'। এখানকার একটি যুবক মেরিন ইঞ্জিনিয়ার—আমাদের আমেরিকান কোনও একটি কেন্দ্রে গিয়েছে। সেখানে ভক্তেরা তাকে বাঙালী জেনে বলেছে, তুমি বাংলায় কথা বলো। সে অবাক হয়ে গেল। সে বলল, তোমরা বাংলা ভাষা বোঝোনা, আমি বাংলা কথা বলবো কি? তারা বললে, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় কথা বলো, আমরা শুনবো।

বাইরের লোক এখন ছুটে আসছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানবার জন্য। আমার মনে পড়ছে—ক্রিস্টোফার ইশারউড যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখছিলেন—তখন কামারপুকুর, জয়রামবাটি, দক্ষিণেশ্বরের বর্ণনা লেখবার আগে ছুটে এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। তারপর দক্ষিণেশ্বর, কামারপুকুর, জয়রামবাটি, বেলুড় দেখে সোজা আমেরিকা ফিরে গেলেন। এই বই লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অন্য কিছুতে মন দেবেন না।

বহু দেশের বহু মানুষ কথামৃতের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শ লাভ করেছেন। অনেকে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে পরে কথামৃত পড়েছেন। আমি নিজেও প্রথমে স্বামীজীর লেখা পড়ে সঙ্ঘে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। কথামৃত পড়েছি সংঘে যোগ দেওয়ার পর। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান-গণও বলতেন—আগে স্বামীজীকে ভাল করে পড়ো। তাহলে স্বামীজীর চিন্তার আলোতে ঠাকুরকে ভাল করে বুঝতে পারবে। স্বামীজী নিজেও বলেছেন—"He (Sri Ramakrishna) lived the life and I read the meaning in it."

তবে সকলেই যে স্বামীজীর বই পড়ে কথামৃত পড়েছেন তা বলাও ঠিক হবে না, শ্রীম যতদিন স্থূলশরীরে ছিলেন—তাঁর সংস্পর্শে এসে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই মঠে যোগদান করেছেন। এদিক থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে মাস্টারমশাইর অবদান অসামান্য।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু সন্ন্যাসী প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে কথামৃত পাঠ করে থাকেন। এভাবে প্রতিদিন পাঠের ফলে অনেকেরই কথামৃত প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে যায়।

বৃদ্ধ ও রুগ্ন সন্ন্যাসী—যাঁদের পক্ষে নিজে-নিজে বই পড়া সম্ভব নয়—তাঁরা কোনো ব্রহ্মচারী বা যুবক সন্ন্যাসীকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের কাছে কথামৃত পাঠ করতে বলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের জীবনবেদ হচ্ছে কথামৃত। কথামৃতের আলোতে তাঁরা যখন উপনিষদ ও গীতা পাঠ করেন তখন ঐসব প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে নূতন আলোর সন্ধান পান।

আবার সংঘাধিপতিদের অনেকেই ভক্তদের প্রতিদিন কথামৃত পাঠের নির্দেশ

দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, কি গো, চোখ বুজলেই তিনি আছেন আর চোখ খুললে তিনি নেই? না, তা সত্য নয়। চোখ বোজা বা চোখ খোলা—তিনি আছেনই। চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। কথামৃতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তসঙ্গে কথোপকথন এমনভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, সেই চিত্রগুলি স্মরণ মনন করলেও ধ্যানের ফল পাওয়া যায়।

কথামৃতের মধ্যে আমরা পাই—কি করে সংসারে থাকতে হয় সেই তত্ত্ব। পাই —সংসারে থেকে ভগবানকে কি করে ডাকতে হয়। ঠাকুর বলেছেন, সংসার করতে আমি বারণ করছি না, কিন্তু সংসারে ঢোকার আগে যে বনে বাস করবে সেই বনের সম্বন্ধে জেনে নেওয়া উচিত। যদি জানা থাকে, তাহলে বিপদ-আপদ শোকে জর্জরিত হবে না। বলেছেন, নৌকো জলে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকোর ভেতরে যেন জল না থাকে। তেমনি তোমরা সংসারে থাকো কিন্তু তোমাদের ভেতরে যেন সংসার না থাকে। আরো বলেছেন, দুদিনের জন্য এখানে আসা যেন বড় মানুষের বাড়ীর দাসীর মতো কাজ করা। দাসী তাঁদের ছেলেমেয়েদের আদর করছে, যত্ন করছে—আমার যদু, আমার মধু, আমি না হলে ওরা খায় না, এই সব। কিন্তু সে মনে-মনে জানে—এরা আমার কেউ নয়, আমার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে, কাজ ফুরোলেই আমাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। যেমন অভিনয় করা—রাজা সাজছে, মন্ত্রী সাজছে, কত কি সাজছে। যতক্ষণ পোশাক পরে আছে, অভিনয় করছে, সে জানে, আমি অভিনয় করছি, বাস্তব নই। তার মধ্যে আবার কখনো-কখনো কেউ পোষাক খুলতে চায় না, গ্রীনরুমে গিয়ে যেন সত্যি রাজা হয়ে পড়ে। এ সংসারে আমাদেরও তাই হয়। এ সংসারে এসে কখনো মা সাজি, কখনো বাবা, কখনো ছেলে সাজি, ভুলে যাই আসল রূপ, ভুলে গিয়ে আটকে পড়ি। একমাত্র জায়গা আমাদের ভগবান, তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। ঠাকুর যেন আমাদের এইসব দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাকে মা সেজে, বাবা সেজে, ছেলে সেজে, কাজ করতে হবে। ঠিক-ঠিক বাবা মায়েদের কর্তব্য পালন করতে হবে। তবে জানতে হবে, ভগবানই আমাদের একমাত্র আশ্রয়-স্থান, তাঁকে ধরেই আমাদের চলতে হবে। একমাত্র ভগবানই সত্য। এই শিক্ষাই আমরা কথামৃত থেকে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী কী অপূর্ব। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন—

"তিনি অন্তর্যামী! তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধমনে প্রার্থনা করো। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহংকার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও; সব পাবে।

"আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।"

"যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষভাব আর রাখবে না।' 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে সাকার মানে না; ও হিন্দু; ও মুসলমান, ও খৃস্টান'—এই বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা করো না! তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে যত দূর পারো। আর ভালবাসবে, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ করবে। 'জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের স্ব-স্বরূপকে দেখতে পাবে।"

(১ম—১২ খণ্ড-নবম পরিচ্ছেদ—পৃঃ ১৬৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ধর্মজগতে—একটি অনন্য গ্রন্থ। আর যে-মানুষটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ একাজে ব্রতী করেছিলেন তিনিও ছিলেন অনন্য। এই অনন্য মানুষটি যিনি 'শ্রীম' ছদ্মনামেই অমর হয়ে রইলেন অগণিত ভক্ত মানুষের কাছে, তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব কী নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে তিনি পালন করে গিয়েছেন—তার জবাব দেবে ভাবী কাল ও অনাগত যুগের ইতিহাস।

রামকৃষ্ণ কথামৃতে সমন্বয়

স্বামী আত্মস্থানন্দ

রামকৃষ্ণ কথামৃতে সমন্বয়, আমার আলোচনার বিষয়। কথামৃত কি দেয়? তা আর কিছু দেয় না—সর্ব স্তরের, সর্ব কালের, সর্ব দেশের মানুষের কাছে ভগবানকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এনে দেয়। স্বয়ং ঈশ্বর এখানে বক্তা। তিনি ধর্ম দান করছেন। ধর্ম কি? যা সদাসর্বদা ধরে রাখবে। ইহকালে পরকালে ধরে রাখবে। জীবনে-মরণে, সুখে-দুখে, ঘাতে-প্রতিঘাতে, জয়ে-পরাজয়ে ধরে রাখবে। "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং, বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।" সে কিরকম? যে ধর্ম সমস্ত সংকীর্ণতা, যা-কিছু দূষণ, সমস্ত এষণা, একেবারে মুছে নিয়ে যাবে একমাত্র ঈশ্বরারাধনায়—নির্মৎসরানাম্ সতাম্ বস্তু বেদ্যং। তাই ব্যাসদেব ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই বলে দিয়েছেন, 'সত্যম্ পরম ধীমহি'। যারা কায়মনোবাক্যে সত্যের উপাসনা করে, সত্য যাদের জীবিকা, সত্য যাদের লক্ষ্য, এইরকম 'সতাম্' সাধু ও মহান ব্যক্তিদের—'নির্মৎসরানাম্ সতাম্' ধর্ম—জীবনলক্ষ্য, জীবনধারা, জীবনদর্শনই ভাগবত ও কথামৃতের বিষয়। বাস্তব জগতে যদি বাঁচতে হয় তাহলে মানুষ ভগবানকে নিয়ে কি করে চলবে? ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ব্যবহারিক বাস্তবকে নিয়ে কি করে চলবে? বস্তু কোনটা? বস্তু তো এক। ঐ একই স্বতন্ত্র, বাকি সব তো অবস্তু—পরতন্ত্র। আমাদের লোকব্যবহার, দিনচর্যা,

সবই পরতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের দাস, প্রকৃতির দাস, রাজনীতির দাস, নাম-যশের দাস, অর্থের দাস, মোহের দাস। কোনও স্বাধীনতা আছে জীবের? ভয়ংকর পরতন্ত্র। আমরা স্বাধীনতার কিছুই জানি না। তবেই জানতে হয় বস্তু কি? কথামৃতের কথায় ভগবানই বস্তু আর সব অবস্তু। এই বস্তুমাত্রই বেদ্যং, শিবদং। এসব জানলে কি হয়? তাপত্রয়োন্মূলনম্। ত্রিতাপ দূর হয়। ব্যাসদেব বলছেন—"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলম্। শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্। পিবত ভাগবতম্ রসমালয়ম্। মহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।" যা শুনলে অমৃত শোনা হয়। যা অন্তরস্থ হলে অমৃত আস্বাদন হয়। কি পান করছি? পিবত ভাগবতম্ অমৃতম্—ভগবানের অমৃত-কথা, ভগবানের গুণকীর্তন। কতক্ষণ? যতক্ষণ পারি—"যাবন্নচ্যবতে মনঃ"—যতক্ষণ মন স্থির থাকে।

"ন খলু গোপীকা নন্দনো ভবান্ অখিল দেহিনাম্ অন্তরাত্মদৃক্"। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভাল করে চিনেছিলেন, তাই বলেছিলেন—ন খলু গোপীকা নন্দনো ভবান্ অখিল দেহিনাম্ অন্তরাত্মদৃক্। তুমি শুধু গোপিকানন্দন নও, তুমি অখিলচরাচর বিশ্বের সকল দেহধারীর অন্তর্দ্রষ্টা। তুমি আত্মগোপন করে এসেছিলে আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের কল্যাণের জন্য। আমাদের কোলে তুলে নেবার জন্য তুমি এসেছিলে। একথা আমরা ভাগবতে পাই। মাস্টারমশাই সেইজন্য বই-এর গোড়ায়—"তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদাজনাঃ"—এই শ্লোকটি দিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব যাঁর কথা বলেছেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্", ঐ সেই তিনি—আরও অনাড়ম্বর হয়ে, আরও মানুষকে সহজে ধরা দেবার জন্য, এমন করে হেসে খেলে নেচে গেয়েছেন। যখন কৃষ্ণ-কথা ভাবি, রাম-কথা ভাবি, পুরাণ পড়ি, ভাগবত পড়ি, রামায়ণ পড়ি, তখন কত গল্প পাই, কত বিচিত্র পরিস্থিতির, কত বিচিত্র ব্যক্তিত্বের বর্ণনা পাই। কত অদ্ভুত ঘটনাবহুল। শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীরামচন্দ্রে কত ঐশ্বর্য। আর এখানে ঐ দক্ষিণেশ্বরে পাগলা পূজারী 'রামকেষ্ট'। (এঁকে অনেকে তাই বলত, এখনো বলে।) তাঁর বাইরের ঐশ্বর্য নেই—সবই অন্তরের ঐশ্বর্য। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঘুরে বেড়াতেন, কাঁদতেন, হাসতেন, মার সঙ্গে কথা বলতেন। রামলালার সঙ্গে খেলতেন। মুহুর্মুহু সমাধি হত। তাঁর ভাষা গ্রাম্য, বড় সোজা। লেখাপড়া নেই, কিন্তু বহু পাণ্ডিত্য নিয়ে অনেকে যা বোঝেন না, সেসব তাঁর কাছে ছিল নিত্যাসিদ্ধ। তিনি অকৃপণভাবে বিতরণ করেছেন সত্য—সদাসর্বদা তাঁর সরল বাণী ও আচরণে। মাস্টারমশাই দৈবাধীন হয়ে এই তত্ত্ব বুঝেছিলেন। তাঁকে বর্তমান যুগে দরকার ছিল বলে তাঁর কাছে ঠাকুর আগেই ধরা দিয়েছিলেন। তাই গোড়াতেই তিনি আরম্ভ করেছিলেন "তব কথামৃতম"। কথামৃত মানুষকে কোনো ঐশ্বর্য, কোনো আড়ম্বর না দিয়ে প্রতি পংক্তিতে একটানা ভগবানের কথা বলে গেছে। তাই অতুলনীয় এই ধর্মগ্রন্থ। এই নূতন ব্রহ্মসূত্র,

নূতন ভাগবত, নূতন অমৃতগঙ্গা কত সহজ করে বলা, এমন করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে, যে একটু পড়তে পারে সেই বুঝতে পারবে। তার দ্বন্দ্ব আর থাকবে না। কথামৃতে রামায়ণ মহাভারতের রোমাঞ্চ উত্তেজনা নেই, রামের বনগমন, সীতাহরণ নেই, পাণ্ডবের জতুগৃহদাহ নেই—ও সবের বালাই নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথামৃত পড়তে আরম্ভ করলে থামা যায় না। কেন থামা যায় না? কারণ আনন্দময়ের আনন্দকথামৃত-প্রবাহে যে-কোনো মানুষ যদি ধীর স্থির হয়ে অবগাহন করতে পারে, তাহলে তার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হবে ভক্তি-কমল, বিশ্বাসের শুভ্র শ্বেতপদ্ম। জ্ঞানসূর্য উদিত হবে নির্মল কিরণে দশদিক উদ্ভাসিত করে।

ঠাকুর বলেছেন, জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকে আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকে ভগবান্ বলে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন। একটি মানুষ সে পূজারী হতে পারে, রাঁধুনি হতে পারে, গায়ক হতে পারে। একই বস্তু নাম-ভেদ মাত্র। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ সব এক। এই-যে এতবড় একটি তত্ত্ব, যে-তত্ত্বটি বোঝাতে কত বড়-বড় বই লেখা হচ্ছে, সেটি কত সোজা কথায় সুন্দর করে বোঝালেন। আর একটি বিরাট দ্বন্দ্ব—ব্রহ্ম আর শক্তি। ঠাকুর বললেন, দ্যাখো, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। উদাহরণ দিলেন, যখন সাপ হেলেদুলে চলে তখন শক্তি, যখন স্থির হয়ে থাকে তখন ব্রহ্ম। ঠাকুর সমন্বয় করে যাচ্ছেন। জ্ঞান ভক্তির লড়াই অজানা সময় থেকে সাধকমনে চলছে। ঠাকুর বললেন, শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি এক। তিনি বলেছেন, আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরাও তাঁকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, ব্রহ্মবাদীরাও পাবে, আবার মুসলমান, খৃষ্টানরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। বৈষ্ণবরা বলছেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। অতএব তুমি কৃষ্ণপুজো করো, কালীপুজো করছ কেন? শাক্তরা বললেন, তোরা কি কেষ্ট বিষ্টুর পুজো করছিস, এই দ্যাখ, মা কালী খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, এক্ষুণি গলা কেটে ফেলবেন, কালী পুজো কর্। আবার পাদরীরা বলেন, তোমার কেষ্ট কি করিবে, আমার যীশু এইরকম করিয়া থাকে। ঠাকুর বলছেন, এরকম যারা করে তাদের সে বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি। তা ধর্মের বুদ্ধি নয়। এটা অত্যন্ত জাগতিক, ব্যবহারিক। সমন্বয়ের মূর্তি ঠাকুর। নিজে সবরকম সাধন-ভজন করে, প্রত্যেকটা যে সত্য, সেটা নিজে পরখ করে দেখে, তবে লোককে নিতে বলেছেন। এ-যুগে এটা দরকার ছিল। এটা বৈজ্ঞানিক যুগ। করে দেখাতে হবে। নির্বেদানন্দ স্বামী তাঁর বইতে ভারী সুন্দর লিখেছেন। এই যে ঠাকুর এত রকম কাজ করলেন, এত তপস্যা করলেন, এত সাধন-ভজন করে একের পর এক সিদ্ধিলাভ করলেন, তাতে কি হোল—'He has given the hall-mark of truth on all religions. Registration করা হলে তার একটা Registration mark থাকে, পেটেন্ট থাকে। কালস্রোতে পড়ে সেই সমস্ত পেটেন্টগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল তত্ত্বগুলো। ঠাকুর আসার

ফলে কি হয়েছে? তিনি এসে দেখিয়ে দিয়েছেন সব ঠিক আছে বাবা, ঝগড়া করো না—আপনভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে চলো। দক্ষিণেশ্বরে ঐ পাগলা 'রামকেষ্ট'র জীবনটায় ছিল কি? 'Parliament of Religions in action. কোন্ কালে কার যেন ভগবানলাভ হয়েছিল—সেটা শুনে আমি 'হরি. ওঁ' 'হরি ওঁ' করবো? এইযুগে লোকে স্পষ্ট প্রমাণ চায়। ঠাকুর তাই নিজের জীবনে একের পর এক অনুষ্ঠান করে প্রমাণ দিলেন। তাঁর মতো সমন্বয়ের বিগ্রহমূর্তি পূর্বে কোনও অবতারে আছে বলে জানি না। কেউ এদিকে, কেউ ওদিকে। কারও কারও বাণীতে হয়ত ওই তত্ত্বকথা পাচ্ছি, কিন্তু জীবনে বাস্তবায়িত করেন নি, ঠাকুর যা করে-ছিলেন। কাজেই মতুয়ার বুদ্ধি যেন আমরা না করি। ঠাকুর বলছেন, এই-যে তোমরা মতুয়ার বুদ্ধি করো, এই-যে দ্বন্দ্ব করো, তাতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয়. তোমরা ভগবানকে পাওনি, দ্যাখোনি! আরে মানুষ কি ভগবানের ইতি করতে পারে? বড় জোর বলে, তিনি ঐ বাঁশী হাতে, এই পর্যন্ত। তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কিংবা তাঁকে পেতে হলে পশ্চিম দিকে চাইতে হবে, আগুন জ্বালতে হবে, এই পর্যন্ত। গুজরাটের নরসিংহ মেটার জীবনের একটি ঘটনা মনে আসছে। ভক্তরাজ নরসিংহ-র মেয়ের, না ছেলের বিয়ে। তিনি তো ঠাকুর ছাড়া কিছু জানেন না। তখন তিনি একটি গান গাইলেন—"হরি তেরা নাম হাজার, কোই রাম কহে, কোই কৃষ্ণ কহে, কোই কহে অনন্ত অপার।…হরি কয়া নামে লখউ কংকোত্রি।" কংকোত্রি মানে বিবাহের রঙীন নিমন্ত্রণপত্র। হরি, তোমার তো হাজারটা নাম শুনি. তুমি কৃষ্ণ, রাম, হরি, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা। তোমার ঠিক কি নাম, ঠিকানাটা কোথায়? হরি, তোমাকে কোন্ নামে কোন্ ঠিকানায় পাঠাবো চিঠি? কি সুন্দর গান। ঠাকুর বলতেন—'এক রাম তার হাজার নাম।' সব শাস্ত্রই তাঁকে চায়। ভারী সুন্দর করে বললেন, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ।' যারা সাকার-সাধক তাদের বললেন, যার যে-মূর্তি ভালো লাগে, সে সেই মূর্তি নিয়ে থাকুক। একটাকে ধরো, একটি জায়গায় মনটাকে রাখো। কেমন সুন্দর বলছেন তিনি, 'বাহির শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।' 'যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।' 'তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত।' 'সদা প্রেমসে বসতি হ্যয় ভগবান।'

ঠাকুর পাগল? হ্যাঁ, তবে সেয়ান পাগল। নরেনের মতো অমন তেজোদ্দীপ্ত সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি, তাঁকেও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরালেন। নরেনকে ধরলেন কেন? নিজে তো নিজের প্রচার করতে পারেন না, তাই নরেনকে ধর্। এই নরেনকে ধরে অলক্ষ্যে চক্র ঘোরালেন। আর কথামৃতে তোলা রইল তাঁর নানা কথা, নানা ভাব। কারণ নানা লোক আসবে, তাদের নানা প্রয়োজন। দেখা হয়নি কার সঙ্গে? কেশব সেন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর—কে নয়? কি দরকার ছিল ঐ পাগলাটার কাছে তাঁদের? গিরিশ এসেছে, গিরিশের মঞ্চ থেকে এসেছে নট-নটীর দল। তারা এল কেন? আমার ঠাকুর আর তোমার ঠাকুর কি আলাদা? আমি শুচি-শুদ্ধ আর তুমি

গোল্লায় গেছ ? এসব হচ্ছে নির্বোধের কথা, রামকৃষ্ণের ঘরের কথা নয়। এখানে সবরকম লোক আসবে, পরিষ্কার বলছেন। তিনি নেই কোথায় ? একদিন দেখি কি, তিনি এখানকার সরকারী লালবাড়ির সিকিউরিটি কুঠুরিতেও বসে আছেন। লাল ফ্ল্যাগ, নীল ফ্ল্যাগ, হলদে ফ্ল্যাগ, যে-ফ্ল্যাগই তুলুন, তিনি থাকবেনই। তিনি যে বলে গেছেন, জগদম্বার ইচ্ছায়, মালিকের ইচ্ছায়, নানা ধর্ম, নানা মত হয়েছে। যার পেটে যা সয়, সে তাই খাবে। দেখুন, এই সর্বগ্রাসী রামকৃষ্ণকে। সমন্বয় যে সর্বগ্রাসী মূর্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—অমর আনন্দের পথ

স্বামী স্মরণানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে শ্রীম—শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব উক্তি চয়ন করেছেন, পাঠকদের মনে তার প্রভাব সর্বদাই প্রগাঢ়। বইটি প্রথম পড়লেই পাঠকের কাছে অপূর্ব উন্মোচন বলে মনে হয়।

তেত্রিশ বছর আগে, স্বয়ং শ্রীম কর্তৃক অনূদিত 'দি গস্পেল অব রামকৃষ্ণ' প্রথম খণ্ড বইটি (মাদ্রাজ-মঠ থেকে প্রকাশিত) আমার হাতে এসে পড়েছিল। আমি সেটি পড়ে ফেলি। অবিলম্বে একটা শিহরণ বোধ করেছিলাম। তার চৈতন্য-স্পন্দন আমার বিশ্বাসকে করেছিল গভীর, এবং যেসব প্রত্যয় তারই মধ্যে বোধ করেছিলাম তাদের উপরে এঁকে দিয়েছিল নিশ্চয়তার মুদ্রণ। এর কয়েকমাস পরে আমি স্বামী নিখিলানন্দ-কৃত কথামৃতের পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ দেখলাম। স্বভাবতঃই সেটি সংগ্রহ করলাম, আর পড়তে লাগলাম প্রায় প্রতিদিন পরমানন্দে।

সেই অভিজ্ঞতার পরে ঠাকুরের কথা মূলে পড়বার আগ্রহ জন্মেছিল—কিন্তু প্রতিবন্ধক দাঁড়াল বাংলা জ্ঞানের অভাব।

সে বাধাও যেন অজ্ঞাতে, বলা যায় অপ্রত্যাশিতভাবে, দূর হয়ে গেল। ১৯৫৩ সালে মহারাষ্ট্রের আমেদনগরে যখন খরাত্রাণের কাজ করছি তখন অবসর সময়ে ত্রাণশিবিরের এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে আমি বাংলা বর্ণপরিচয়, সেই সঙ্গে কিছুটা বাংলা ভাষাশিক্ষা করতে পেরেছিলাম। বস্তুতঃপক্ষে তা আমার পরবর্তী গোটা জীবনে অমূল্য আশীর্বাদ, কেননা তা কথামৃতের মূল রূপ আমার কাছে খুলে ধরেছিল। তারপর থেকে শ্রীম-সংকলিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মহান উক্তিসমূহ আমার জীবনে প্রেরণার নিত্যউৎসের রূপ ধরেছে।

কথামৃতের কোন্ বস্তু পাঠকের মনকে এমনভাবে কেড়ে নেয় ? আমার বিবেচনায়—মাস্টার মহাশয় যেভাবে ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবন চিত্রিত করেছেন তাই

হল আকর্ষণের বস্তু। এ যেন বাক্যে চলচ্চিত্র। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তের কাছে কথামৃত অতীব ধ্যান-সহায়ক।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মপথগামীদের জীবনে পর্যন্ত একটি জিনিসের অভাব অনেক সময়ে লক্ষ্য করা যায়—**নিশ্চয়তাবোধ**। তার অভাব, বিশ্বাসকে কুণ্ঠিত এবং সাধনাকে মন্থর করে তোলে। কথামৃত দেয় নিশ্চয়তাবোধ, বিশ্বাসকে করে দৃঢ়মূল। কথামৃতের পৃষ্ঠাগুলিতে প্রমাণিত হয়ে আছে—ঈশ্বরলাভ, কামকাঞ্চন ত্যাগ—এসব দূর কল্পনার বিষয় নয়—কিছু-কম শত বৎসর পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ সজীবভাবে বিদ্যমান ছিলেন যাঁর জীবনে তা বাস্তবায়িত সত্য ছিল।

তৃতীয়তঃ কথামৃত রসে আনন্দে মাতোয়ারা। সেখানে পাই—শ্রীশ্রীঠাকুরের দীপ্ত রসময় উক্তি, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দতরঙ্গ, উপস্থিত কিছু মানুষের জীবনজ্বালার রূপ, ঠাকুরের স্নিগ্ধ করুণার স্পর্শে সেই যন্ত্রণার উপশম। এই সকলই পাঠকের কৌতূহলকে উজ্জীবিত রাখে—কেবল প্রথম পাঠকালে নয়, পরবর্তী পুনঃ পুনঃ পাঠের সময়েও।

পরিশেষে যদি বলি, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বিংশ শতাব্দীর সর্বোত্তম ধর্মগ্রন্থ, তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, অতিরঞ্জনের দোষে অভিযুক্ত হব না।

আমাদের পৃথিবী আজ রসহীন, তৃষাদীর্ণ, শুষ্কপ্রাণ। এই পৃথিবীতে কথামৃত যেন উত্তরোত্তর মানবপ্রাণকে প্রেরণা ও পথনির্দেশ দান করে—যেন আনে সান্ত্বনা ও ত্রাণবাণী—এই আমাদের প্রার্থনা।

মহেন্দ্রনাথের সাধনার দুই নিত্যপুষ্প

স্বামী প্রভানন্দ

"লালফুলের গাছে লালফুলই হয়, সাদাফুল কখনও হয় না, কারণ ঈশ্বর নিয়ম করে দিয়েছেন। কই লালফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি করুন দেখি?" তেজী কণ্ঠে বলে ওঠেন জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাস।

তাঁর মন্ত্রগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার বরপুত্র, তিনি মৃদু প্রতিবাদ করে বলেন, "তিনি ইচ্ছা করলে তাও করতে পারেন।"

মথুরানাথ মানতে রাজি নন, তিনি প্রমাণ চান। বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয় না। পরদিনই শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলা যাবার পথে দেখেন, একটি লাল জবাফুলের গাছে একটি বৃন্তে দুটি ফুল ফুটে রয়েছে, একটি লাল একটি সাদা। অবিশ্বাস্য হলেও এর সত্যতা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ডালশুদ্ধ ফুল ভেঙ্গে এনে মথুরানাথকে দেখান। মথুরানাথ হার স্বীকার করেন।

প্রায় এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের আন্তর জগতে। তিনি তাঁর রামকৃষ্ণ-সাধনায় তনু-প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছিলেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছিল তাঁর এই সাধনা। তিনি তাঁর সাধন-কাননে সযত্নে রোপণ করেছিলেন রামকৃষ্ণবীজ। কালক্রমে অঙ্কুর-পাতা-ডাল-পালা-মঞ্জরী বিস্তার করে বেড়ে উঠেছিল সেই বৃক্ষ। মালী মহেন্দ্রনাথ সাগ্রহে ফুলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। শেষকালে ফুল ফুটতে শুরু হয়। আশ্চর্যের বিষয়, একই বৃন্তে ফুটে ওঠে সাদা রামকৃষ্ণ-পুষ্প ও লাল সারদা-পুষ্প। একই সাধনার রসে পরিপুষ্ট হয়ে একই সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে বিকশিত হয় দুই পুষ্প ভিন্ন বর্ণের। যেমন তাদের রূপ-মাধুর্য তেমনি সৌগন্ধ্য-বৈচিত্র্য। অপূর্ব এই ফুলের ফসল নিয়ে রামকৃষ্ণবৃক্ষ ঝলমল করতে থাকে। নিবিড় তৃপ্তিতে সাধকের প্রাণ ভরে ওঠে।

মহেন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ ধর্মীয় পুরুষ, অধ্যাত্মচর্চা তাঁর জীবনের প্রধান পাথেয়। ঈশ্বরকে নিজস্ব বোধে বোধ করাই তাঁর পরম পুরুষার্থ। এবং তাঁর 'কথামৃত-দুরূহব্রত-সাধন' তাঁর মৌল সাধনজীবনের উপজাত মাত্র। তাঁর সেই ব্রত-সাধনের সোনার ফসল পাঁচখণ্ডের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণকে—তাঁর স্বরূপকে আপন চৈতন্যের গভীরে উপলব্ধি করার আয়াস-প্রয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাত একটি ফসল। অন্ততঃ মহেন্দ্রনাথ এরূপই বিশ্বাস করতেন।

মহেন্দ্রনাথের রামকৃষ্ণ-সাধনা দুরূহ অথচ বিচিত্র সুন্দর। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সজ্ঞান সাক্ষাতের প্রায় বাইশ বছর পূর্বেই বালক মহেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত এক আনন্দকুয়াসা। একবার সঙ্গীছাড়া হয়ে বালক মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও আশ্রয়লাভ করেছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সচেতনভাবে প্রথম দেখেছিলেন ফেব্রুয়ারি ১৮৮২র এক রবিবারে। দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিনই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "তোমার কপাল, চোখ, দেখে বোধ হচ্ছে যেন একটি যোগী তপস্যা করতে-করতে উঠে এল।" মহেন্দ্রনাথও তাঁকে 'সংসারার্ণবঘোরে কর্ণধারস্বরূপকঃ'—গুরুরূপে বরণ করলেন। এখন থেকে মহেন্দ্রনাথের শয়নে-স্বপনে-জাগরণে রামকৃষ্ণ-চিন্তার উৎপ্লব। প্রতিদিন গুরুসঙ্গলাভ সম্ভব হয়ে ওঠে না। অভাবপূরণের জন্য তিনি গুরুর বাণী, আচরণ ও তাঁর পরিমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ডায়েরীতে লিখতে আরম্ভ করেন। অবসরসময়ে সেই ডায়েরী সামনে রেখে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় স্মরণ মনন করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের অলৌকিক উজ্জ্বল উষ্ণতা অনুভব করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সযত্ন শিক্ষা-দীক্ষার বাতাবরণে মহেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মপদ্ম বিকশিত হতে থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-ভাবনায় ডাইল্যুট হতে থাকেন। মহেন্দ্রনাথের মননালোকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য-নূতন ভাবৈশ্বর্যে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন।

মহেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনা ক্রমে গভীরতর হয়, ব্যাপকতর হয়। অনেক ঘটনার মধ্যে একটি : একদিন মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উপদেশের আবৃত্তি করে বলেন, "অবতার যেন সংসার-প্রাচীরের মধ্যে একটা বড় ফাঁক, যার ভিতর দিয়ে অনন্ত ঈশ্বরকে দেখা যায়।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে মহেন্দ্রনাথ বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই এ ফোকর। তাঁর মধ্য দিয়ে দেখলেই ঈশ্বরের অনন্তত্বের খানিকটা আঁচ করা যায়। শুধু তাই নয়, তাঁর বোধ হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-অবয়ব ঈশ্বরের বিশেষ বিলাস-স্থান। সর্বভাবগ্রাসী রামকৃষ্ণ-সাধনায় ব্যাপৃত মহেন্দ্রনাথের চেতনা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবৈশ্বর্যে আলোকিত হয়েছিল, তাঁর হৃদয়-কলসী রামকৃষ্ণ-ভাবামৃতে ভরে উঠেছিল, তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের শিকড় সত্তার গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে তৈরী করতে থাকেন যাতে মহেন্দ্রনাথ তাঁর শুদ্ধ ভাবধারাকে সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতভাবে ধারণ ও সংরক্ষণ করতে পারেন, অবিকৃতভাবে প্রচার করতে পারেন। অভিমানশূন্য মহেন্দ্রনাথ যোগ্য বাণীবহরূপে গড়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা ও তাঁর ভবিষ্যৎকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার পূর্বেই তাঁর জীবনাকাশ থেকে রামকৃষ্ণসূর্য অস্তমিত হয়ে গেলেন। মহেন্দ্রনাথ হাহাকার করে উঠলেন। অকস্মাৎ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দেন, শোকবিহ্বল মহেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : শক্তি কর। কি কাঁদাকাটি করছ! আবার রবিবার ১৫মে ১৮৮৭ দুপুরবেলা ঘুমন্ত মহেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বল মোহন সমাধিস্থ মূর্তি। গায়ে হাত দিয়ে দেখেন, বাহ্যসংজ্ঞা নেই। এই আবহে মহেন্দ্রনাথের অকস্মাৎ বোধ হয়, বিশ্বচরাচর মায়াময়; তিনি নির্গুণ চৈতন্যকে তাঁর সত্তার গভীরে নিজস্ব বোধে বোধ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গের পর মহেন্দ্রনাথ আঁকড়ে ধরেন তাঁর চরণদুখানি। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্য-দশায় তাঁকে কৈবল্যদায়িনীর মন্ত্রদান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে চুম্বন করতে অগ্রসর হন, বলেন, "ভগবান ওকে সংসারে রেখেছেন, ওর কি দোষ?" ভাগ্যবান মহেন্দ্র-নাথের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ মুখামৃত দেন। এভাবে মহেন্দ্রনাথ ধ্যানের আলোকে, স্বপ্নের আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যলাভ করে ধন্য হন, তাঁর সাধনতরী এগিয়ে চলে পরম প্রাপ্তির উপকূলে।

তা সত্ত্বেও, রামকৃষ্ণ-সূর্যের অস্তাগমে মহেন্দ্রনাথের জীবনাকাশে নেমে এসেছিল যে হতাশার অন্ধকার, প্রাগুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধিও সেই হতাশার ধোঁয়াসা বেশীক্ষণের জন্য দূর করতে সক্ষম হয় নি। তিনি ধোঁয়াসার মধ্য দিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলেন। এমন সময়ে তাঁর জীবনাকাশে উদিত হলেন সারদা-চন্দ্র। তাঁর স্নিগ্ধ শীতল মধুর আলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় তাঁর সমগ্র জীবনপ্রাঙ্গণ। তাঁর যাত্রাপথ সুগম হয়, রামকৃষ্ণ-সাধনা কতকটা সহজতর হয়ে আসে।

মহেন্দ্রনাথের জীবনে সারদা-চন্দ্র রামকৃষ্ণ-সূর্যেরই সম্প্রসারিত রূপ। তাঁর সর্ব-সমর্পিত রামকৃষ্ণ-সাধনরসে পরিস্ফুট হয়েই ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল সারদা-

পুষ্প। তৎসত্ত্বেও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মহেন্দ্র-আকাশে সারদা-চন্দ্র অনেকসময়েই স্বমহিমায় বিরাজমান। একবার মাত্র দেখতে পেয়েছি, মহেন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে লিখেছেন, "প্রভুমাতার নামগুণগান করব।" নতুবা অন্যত্র শ্রীশ্রীমা স্বমহিমায় মহেন্দ্রনাথের জীবনাঙ্গন আলোকিত করেছেন, হেমন্তের শিশিরকণার মতো প্রাণদ স্নিগ্ধতা ও পুষ্টি বিতরণ করেছেন তাঁর সত্তার মর্মমূলে, সাহিত্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন মহেন্দ্রনাথকে। মাতৃগতপ্রাণ মহেন্দ্রনাথ বাল্যে গর্ভধারিণী-মাকে হারিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনিই সারদাদেবীর রূপ ধারণ করে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন তাঁর জীবনে। মহেন্দ্রনাথ তাঁকে আপনার মা জ্ঞানে সেবাযত্ন করতেন। স্ত্রী নিকুঞ্জদেবীর মুখে শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্বজনীন স্নেহ-দয়া-ভালবাসা-আকূতির খবরাখবর শুনেই বোধ করি মহেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে দিনলিপির শিরোনামায় 'শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমাচরণভরসা' লিখতে শুরু করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর মহেন্দ্রনাথ একান্তভাবে আশ্রয় করেছিলেন শ্রীশ্রীমাকেই। সংসার-সংগ্রামে শ্রান্ত মহেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমাকে ২৯ মে ১৮৮৯ তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "মা, শরণাগত করো। সব শক্তি তো তোমারই।" আবার তিন দিন পরেই আরেকটি চিঠিতে লিখেছেন, "মা, তুমিই বিপদনাশিনী, তুমি রক্ষা করো।" প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীমাও অভয় দিয়ে তাঁকে লেখেন, "সংসার জ্বলন্ত আগুন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা হলে কি-না হতে পারে?"

নিকুঞ্জদেবী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট থেকে মন্ত্রদীক্ষালাভ করেন ২০ অক্টোবর ১৮৮৮। অতঃপর শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে একটি ভাবদর্শনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত পেয়ে মহেন্দ্রনাথকেও মহামন্ত্রদান করেন। মহেন্দ্রনাথের চেতনায় শ্রীশ্রীমা সদ্‌গুরু, শ্রীরামকৃষ্ণের সম্প্রসারিত জাগ্রত সত্তা, সর্বকল্যাণবিধাত্রী জগজ্জননী, সর্বোপরি শ্রীশ্রীমা একান্তভাবেই তাঁর আপন জননী। পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা। মহেন্দ্রনাথ স্বপ্নে দেখছেন, শ্রীশ্রীমা তাঁকে নিজহাতে খাইয়ে দিচ্ছেন। আবার একদিন স্বপ্নে শ্রীশ্রীমায়ের প্রসন্ন-মূর্তিখানি দর্শন করে তিনি নিবেদন করেন, "মা, তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাক।"

মহেন্দ্রনাথের চেতনায়, মগ্নচৈতন্যে ও জাগ্রত অনুভবে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকেন শ্রীশ্রীমা। স্থূল শরীরে স্বপ্নকায়া আশ্রয় করে তিনি মহেন্দ্রনাথকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। আবার তেমনিভাবে তাঁর মহাপ্রয়াণোত্তর কালেও শ্রীশ্রীমা মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে-সঙ্গে থাকেন, আশা-ভরসা দেন, বুদ্ধি জোগান, চৈতন্যের গভীরে আলোক-সান্নিধ্য ঘটান। শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পরের বছর দেবীপক্ষের পঞ্চমীতে মহেন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন, "সেদিন স্বপ্ন দেখিলাম, মা বলিতেছেন, তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখিয়াছিলে, সে-দেহ মায়িক, এই দেখ আমি সেইরূপই

রহিয়াছি।" এই দর্শনের পর মহেন্দ্রনাথ তাঁর দুঃসহ শোক সামলে নেন, আশ্বস্ত বোধ করেন।

মহেন্দ্রনাথের কথামৃত-সাধনার চত্বরও দেখি সারদা-চন্দ্রের অপার আলোকে বিভাসিত। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসম্বরণের দু'বছরের মধ্যেই মহেন্দ্রনাথ তাঁর ডায়েরীতে সংরক্ষিত উপাদান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপি নিয়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিনটি ছিল রথযাত্রা, ১১ জুলাই ১৮৮৮। শ্রীশ্রীমা পাণ্ডুলিপির পাঠ শুনে মহেন্দ্রনাথের এই সারস্বত প্রয়াসের প্রশংসা করেন। মহেন্দ্রনাথ আবার তাঁর পাণ্ডুলিপির আরেকটি অংশ শ্রীশ্রীমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন ১৫ মার্চ, ১৮৯০। শ্রীশ্রীমা সে-সময়ে মহেন্দ্রনাথের ২, হেম কর লেনের ভাড়া-বাড়ীতে বাস করছিলেন। এভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সমর্থন, অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদে পরিপুষ্ট হয়ে মহেন্দ্রনাথ "পরমহংসদেবের উক্তি" শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রকাশ করলেন। প্রশংসার গুঞ্জন উঠল। তবুও মহেন্দ্রনাথের সঙ্কোচ কাটে না, তিনি আর অগ্রসর হতে সাহস করেন না। ২৬ নভেম্বর ১৮৯৫ তারিখে শ্রীশ্রীমা মহেন্দ্রনাথকে লিখলেন, "যে বিষয়গুলি অর্থাৎ ঠাকুরের যে কথাগুলি বলিবার জন্য বাছিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া বাছিয়া রাখিবেন।" অনুমান করি, মহেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ নিষ্ঠাভরে পালনও করেছিলেন, কিন্তু তার ফলাফল দেখা গেল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি আকারে। মহেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে গস্‌পেলের ছোট-ছোট কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। প্রশংসার কলরব, সেইসঙ্গে নিন্দার গুঞ্জরণও শোনা গেল। বিভিন্ন মহল থেকে অনুরোধ এল, ঐ বস্তু বাংলাতেও পরিবেশনের জন্য। মহেন্দ্রনাথ পুনরায় শ্রীশ্রীমায়ের শরণাগত হলেন, তাঁকে নিজের সকল দ্বিধা-কুণ্ঠা নিবেদন করলেন। জয়রামবাটী থেকে শ্রীশ্রীমা ৪ জুলাই, ১৮৯৭ তারিখে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়ে লিখলেন, "এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। এ সকল ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে।" শ্রীশ্রীমায়ের এই অমোঘ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে মহেন্দ্রনাথ "শ্রীশ্রীকথামৃত-প্রণয়ন-দুরূহ-ব্রত" উদ্‌যাপন করতে আরম্ভ করলেন। এই ব্রতের ফল কথামৃত তিনি রামকৃষ্ণ মিশন এসোসিয়েশনের সাপ্তাহিক সভায় পাঠ করে শোনান। উদ্বোধন, তত্ত্বমঞ্জরী, হিন্দুপত্রিকা, বামাবোধিনী প্রভৃতি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে কথামৃত প্রকাশ করতে থাকেন। ভক্তদের অনেকেই প্রশংসার ফুলঝুরি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন, আবার কেউ-কেউ বিরূপ সমালোচনাও করলেন। মহেন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন বিমর্ষ হয়ে পড়ে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপ্নযোগে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। সেদিন শনিবার, ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৭। অনেকদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন। মহেন্দ্রনাথ ভাববিহ্বল হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে দণ্ডের মতো আপতিত হন, প্রণাম করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে একটু চোট্ লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আসনে বসে বলেন, "তোমরা আমার।" তিনি একটু জলযোগও করেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি মহেন্দ্রনাথকে বলেন, "অদ্বৈতের উচ্চভাব সকলের জন্য নয়। তুমি যা বলছ ঐ ঠিক।" একথা শুনে মহেন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হন। মহেন্দ্রনাথ তাঁর অপর একটি সংশয়—কর্মযোগ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থাপিত করার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু পারেন না, হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি অদৃশ্য হয়।

এবার মহেন্দ্রনাথ কোমর-বেঁধে কথামৃত রচনার কাজে নেমে পড়েন। কিন্তু সামান্য অগ্রগতির পরেই অপ্রত্যাশিত কিছু বাধাবিপত্তি তাঁর সামনে প্রাচীরের মতো এসে দাঁড়ায়। আবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবী। ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮। রাত্রিবেলা মহেন্দ্রনাথ স্বপ্নে দেখেন শ্রীশ্রীমাকে। শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণার ভূমিকায় অবতীর্ণ। মায়ের মুখের বামপাশ দেখা যাচ্ছিল। প্রসন্ন মামার মুখের আদল। কিন্তু গায়ের রং গৌরবর্ণ। শ্রীশ্রীমা যে যা চাইছে তাকে তাই দান করছেন। কেউ-বা ওষুধ চাইছে, শ্রীশ্রীমা তাও দিচ্ছেন। পরদিন সন্ধ্যাবেলা নিতাই কথামৃত পাঠ করে শোনান। 'এ কি বিকার শঙ্করী' গানটি মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ভাবের তুফান তোলে। সেদিনই শেষরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হন তাঁর স্বপ্নমন্ডলে। প্রসন্ন উজ্জ্বল মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "তা খাটতে হচ্ছে, বেশ তো, খুব বাহাদুর।" মহেন্দ্রনাথ কেঁদে ফেলেন। বলেন, "আর পারছি না।" শ্রীরামকৃষ্ণ নিবিড় করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, সস্নেহে বলেন, "তা যদি হয়, তাহলে অন্য কথা।" কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন নিরাশার মেঘ অন্তর্হিত। নূতন দিন আগতপ্রায়। মনের আকাশে জ্বল-জ্বল করছে শুকতারা। মহেন্দ্রনাথ রোজনামচায় লিখে রাখেন: Hope! Hope! Hope!

এইবার তাঁর কথামৃত-প্রণয়ন-ব্রত দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। তের বছরের মধ্যে কথামৃতের প্রথম চারটি খন্ড ও প্রথম দুটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি প্রত্যেকটি প্রকাশনাই শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশ্য 'নৈবেদ্য' রূপে দান করেন। শ্রীশ্রীমা সে-নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। অনেক ঘটনার একটি ঃ

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ। 'কালীপূজার আগের দিন। শ্রীশ্রীমা 'বাহ্যশূন্য হয়ে' কথামৃত-পাঠ শুনছিলেন। পাশে বসে আছেন নিকুঞ্জদেবী, গোলাপ-মা প্রভৃতি। পাঠ শেষ হতেই শ্রীশ্রীমা বলে ওঠেন ঃ "আহা! কেমন করে মনে রেখেছেন! উনি কি কাগজ পেন্সিল নিয়ে ঠাকুরের কাছে যেতেন?"

নিকুঞ্জদেবী ঃ "না মা, সব মনে করে।"

শ্রীমা ঃ "কি মাথার শক্তি, সব মনে করে!"

গোলাপ-মা ঃ "নরেনের (স্বামী বিবেকানন্দের) খুব মাথার শক্তি।"

শ্রীশ্রীমা ঃ "সে আরেক রকম, লেকচার-দেওয়া ইত্যাদি। এ আরেক রকম।··· বৌমা, দুধ বেশী করে খাইও। আরও শক্তি হোক্। আহা! উনি জগতের উপকার

করছেন। বৌমা, আমি রোজ এই বই শুনি।...”

শেষকালে শ্রীশ্রীমা নিকুঞ্জদেবীকে লক্ষ্য করে বলেন; “বৌমা, বোলো আমি হাড়ভাঙ্গা আশীর্বাদ করছি।”

কথামৃত রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে কথামৃতপাঠের ফলশ্রুতি প্রার্থনা করে শ্রীম শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিবেদন করলেন, “মা, আপনি কৃপা করিয়া আশীর্বাদ করুন যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া লোকের শান্তি, আনন্দ ও অন্তে ঈশ্বরলাভ হয়।”

এভাবে দেখা যায়, ‘কথামৃত-দুরূহ-ব্রত-উদ্‌যাপন’ কালে শ্রীশ্রীমায়ের অনুজ্ঞা, অনুপ্রেরণা, কল্যাণেচ্ছা কথামৃতকারের নিজ্ঞান স্তরে, সজ্ঞান স্তরে ও অধিজ্ঞান স্তরে অনির্বাণ প্রভাব বিস্তার করেছে। অপরপক্ষে কথামৃতের প্রকৃত সমঝদার শ্রীশ্রীমায়ের মন্তব্য—“মাস্টারের বইও বেশ, যেন ঠাকুরের কথাগুলি বসিয়ে দিয়েছে; কি মিষ্টি কথা!”—কথামৃতকারকে এগিয়ে যেতে চির-উৎসাহ জুগিয়েছে।

কথামৃত-সাধন-চত্বর আলো করে শোভা পাচ্ছিল রামকৃষ্ণ-পুষ্প ও সারদা-পুষ্পের বৃক্ষ। এক বৃন্তে দুটি করে ফুল। কথামৃতকার আবার স্বপ্ন দেখেন। বেশ তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন। সেদিন ছিল ১৩ অক্টোবর ১৮৮৯। দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানায় শুয়ে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। দেখছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা একটি বড় কড়ায় দুধ জ্বাল দিচ্ছেন, সুগন্ধে চারিদিক পরিপূর্ণ। মহেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ অনুভূতি হয়—শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা যুগ্মভাবে প্রেমামৃত তৈরী করছেন। এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর উপর দায়িত্ব পড়েছে সেই প্রেমামৃত সকলকে বিতরণ করার।

নিষ্ঠাবান শিল্পী মহেন্দ্রনাথ তাঁর সাধনার ফসল রামকৃষ্ণ-পুষ্প ও সারদা-পুষ্প দিয়ে মালা গেঁথেছিলেন। বিচিত্র সুন্দর সব মালা। সে-সকল মালার সুতো তাঁর শিল্পপ্রতিভা। মালার পর মালা গেঁথে নৈবেদ্য সাজিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ। সে-সকল নৈবেদ্য শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে নিবেদন করেছিলেন। গড়ে উঠেছিল পাঁচখানি নৈবেদ্য, পাঁচখণ্ডের কথামৃত। পঞ্চম খণ্ডের নৈবেদ্যখানি আনুষ্ঠানিকভাবে নিবেদন করবার পূর্বেই অশীতিপ্রায় মহেন্দ্রনাথ পরিশ্রান্ত শিশুর মতো মায়ের কোলে ঢলে পড়েন।

মহেন্দ্রনাথ চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর গাঁথা মালাখানি আজও শুকোয়নি। তারা কালজয়ী, তারা মানুষের চিরসাথী। অপার তাদের রূপমাধুর্য, ও সুগন্ধের বৈচিত্র্য ছড়িয়ে পড়ছে দিক থেকে দিগন্তরে; দেশদেশান্তরের মানুষের মনে তার অপরূপ স্বর্ণচ্ছটা, লীলালাবণ্যের অন্তহীন সংযোগ।

কথামৃত ও কথামৃতকার : একটি জীবনের আলোকে

স্বামী অব্জজানন্দ

"…আশা নাই, উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই, সুখ নাই। কেবল বুদ্ধিটি আছে দেহের মধ্যে আর কিছুই যেন নাই। হে জগৎস্বামী, আমি তোমাকে কর্তা বলিয়া মানি। কিন্তু দয়াল বলিয়া জানিনা। কিন্তু আজ মনে হইতেছে, বুঝি দয়া করিয়া আমার 'বুদ্ধি'টাকে দগ্ধ করো নাই।…"

সংসার-তাপদগ্ধ জনৈক শিক্ষিত মেধাবী যুবক ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সেই সময়কার দিনলিপির একটি পৃষ্ঠায় উপরের কথাগুলি নিজ হস্তাক্ষরে লেখা রয়েছে। আগের পৃষ্ঠাগুলি সে নিজেই ছিঁড়ে নষ্ট করেছে, নয়তো ঐ দগ্ধ জীবনের তাপ-স্পর্শ আমরা আরও খানিকটা পেতে পারতাম। এই যুবককে নিয়েই আমাদের আজকের রচনা।

আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগের কথা। বাংলা ১৩১৬ সাল। উদ্‌ভ্রান্ত ঐ যুবক সংসারের অসহ পরিবেশে বড়ই হাঁপিয়ে উঠেছিল, যেন সেখানে তার পক্ষে বাঁচাই অসম্ভব তখন। বুঝি নিদারুণ কোনো যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি তার শরীর-মনকে এমনভাবে আক্রমণ করছিল, যা' অচিরেই উপযুক্ত বৈদ্যের হস্তক্ষেপ না হলে, কি কাণ্ড তখন ঘটাতে পারত তা ভাবাই যায় না। সংসারকে পাতকুয়া আর আত্মীয়দের কালসাপ বোধ—বুঝি এই অবস্থাকেই বলে। সংসারের অসারতা এবং সংসারের অতীত কোনো সারবস্তুর প্রতি তীব্র টান তখন তার মানসিক অবস্থাকে যেখানে এনে দিয়েছিল, তাতে ঘর তো অনেক পরের হিসাব, শরীররক্ষাই ঘোর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হয়েও ছিল প্রায় তাই! ঐ সার-সত্যকে প্রত্যক্ষ না পেলে, ছার শরীরেরই বা কি প্রয়োজন—এহেন বুদ্ধিও ইতিমধ্যে এক গভীর রাত্রে, তাকে শরীর-বন্ধন ছিন্ন করতে প্রবলভাবে উদ্যত করেছিল। অবশ্য তাতে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে জগন্মাতার অলৌকিকী কৃপাই তার মস্তকে আরও বেশী করে বর্ষিত হয়েছিল। ঐ ভীষণ ঘটনাটির ঠিক পরের প্রভাতেই অন্তরঙ্গ এক কিশোর সহচরকে দেখেই সে সাহ্লাদে বলে উঠেছিল—"কাল রাত্রে এ অশান্তির জীবন শেষ করে দেবার উদ্দেশ্যে ঐ ফাঁসির দড়ি রেখেছিলাম। কিন্তু রাত্রে হৃদয় শান্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়. মার কৃপায়;—আর মার এই চমৎকার গানটি অন্তর থেকে ঝরতে শুরু করে! শুনবে নাকি সেই গান? 'শত কোটি শশী হাসে, মায়ের চরণ-নখরে,/আলো করে কালোরূপ হৃদয় মাঝারে'॥"

যা' হোক, এই সংসারবিধ্বস্ত ভগবদ্‌ব্যাকুল প্রাণকে একটি সুনির্দিষ্ট পথে

চালিত করার মতো কারও সাহায্য তখন নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ঐ কঠিন ভবরোগ নিরাময়ের উপযোগী ভেষজ-বটিকা কার কাছে মিলবে তখন? ঠিক ঐ কালেই প্রতিবেশী কারও ঘরে একখানি অদ্ভুত পুস্তকের উপর চোখ পড়াতে যুবক তার অনুসন্ধেয় বৈদ্যের ঠিকানা কিন্তু সহজেই পেয়ে গিয়েছিল। বইখানা ছিল—শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। বইর প্রথম ভাগ পড়েই মেতে উঠেছিল যুবক—ক্রমে দ্বিতীয় ভাগটিও নিজে সংগ্রহ করে ফেলে। অবশ্য বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সে গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিল শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত পাঠে ও মননে। কিন্তু তবুও প্রাণ তার তৃপ্ত হচ্ছিল না—আরও নিবিড় অন্তরতর কিছুর জন্য ছট্‌ফট্‌ করছিল। আবার এ-কথাও কিন্তু অনস্বীকার্য যে, ঐ চৈতন্য-চরিতামৃতই তার ব্যাকুল তৃষ্ণাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলছিল। অর্থাৎ পিপাসা-বৃদ্ধিকর ওষুধের জন্য সর্বপ্রথম দায়ী ছিলেন—ঐ কবিরাজ গোস্বামীই। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থরাজিও সেই সময়ে তার দিবস-রজনীর সঙ্গী।

যুবকের অনুগত তদানীন্তন সহচরদের মধ্যে বিশিষ্ট একজনকে আমরা খুব ভালই জানি। সেই তাপের অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ প্রত্যক্ষদর্শীর একখানি চিঠির ভাষা এই রকম: "কত পূর্ণিমার বিনিদ্র রজনীতে উন্মুক্ত প্রান্তরে, কিংবা দীঘির নির্জন ঘাটে বসিয়া সেইসকল ভক্তি-সঙ্গীত প্রাণভরে গাহিতেন—রবিঠাকুর, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবিদের বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ গীতসকল। পরে তাঁহার মুখে রবিঠাকুরের 'দিবস-রজনী আমি যেন কার আশায় থাকি' এই গানটি শুনিয়া পূজ্যপাদ শ্রীম ভাব-বিহ্বল হইয়াছিলেন শুনিয়াছি। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে গভীর-গম্ভীর নিশাশেষে যে-সকল মধুর পদ আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন হৃদয়ে শিহরণ আনিত তাহার দু'একটির স্মৃতি মনে জাগিতেছে—'গভীর গগনে গাহরে পাপিয়া তুলিয়া মধুর তান রে!/ আমি কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়েছি ভুলিয়ে গাহিতে মধুর গান রে॥' 'পরের পরাণ তোরে কেমনে রাখি'?"

বৈদ্যের ঠিকানা—তাঁর পেটেণ্ট্‌ বটিকার আভাস পেয়েও তো আর স্থির থাকা চলেনা। দুর্নিবার কোন্‌ আকর্ষণ কেবল তাকে ঘরের বাইরে টানতে থাকল। তখন তার আইনপড়া চলছিল। তাই গর্ভধারিণী জননীকে এবং বাড়ীর আর-আর সকলকে বুঝানো বেশ সহজ হল—কলকাতায় যাওয়া একান্তই প্রয়োজন—ওকালতি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। ঐ ছলে পাথেয় বাবদ অল্প-কিছু টাকাও বাড়ী থেকে পাওয়া গেল। কিন্তু আসলে ও-সব ছিল বৈদ্য-অন্বেষণে পলায়নের কৌশলমাত্র। "চৈত্র মাসের তীক্ষ্ণ-রৌদ্র ঝাঁ-ঝা করিতেছে।" যাত্রা হল শুরু।

যাত্রীর দিনলিপিতে পড়েছি—: "'ঝড়ের এঁটো পাতা' হইয়া চলিয়াছি। জীবনের কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনবোধ নাই বলিলেও চলে। বসন্তকাল প্রভৃতি বড়ই মনোহরা। রাত্রে নারায়ণগঞ্জে পেঁাছিলাম।...স্টেশনে আসিয়া জাহাজের খবর লইতে গিয়া জানিলাম, গোয়ালন্দের জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে। শিহরিয়া উঠিয়া ভগবানকে

স্মরণ করিতে লাগিলাম। এই গভীর রাত্রি—স্টেশনেই বসিয়া কাটাইতে হইবে জাহাজের আশায়।...ইতিমধ্যে কে একজন আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, অন্য একখানা জাহাজ তৈয়ার আছে—কাল সকালেই ছাড়িবে। যেন অকুলে কূল পাইয়া বড় সুখী হইলাম।"

পরের দিন ভোরেই জাহাজ ছাড়ল—প্রবল উচ্ছ্বাসময়ী মেঘনা সেদিন যেন আরও ফুলে-ফুলে উঠতে থাকে। দু' দুবার ঝড়ের মুখে পড়ায় জাহাজ দু' বারেই বিপজ্জনকভাবে কাত্ হয়ে গিয়েছিল। ঐ তারিখের দিনলিপিতে যুবক লিখেছেঃ "এই ঝটিকার শন্-শন্ ও নদীর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাজির মধ্যে জাহাজখানি হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।...একবার ঝটিকাবেগে জাহাজের অগ্রভাগ একটা চরে উঠিয়া গিয়াছিল।" ঝড় তো কেবল বাইরে নদীবক্ষেই চলছিল না—ঝড় বইছিল ঐ পলাতক তরুণের বুকের মাঝেও। তার জীবন-তরণীখানিও বুঝি সেই ঝঞ্ঝার বেগে তীব্র গতিতে ধাবমান ছিল অনির্দেশ্য কোন্ তীরের অভিমুখে—যেখানে একটিবার পেঁছাতে পারলেই প্রত্যাশিত শান্তি নিশ্চিত মিলবে! বাইরের দুর্যোগ ঐ অন্তরের ঝটিকা-প্রবাহেরই প্রতীক যেন।

জাহাজ গোয়ালন্দে এসে থামল—এবার রেলগাড়ীর পালা কলকাতা পর্যন্ত। যাত্রার গতি তাই স্বাভাবিক কারণেই উত্তরোত্তর ক্ষিপ্রতর এখন। হবেই তো!

কলকাতার বিপুল জন-সমুদ্রে এসে যুবক নামল। তারিখ ২০শে চৈত্র, বাংলা ১৩১৬ সাল। পরিচিত এক বন্ধুর ঠিকানা জানা ছিল। তারই কাছে হাতের ছোট্ট পুঁটলিটি রেখে, স্নানাহার সংক্ষেপে সেরে নিয়েই আবার উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়—সেই ঈপ্সিত বৈদ্যের খোঁজে! রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর সংগৃহীত ছিল ঠিকই—কিন্তু কলকাতার পথ-ঘাট তো আর পরিচিত নয় মোটেই! তাই নানা জনকে জিজ্ঞাসা করতে-করতে, এর দুয়ারে তার দুয়ারে কড়া-নাড়তে নাড়তে, অবশেষে এক পথচারীর সহায়তায়, বৈদ্য-সন্ধানী যুবক ঠিক গিয়ে উঠেছিল ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই তিনতলা স্কুল-বাড়িটিতে। কোন্ একটি ছেলের সঙ্গে সেখানে দেখা। ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—"আচ্ছা বলতে পারো ভাই, এখানে কি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত থাকেন?" উত্তর পাওয়া গেল—"হ্যাঁ, সোজা উপরে উঠে যান—ডাক দিন। 'মাস্টার মশায়' বলে জোরে ডাকুন—বেশ জোরে ডাকুন। তিনি কপাট খুলে দেবেন।"

যথানির্দেশে সিঁড়ি ভেঙ্গে-ভেঙ্গে তিনতলায় উঠেই ডাকতে থাকে যুবক। হৃদয়ের সবটুকুই বুঝি নিঙড়ানো হচ্ছিল ঐ ডাকে। দিনলিপিতে লেখা রয়েছেঃ "সাহসভরে প্রদর্শিত বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িলাম, কিন্তু কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম দ্বিতলের কপাট বন্ধ! কি করি!! বালকটি বলিয়াছিল, 'ডাক দিন'। 'মাস্টার মহাশয়, মাস্টার মহাশয়' বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। তিন চার ডাকের পর তিনি কপাট খুলিয়া দিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে

লইয়া তিনি উপরে গেলেন।…কিন্তু কি আশ্চর্য !! তিনি বলিলেন যে, আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি কথাটা তখন বুঝিতে পারি নাই।"

মাস্টার মশায় আগন্তুক তরুণের কুশল পরিচয়াদি অতি আদরে জিজ্ঞাসা করেন—সঙ্গে কেউ এসেছে কিনা, বাড়িতে আর কে আছেন, ইত্যাদি। যুবকের বিস্ময় আরও বাড়িয়ে তুললেন তিনি—বললেন, গত রাত্রে তাঁর দক্ষিণেশ্বরে যাবার কথা ছিল শ্রীযুক্ত রামলালদাদার বাড়ীতে। 'যাচ্ছি যাচ্ছি' করেও শেষপর্যন্ত যাওয়া হয়নি। আজ ভোরেই তাই সেখানে চলে যাওয়া স্থির ছিল—কিন্তু কেন যেন, কী উদ্দেশ্যে যাওয়া স্থগিত হয়ে গেল। স্নেহমাখা স্বরে এই কথাগুলি বলে, মাস্টার মশায় কেমন এক অপূর্ব করুণ দৃষ্টিতে যুবকের মুখের পানে তাকিয়ে থাকেন। পরে ফিক্ করে হেসে বলেন, "বোধহয় আপনি আসবেন, তাই যাওয়া হয়নি।" যুবক কিন্তু এরকম সহজ উক্তিতে ভারী অপ্রস্তুত বোধ করতে থাকে।

ঘরের বাইরে একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল। যুবক তাতেই গিয়ে বসল। ঘরের ভিতর থেকে মাস্টার মশায় সহসা ডাকেন—"একটু আসুন, এই দিকে।" নিজ হাতে এক গ্লাস দুধ যুবকের মুখের কাছে ধরে, অতি স্নেহমাখা স্বরে আদেশ করেন—"এইটুকু নিন। সেখানে অনেক দেরীতে খাওয়া হবে।" আশ্চর্য বৈদ্যের আশ্চর্য চিকিৎসাপ্রণালী। রোগীও কিছু কম আশ্চর্য নয়—বিমোহিত তো বটেই। বুঝতে বাকি থাকে না যে, মাস্টার মশায় তাকে নিয়েই দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

হ্যাঁ তাই-ই হয়েছিল। যুবকের দিনলিপিতে পাই ঃ

"তিনি স্নান করিয়া, একখানা কাপড়-গামছা লইয়া, চটি পায়ে দিয়া, চশমা চোখে লাগাইয়া 'গুরু গুরু' বলিয়া যাত্রা করিলেন। পথে আলমবাজার-মঠ, বরাহনগর-মঠ, কাশীপুর-বাগান প্রভৃতি দেখাইতে-দেখাইতে গাড়ীতে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিবাহের জন্য বাড়ীতে ও'রা কি পীড়াপীড়ি করেন ?'

"গাড়ী ছুটিতে থাকিল। দক্ষিণেশ্বরে বাগানের কাছে আসিতেই বলিলেন, 'ব্যস্, তাঁর কৃপায় আদত্ জায়গায় এসে পড়েছেন।' গাড়ী হইতে নামিয়াই মাস্টার মশায় ভূমিতেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অতঃপর তাঁহার সহিত শ্রীমন্দিরে (ঠাকুরের শয়নঘরে) আমিও প্রণাম করিলাম। আমাকে ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন। গঙ্গায় গিয়া প্রসাদ খাইয়া কালীদর্শনে গেলাম। মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'রাখাল মহারাজ এসেছেন।'…বকুলতলায় তাঁহাকে (রাখাল-মহারাজকে) প্রথম প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন, 'ভাল আছ বাবা ?' যেন কতকালের চেনা। কি মিষ্টি স্বর !! মহারাজ ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমন্দিরের সোপানে উপবেশন করিলেন। গিরিশচন্দ্রের নূতন নাটক শঙ্করাচার্যের কথা উঠিল—মহারাজ খুব প্রশংসা করিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত রামলাল-দাদাকে চিনিলাম।…শ্রীমতী গোলাপ মাতাকেও দেখিতে পাইলাম।"

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি—যুবকের পক্ষে এক নতুন জগৎ—সেখানে সবই নতুন

নতুন মানুষ, নতুন-নতুন সংবাদ, নতুন আনন্দ। যুবকের তাপিত প্রাণ, তৃষিত চিত্ত—এতদিনে যেন সাগরস্নানে তৃপ্ত। ক্রমে আরও অনেকে সেখানে জুটলেন। মাস্টার মশায়ও সাহ্লাদে যুবককে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে থাকেন—বলেন, 'ঠাকুরের ভক্ত। একজন উৎকৃষ্ট গায়ক।' ঠাকুরের ঘরের সামনে লম্বা বারান্দায় আনন্দের মেলা বসেছে! শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রথমে গাইলেন—সকলের অনুরোধে শেষকালে যুবককেও গাইতে হয়েছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার শ্রীঅক্ষয়-কুমার সেন সেই গান শুনে মন্তব্য করেছিলেন—"সিলেটের কমলালেবু খেয়ে-খেয়ে কণ্ঠ যে অমন মিষ্টি হবে, তাতে আর কী আশ্চর্য?" যুবকের বাড়ী পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টেই বটে! আর সেখানকার সুমিষ্ট লেবু 'সিলেটের কমলা' তো মিষ্টত্বের জন্য চিরকালেরই এক প্রবাদ নাম।

এইভাবেই কলকাতায় এসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীম—মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে ভবব্যাধির জ্বালায় উত্ত্যক্ত সেই যুবকটি প্রথম পরিচিত হয়েছিল। ক্রমে এই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বা মাস্টারমশায়ের অনুকম্পাতেই বেলুড়মঠের সঙ্গে তার সংযোগ হয়—সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ তাকে অচিরেই উপনীত করেছিল জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার চরণ-প্রান্তে এবং উত্তরকালে তাকে গড়ে তুলেছিল—শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের একজন অতিবিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন ভাবপ্রচারক যন্ত্ররূপে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাকাশের 'প্রেমেশ মহারাজ' নামে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটিতে তারই পূর্ণ-পরিণতি আমরা দেখেছি।

যুবকটির নাম—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য, অবিভক্ত বঙ্গের শ্রীহট্টে বা সিলেটেই তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২০ চৈত্র কলকাতায় অতিশয় নাটকীয় গতিমুখরতায় কথামৃতকার শ্রীম অথবা 'M'-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পরের পরদিন অর্থাৎ ২২শে চৈত্র থেকেই শ্রীম'র সঙ্গে নিজ জীবনের আধ্যাত্মিক সমস্যাবলী নিয়ে তাঁর নিবিড় ও একান্ত আলাপ শুরু হয়। আর সেই উদ্দেশ্যে, সেই সংসার-সন্তাপ নিরাময়ের উপায় খুঁজতেই তো এত দূরে থেকে এমনভাবে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা। উল্লিখিত দিন-লিপিতে লেখা দেখেছি ঃ

"২২শে চৈত্র। সকালে শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের নিকটে গেলাম। তাঁহার বাড়ীর দরজা বন্ধ, তাই স্কুলে আসিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। দরজা খুলিলে তাঁহার নিকটে গেলাম। তিনি একা। আমার দুরবস্থার কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলাম।"

ইন্দ্রদয়ালের অশান্ত চিত্তকে শান্ত করতে—তাঁর জীবনের জ্বালাকে জুড়াবার ব্যবস্থা করে দিতে—সুবিজ্ঞ দেব-বৈদ্যের চিকিৎসা আরম্ভ করতে মোটেই দেরী হয়নি। ঐ দিনলিপির পৃষ্ঠা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি, প্রথম আলাপের দু'একদিনের মধ্যেই মাস্টার মশায় তাঁর সঙ্গে কথামৃত নিয়ে প্রসঙ্গাদি করতেন অতি

নিবিষ্ট মনে। কথামৃতের তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাবার বিষয়ে এবং চতুর্থ ভাগের নির্মীয়মান পাণ্ডুলিপি সম্পর্কেও, ইন্দ্রদয়ালের সঙ্গে শ্রীম'র তখন থেকেই অনেক নিভৃত আলাপ হত। চতুর্থ ভাগের পাণ্ডুলিপি থেকে শ্রীম প্রায়ই পড়ে শোনাতেন—ইন্দ্রদয়ালকে পড়তে দিতেন—সম্পাদন ও প্রকাশন ব্যাপারে নানা পরামর্শও গ্রহণ করতেন। হয়ত-বা ঐ দেবকর্মে তিনি একজন যোগ্য সহায়কের জন্য অপেক্ষাও করছিলেন। ইন্দ্রদয়ালের মধ্যে তাঁর সেই ঈপ্সিত সাহায্যকারীকে খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা, তা কে বলবে? পরবর্তীকালে স্বামী সারদেশানন্দ-লিখিত (২০।৭।৬৭ ইং তারিখের) একখানি পত্রেও আমাদের এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন জানতে পেরেছি। সারদেশানন্দজী জানিয়েছেন যে, শ্রীম'র অনুরোধে কথামৃত তৃতীয় ভাগের অতিবিস্তৃত সূচীপত্র প্রেমেশ-মহারাজই প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

শুশ্রূষু ইন্দ্রদয়াল শ্রীম'র প্রেরণায় তাঁরই সমীপে বসে কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ এবং উদ্বোধন পত্রিকা নিয়মিত পড়েন কিংবা শ্রীম'কে পড়ে শোনান। ইতিমধ্যে পূজ্যপাদ শরৎ-মহারাজ, লাটু-মহারাজ প্রমুখ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের কাছেও ঘনঘন যাতায়াত ও তাঁদের সঙ্গলাভের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় নিচ্ছিলেন তিনি। বাংলা ১৩১৬ এইভাবেই শেষ হয়।

শুভ নববর্ষ। ১৩১৭-র ১ বৈশাখ। খুব ভোরেই শ্রীম নিজ হাতে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে একখানি পত্র লিখলেন। ঐ পত্রসহ ইন্দ্রদয়ালকে বেলুড়মঠে যাবার নির্দেশও সঙ্গে-সঙ্গেই দিলেন। মাস্টার মশায়ের লেখা পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে ইন্দ্রদয়াল বৎসরের প্রথম প্রভাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবরাজ্যের রাজধানী বেলুড়মঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নৌকাভাড়া নাকি খুব বেশি লেগেছিল—আট আনা!! মাস্টার মশায় যেমন বলে দিয়েছিলেন—দেবস্থানে বা সাধুদর্শনে শুধু-হাতে যেতে নেই—তাই কিছু ফল মিষ্টিও কিনে সঙ্গে নিয়েছিলেন। মঠে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ-মহারাজ, সারদানন্দ-মহারাজ ছাড়াও শ্রীমৎ শিবানন্দ-মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের আর-আর সন্তানরাও ইন্দ্রদয়ালকে পরম আদরেই গ্রহণ করেছিলেন! আশ্চর্য কাণ্ড! পূজ্যপাদ শিবানন্দ-মহারাজও সস্নেহে বলেছিলেন—"তোমার আর এসব ইনট্রোডাকশন্ কি বাপু? তুমি তো কিছু নতুন লোক নও আমাদের।" ব্রহ্মানন্দ-মহারাজও তখন বললেন—"তোমার যখন মন হবে তখনই মঠে এসো বাবা।" স্বস্তি, শান্তি ও আরাম—যার জন্য ইন্দ্রদয়াল অস্থির, অসহিষ্ণু হয়ে গৃহ থেকে পলায়ন করে এই ক'দিন ক্রমাগত ছুটছেন—মনে হল, এই এখানেই তা সবই প্রাণভরে পেয়ে গেলেন। মহারাজদের মুখে অমন স্নেহ-আহ্বান শুনে, ইন্দ্রদয়াল আপন মনে নীরব উত্তরও দিয়েছিলেন, "আমি তো তাই চাই!"

ইন্দ্রদয়ালের জীবন-তরণী যেন স্রোতের বেগে ইতস্ততঃ ছুটতে-ছুটতে এতদিনে একটি নিশ্চিন্ত তীরের সন্ধান পেল! মাস্টার মশায় তরণীখানির হাল ধরাতেই এইভাবে অল্পায়াসে সে তীরাভিমুখ হতে পেরেছিল—তাতে আর সন্দেহের ফাঁক

নেই কোথাও। তাই তো ইন্দ্রদয়ালও আজীবন এই অত্যাশ্চর্য মাস্টার মশায়কে উল্লেখ করতেন, "আমার প্রথম গুরু" বলে । স্বামী প্রেমেশানন্দ-রূপে যখন তিনি বহু-মানিত—তখনও।

আশ্চর্য শিক্ষাগুরু এই শ্রীম । ইন্দ্রদয়ালের মনোরাজ্যে তাঁর ভাবমূর্তিখানি উত্তরোত্তর বিচিত্র আলোকে নবনব রূপে উদ্ভাসিত হতে থাকে । ইন্দ্রদয়ালের ঐ সময়কার একদিনের দিনলিপিতে দেখি—তিনি আবেগের সঙ্গে লিখে রেখেছেন ঃ

"অদ্য একটি সুন্দর ঘটনা ঘটিল, যাহা আমার সমস্ত জীবনের সুখস্বপ্নরূপে পরিণত হইয়াছে । সেই দিবস মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম । যাইবার গাড়ীভাড়া তিনি দিয়াছিলেন। আমি বাসায় আসিয়া ভাবিলাম যে, আমি একজন সংসারী । ভক্তের অর্থ পরিগ্রহ করিলে পাপ হইতে পারে, বিশেষতঃ শুনিয়াছি, তীর্থদর্শন করিতে গেলে প্রতিগ্রহ করা নিষেধ। কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের নিকট এসব কথা বলার সাহস করা বড় কঠিন। সেই প্রকাণ্ড মূর্তির কাছে দাঁড়াইলে এমন সম্ভ্রমের সঞ্চার হয় যে, নিতান্ত চপলকেও প্রশান্ত হইয়া যাইতে হয়। বিশেষতঃ মাস্টার মহাশয়ের একটি গুণ এই যে, একটি কথামাত্র কহিয়া অন্যের সুবিস্তৃত বাগ্‌জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারেন। এইসব কথা জানিয়া শুনিয়াও সন্দেহাঘাতে চঞ্চল হইয়া তাঁহাকে অর্ধেক পয়সা ফিরাইয়া দিবার জন্য পকেটে করিয়া কিছু পয়সা লইয়া গেলাম এবং কি করিয়া সেইকথা উত্থাপন করিব, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

"অনেক চেষ্টা করিয়া মনের সমূহ শক্তি একত্র করিয়া সাহসভরে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'তীর্থদর্শনে আসিলে, প্রতিগ্রহ করা উচিত নহে, শুনিয়াছি'—এই কয়টি কথা বলা-মাত্রই তিনি উহার যে-উত্তর দিলেন তাহা মনে হইলেই আমি আশায় উৎফুল্ল হইয়া যাই ।

"তিনি বলিলেন যে, যখন অবতার আসেন তখন বিধিবাদীয় ক্রিয়াদির প্রয়োজন থাকে না। যে-কোনও রূপে অভীষ্ট সিদ্ধি করিলেই চলে। এবংবিধ নানা কথার পর তিনি বলিলেন, চারিটি খেতে দেয় বলে, সর্বাপেক্ষা আত্মীয় যে ভক্ত তাহাদিগের অপেক্ষা মা বাবা বেশী আত্মীয় হয়ে গেল । মা-বাপের কাছ থেকে পয়সা নিলে প্রতিগ্রহ হয় না, কিন্তু ভক্তের কাছ থেকে পয়সা নিলে প্রতিগ্রহ হয় ? এসব 'বজ্জাত-আমি'র কার্য—ইত্যাদি।

"এইরূপ ভর্ৎসনা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কীটের অধম এই পতিত পাপীকে, কামনার বজ্র-বন্ধনে বদ্ধ এই অধমকে, আপনার জন বলিয়া আদর করা—ইঁহাদের পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় না হইলেও আমার পক্ষে এই ব্যবহার আশাতীত।"

মাস্টার মশায় ইন্দ্রদয়ালের ভব-ব্যাধি উপশমের উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁর চিত্তকে ভরে দিচ্ছিলেন কত রকম আধ্যাত্মিক পুষ্টিকর পথ্য দিয়ে, সঞ্জীবনী রসায়ন সেবন

করিয়ে—ভবাময়রোধক বটিকা প্রয়োগ করে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রদয়ালও এই অনুপম বৈদ্যের কাছে তাঁর নিজ হৃদয়-উৎসারিত ভক্তি-গীতি—দর্শনী-স্বরূপ নিত্যই প্রদান করতেন—নইলে যে বিনা শুল্কে চিকিৎসা গ্রহণ হবে? গুরুদক্ষিণা না দিলে, সাধনে সিদ্ধি আসবে কেন? দর্শনী ছাড়া বৈদ্যকে দেখালে, চিকিৎসায় শ্রদ্ধা প্রকাশ পাবে কেন? আর তাতে চিকিৎসাও নিষ্ফলা হবার আশঙ্কা থাকে। ইন্দ্রদয়াল হৃদয় উদ্ধার করে শ্রীম-কে সঙ্গীত উপহার দিতেন—শ্রীম'ও তাঁর নিবেদিত গীতাঞ্জলিতে ও ভাবে আপ্লুত হতেন। ঐ যে সেই ঐতিহাসিক ও মর্মস্পর্শী স্মৃতি-জড়িত সঙ্গীত—"শত কোটি শশী হাসে—মায়ের চরণ-নখরে"—মাস্টার মহাশয় সেটি যে কতবার শুনেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। আমরা স্বামী সারদেশানন্দের পত্র (২০. ৭. ৬৭ ইং) থেকে জেনেছি: "শ্রীম এই গানখানি বারংবার তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, 'সাক্ষাৎ দেখে লিখেছে কিনা'!" শ্রীম সুমিষ্ট স্বরে অনুনয়ের ভঙ্গীতে আদেশ করতেন—"আপনি একটু গান করুন।" ইন্দ্রদয়াল বারান্দায় বসে ধীরে-ধীরে গাইলে, তিনি ঘরের ভিতরে নিজের ধ্যানের আসন থেকে একাগ্রচিত্তে শুনতে-শুনতে বলে উঠতেন, "জোরে-জোরে।" একবার "কোথায় আছ, হে নারায়ণ"—এই গান গাইবার কালে শ্রীম স্থির থাকতে না পেরে আসন ছেড়ে উঠে একেবারে ইন্দ্রদয়ালের পাশে এসে গা ঘেঁষে বসে পড়েন, এবং আবার ঐ গানখানি শোনাবার জন্য করুণস্বরে মিনতি জানাতে থাকেন। ইন্দ্রদয়াল ঐ বিশেষ তারিখের দিনলিপিতে লিখে রেখেছেন: "আজ যেন (মাস্টার মহাশয়ের) ভাবস্রোত উথলিয়া উঠিয়াছে! বলিলেন, 'আমাকে পাগল করিয়া দিন।' আমি রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্-বিরহসঙ্গীত কয়েকখানি গাহিয়াছিলাম তাঁহার ইচ্ছাক্রমে। সর্বশেষে যখন 'যাবে কিনা যাবে ব্রজে' গানটি গাহিলাম তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে শুনিতে-শুনিতে তিনি ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 'তুমি বিনে হরি শুকায়েছে বারি' আর একবার গাহিতে বলিলেন। তারপর তিনিও অনেক গান গাহিয়াছিলেন। রাত্রি গভীর হইয়াছিল।"

শ্রীম'র ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বেশ কয়েকটি দিন এইরকম ধারায় কেটে গিয়েছিল সেবার। ইন্দ্রদয়ালের ভবরোগ আরামের জন্য কতই না প্রখর দৃষ্টি রাখতেন শ্রীম—শুধু মনের দিকেই নয়, যে শরীরের মধ্যে ঐ মনের বাস, তারও প্রতি তাঁর সতর্কতার অন্ত ছিল না। নিজ হাতে জ্বাল দিয়ে গরম দুধ খাওয়ানো, স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি সংবাদ লওয়া, আহার-বিহার বিশ্রামের জন্য উতলা হওয়া ইত্যাদি শ্রীম'র আধ্যাত্মিক চিকিৎসারীতির অন্তর্গত ছিল। ইন্দ্রদয়াল এই বিস্ময়কর 'কবিরাজ' মশায়ের চিকিৎসাধীন থেকে দেহে, প্রাণে, মনে নবীন বল ও উৎসাহ বোধ করতে থাকেন। ক্রমে বাড়ী ফেরার দিনও ঘনিয়ে এল।

প্রথমবারের সেই মাত্র দিনকয়েকের সাহচর্যে যে মানসিক শক্তি, সংসারবিরাগী ভগবদ্-ব্যাকুল ইন্দ্রদয়ালকে সজীব ও সতেজ করে তুলেছিল—মাস্টার মশায়ের কাছ

থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী চলে যাবার সময়ে কিন্তু তা যেন ফের কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। চোখের জলে তৎকালীন সেই বিরহব্যথাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। দিনলিপিতে তা রক্ষিত দেখি ঃ

"অদ্য (৫ই বৈশাখ ১৩১৭) চলিয়া যাইব। যে দুঃখ লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহার কোনও কিনারা হইল না। মাস্টার মহাশয় বলিলেন—ইহা সহিতেই হইবে, ইহা ছাড়া আর উপায় নাই। সুতরাং আমি আর কি জিজ্ঞাসা করিব? চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ভাল লাগে এবং লাভের আশা আছে বলিয়া আসিয়াছি—শুধু তাহা কেন, আর কোনও উপায় নাই বলিয়াই আসিয়াছি। যদি লাভ না হয় তবুও আসিতেই হইবে। একটু আসিবার যে স্থান পাইয়াছি, ইহাই আমার মতো দুর্ভাগ্যের যথেষ্ট লাভ। অথবা লাভক্ষতির হিসাব করিবার আমি কে? বলদের পক্ষে ক্ষেত্রের আয়ব্যয়ের হিসাব করা বাতুলতামাত্র। শরীর চলুক আর না-ই চলুক চাষার সুবিধা-মতো লাঙ্গল টানিয়া দিনান্তে একমুঠা ঘাসমাত্র তাহার প্রাপ্য সময়-সময় তাহা না পাইলেও বিরক্ত হইবার অধিকার নাই। সমূহ ধর্মতত্ত্বের ইহাই সারমর্ম !! হায় দুর্বল জীব! আমরা সত্যসত্যই—'মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে/ উচ্চ স্বরে "দয়াল" বলে ডাকি।' দুর্ভাগা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি।...ইহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সত্য নয় কি? নিশ্বাসে-নিশ্বাসে মৃতুযন্ত্রণা !! হায় আর কতদিন?

"অধিক রাত্রি হইয়া যাইতেছে। একটু-একটু জয়রামবাটী ও কামারপুকুরের মাটি এবং প্রসাদ লইয়া যাত্রা করিলাম। মাস্টার মহাশয় আলো লইয়া নীচে আসিলেন, প্রণামান্তে বিদায় লইলাম।"

মাঝে দুটি পৃষ্ঠা স্বহস্তে ছিঁড়ে রেখেছেন—তাই জানার উপায় নেই—সে অংশে কি লিখেছিলেন।

ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য নামে যে যুবকের কাহিনী, তাঁরই নিজহাতের লেখা একটি পুরাতন জীর্ণ দিনলিপির পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধারের এই সামান্য চেষ্টা, উত্তরকালে তিনিই কিন্তু আমাদের চোখে এক বিরাট আধ্যাত্মিক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বরূপে ধরা দিয়েছেন। জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বরিষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম স্বামী প্রেমেশা-নন্দই সেদিনের ঐ 'দুর্ভাগা', 'নিশ্বাসে নিশ্বাসে মৃত্যুযন্ত্রণা'-বিধুর সংসারবিরাগী বাউল ইন্দ্রদয়াল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একটি প্রবন্ধে তাঁরই স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "পূজনীয় প্রেমেশ-মহারাজের পূত সঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য অনেকবার হইয়াছে।...শরীর রোগাক্রান্ত ও জীর্ণ। কিন্তু সেই বৃদ্ধ রুগ্ণ দেহের মধ্যে কী সতেজ একটি মনই না বাস করিত।...তাঁহার সহিত বেড়াইতে যাওয়া যে শুধু শারীরিক স্নিগ্ধতা ও তেজ আনিত তাহা নহে, উহা মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ভোজ-বিশেষ মনে হইত।...উপনিষদ, গীতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বাণীর উপর

নূতন আলোকসম্পাত পাওয়া যাইত তাঁহার সহিত আলোচনায়। কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি কর্মযোগ—তিনি যখন যে প্রসঙ্গ তুলিতেন, তখনই তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিত। তিনি পাকা অদ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু উহার সহিত ভক্তির ও কর্মের কোনও বিরোধ ছিল না।"

একখানি অনিন্দ্যসুন্দর লেখ্যচিত্র—যেন সঠিক প্রেমেশ-মহারাজ!

শ্রীম'র অতিপ্রিয় সেদিনের সেই বৈরাগ্যবান সুগায়ক ভাবুক তরুণটি——উত্তরজীবনে যিনি শক্তির আধার—মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর চিরদিনই সম্বন্ধ ছিল অতিশয় নিবিড়—আত্মার সঙ্গে আত্মা যেমন। আমরা জানি, শ্রীম তাঁর সম্পর্কে সমাগত নতুন ভক্তদের কাছে বলতেন—"We have a friend in Sylhet—Indradayal Bhattacharya" (সিলেটে আমাদের এক আপনজন রয়েছেন—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য)। শ্রীহট্ট থেকে আগত কোনও ভক্ত বা পরিচিত ব্যক্তিকে কাছে পেলেই সর্বাগ্রে ইন্দ্রদয়ালের কুশল-সমাচারই জানতে চাইতেন। কোঁচার খুঁটখানি গলায় জড়িয়ে, যেন গলবস্ত্র হয়ে যুক্ত-করে, চোখ দুটি বুজে জিজ্ঞাসা করতেন, "আচ্ছা ইন্দ্রদয়াল প্রভু কেমন আছেন?···আহা! ঠাকুরের কাজে তিনি তাঁর হাড়-মাস-মেদ-মজ্জা, প্রাণ-মন সর্বস্ব অর্পণ করেছেন! ধন্য ধন্য! ধন্য তিনি! আর আপনারাও ধন্য তাঁর সঙ্গ পাচ্ছেন।" শ্রীহট্ট থেকে শ্রীম'র স্নেহাস্পদ কেউ এসেছেন—দরজা খুলে তাঁকে দেখেই প্রথমে তিনি বলতেন—"ওঃ আপনি এসেছেন!—তা একা এসেছেন? ইন্দ্রদয়াল প্রভুকেও সঙ্গে করে আনলেন না কেন? তাহলে তো এখানে বেশ আনন্দ হ'ত।" স্বামী সারদেশানন্দ এক পত্রে লিখেছেন—"প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে চিরকালের জন্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গেল। তাহার পরিচায়ক প্রেমেশ-মহারাজকে লিখিত শ্রীম'র প্রাচীন পত্রাবলী শ্রীহট্ট আশ্রমে এখনও থাকা সম্ভব।"

মাস্টার মশায় ও প্রেমেশ-মহারাজের মাঝে যে প্রণয়-সম্পর্কের উল্লেখ করা হল, তার আরও নিদর্শন আমরা নানাভাবে পেয়েছি। প্রেমেশ-মহারাজের দিনলিপির পৃষ্ঠাতেও এমন সাক্ষ্য চোখে পড়বে। কতদিন এমন হয়েছে যে, উভয়ে উভয়কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু নীরবে, চোখ মেলে দেখেই তৃপ্ত রয়েছেন—মুখের কথা কদাপি অন্তরের মৌন আলাপনে বিঘ্ন ঘটায়নি—মাত্র দৃষ্টি মাধ্যমেই আদানপ্রদান সব হয়েছে। অমন একটি দিনের স্মৃতি তাঁর দিনলিপির পাতায় এইভাবে ধরে রাখা আছে: "আমিও কি বলিব, কি জিজ্ঞাসা করিব, ঠিক করিতে পারি নাই। কথা কহিয়া তো আর কৃপালাভ করা যায় না।"

"অরূপ সায়রে লীলা-লহরী" প্রেমেশ-মহারাজ-রচিত উচ্চ ভাবমূলক শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত শ্রীম'কে বিহ্বল করে তুলত—শুনতে-শুনতে কোন্ ঊর্ধ্বলোকে চলে যেতেন তিনি। ভাবের উপশম হলে শ্রীম মন্তব্য করতেন—"আহা! কী গান! ঠাকুর শুনলে সমাধিস্থ হতেন।" প্রেমেশ-মহারাজও এই উক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়তেন!

একবার জনৈক বন্ধুর মুখে শ্রীম'র ঐ মন্তব্য শুনে আহ্লাদে তাঁকে দুই হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরেন—আর তাঁর শান্ত নয়ন দুটিতে বহুক্ষণ ধরে অশ্রুবন্যা বয়েছিল।

স্বামী প্রেমেশানন্দ সমগ্র রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে একজন মহনীয় সন্ন্যাসী—তাঁর ব্যক্তিত্ব অতিশয় অর্হণীয় এবং প্রেরণাপ্রদ। দীপ দিয়েই দীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। কত জীবনকে যে তিনি উদ্দীপিত করেছেন, তার হিসাব কে রাখে? তাঁর তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন' (শ্রাবণ ১৩৭৪) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "তাঁহার (স্বামী প্রেমেশানন্দজীর) উচ্চ আদর্শনিষ্ঠ, তপঃপূত, নিঃস্বার্থ সেবারত সহজ সরল জীবনের সংস্পর্শ মানুষকে উচ্চাদর্শে আকৃষ্ট করিত ; তাঁহার পূত জীবনের সংস্পর্শে আসার ফলে বেশ কয়েকজন যুবক অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন।...তাঁহার জীবনে উচ্চ আদর্শবাদের সহিত ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের সমভাব প্রসারের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।"—যেসব গুণের উল্লেখ করে 'উদ্বোধন' এই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন—যাঁরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলবেন, ঐ মন্তব্যগুলিতে এতটুকুও অতিশয়োক্তি তো নেইই পরন্তু আবেগকে সংহত রেখে অতি সামান্যই বলা হয়েছে ঐ লোকোত্তর পুরুষ সম্পর্কে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থে শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রসঙ্গে লিখেছেন : "এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মধারা একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। একটি ব্যক্তির অনন্যসাধারণ চরিত্রবল, বিশ্বাস-ভক্তি, হৃদয়বত্তা এবং অতন্দ্রিত সেবা-নিষ্ঠা ছিল ইহার মূলে। তাঁহার নাম ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমেশানন্দ)। স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন, আর বাছিয়া-বাছিয়া ছেলে ধরিয়া, বন্ধু ও জননীর ভালবাসা দিয়া, তাহাদিগের প্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রাণের উত্তাপ প্রয়োগ করিতেন। ত্যাগ ও সেবার আদর্শ গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি যুবক ক্রমে-ক্রমে বাহির হইয়া আসিল।" ঐ গ্রন্থেরই পরিশিষ্টে সর্বশেষ অনুচ্ছেদে লেখকের আরও হৃদয়স্পর্শী উক্তি আমাদের গভীর মনোযোগকে আকর্ষণ করে। সেখানে শ্রদ্ধানন্দজী লিখেছেন—"প্রেমেশ-মহারাজের চরিত্রে কর্ম, ভক্তি, যোগ, ও জ্ঞানের সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন কবি, গীতিকার, চিন্তাশীল সমালোচক এবং শিক্ষাবিদ্। তাঁহার ভালবাসা ও সহানুভূতির কোনও গণ্ডী ছিল না। কিছুক্ষণ তাঁহার সান্নিধ্যে বসিলে হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। তাঁহার ন্যায় সোনার মানুষের স্মৃতি অন্তরের অমূল্য সম্পদ।"

এমন যে হৃদয়-জুড়ানো স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব, এমন যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবের উত্তাপক দৃপ্ত সাধুত্ব, তার মূল উৎস খুঁজতে গেলে কিন্তু আমাদের যেতে হবে সেই পুরানো কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীট পাড়ায় ঐ ত্রিতল স্কুল-বাড়ির উপরের কক্ষে—শ্রীমর সমীপেই। দৃষ্টি ফেরাতে হবে শ্রীম-কথিত সেই কথামৃত গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠাতে।

প্রেমেশানন্দ মহারাজের দেহবসান হয় ৮৩ বৎসর বয়সে, বাংলা ১৩৭৪ সালে। বার্ধক্য-জরা তার তপোশীর্ণ দেহখানিকে খুবই ক্ষীণ করে ফেলেছিল ঠিকই—কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁর অসাধারণ আত্মজ্যোতি এক পলকের জন্যও ম্লান দেখা যায়নি, বরং অধিক-অধিক প্রভামণ্ডিতই দেখা যেত, ইহজীবনের শেষ ক্ষণটি পর্যন্ত। নিত্য-নিয়মিত কথামৃত শ্রবণ ছিল তাঁর প্রাণ-পরিচায়ক নাড়ির স্পন্দনের মতো। একেবারে অন্তিমকাল অবধি, তাঁর শিয়রের কাছে থাকত উপনিষদ, গীতা ও স্বামীজীর জ্ঞান-যোগ, রাজযোগ এবং সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি ও কথামৃত। বার্ধক্যের নানা উপসর্গের বহুবিধ দৈহিক কষ্ট তো ছিলই, কিন্তু তা বলে তাঁর সদানন্দময় হাসিমাখা মুখশ্রীতে কোনোরকম পরিবর্তন আমরা বড় অল্পই দেখেছি। ঐ সময়ে বার্ধক্যজনিত কোনও-কোনও উপসর্গের জন্য তাঁকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাধীনেও রাখা হয়েছিল। কলকাতার তদানীন্তন খ্যাতনামা হেম কবিরাজ মশায় তাঁকে দেখতেন। হেম কবিরাজ প্রেমেশ-মহারাজকে জানতেন দীর্ঘকাল থেকে। মহারাজ যেখানেই থাকতেন, কবিরাজ মশায় ব্যাধি-বিবরণ জেনে নিয়ে নানাধরনের বটিকা, পাচন ও অনুপানাদির ব্যবস্থা পাঠাতেন। আবার মাঝে মাঝে ঐ অদ্ভুত রসিক রোগীটিকে কবিরাজ স্বয়ং দেখতেও যেতেন। হেম কবিরাজ মশায় খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—মহারাজের চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠাও ছিল দেখার মতো। বিস্বাদ পাচন ও দুর্গন্ধ বড়ি—তাও আবার বিচিত্র ঝঞ্ঝাটযুক্ত অনুপান সহযোগে তিনি কি সুন্দর মিঠা কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেবন করাবার চেষ্টা করতেন। খানদানী কবিরাজের স্বভাবই তো ঐ রকম। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার এই ছিল যে, কঠিন পীড়াজনিত দৈহিক যাতনা এবং তার উপর অমন বিকৃত স্বাদ-গন্ধময় কবিরাজী ওষুধ খেতে-খেতেও মহারাজ কিন্তু বিজ্ঞ কবিরাজ মশায়ের ছলা-কলা বেশ উপভোগ করতেন। রঙ্গ পরিহাসেও তিনি কি অসাধারণ কুশলী ছিলেন। তাঁর এই রস-নৈপুণ্যও বুঝি সেই রসস্বরূপের নিরন্তর উপলব্ধি থেকেই। অতি কুস্বাদের কবিরাজী বড়ি বা পাচন গলাধঃকরণ কালে বেশ গম্ভীর কণ্ঠে তাঁকে বলতে শোনা যেত—"জীবনের শুরুতে পড়েছিলাম 'M' (এম) কবিরাজের পাল্লায়! আর এখন এই জীবনের শেষে এসে পড়েছি—হেম কবিরাজের খপ্পরে। এম্ কবিরাজের বড়িতে অমৃতস্বাদ আর হেম কবিরাজ যা দেয়, তা সবই বিস্বাদ। এম্ কবিরাজের বড়ি—'কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্'! আর বাপু, এই হেম কবিরাজের বড়ি দেখছি কেবল জ্বালাই বাড়াচ্ছে!!"

হ্যাঁ, 'M' বা 'শ্রীম' এক আশ্চর্য কবিরাজই বটে। আশ্চর্য কবিরাজের ভেষজ বটিকাটিও ততোধিক আশ্চর্য—"কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্"। আমরা সেই অতি আশ্চর্য রোগীটিকেও ভক্তিভরে স্মরণ করি—যাঁর অহেতুক অনুগ্রহে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়েছে সেই আশ্চর্য কবিরাজী-বটিকার বিচিত্র দৈবী মহিমাকে। ধন্য "এম্ কবিরাজ"—ধন্য তাঁর চিকিৎসাশৈলী!!—ভবরোগ-তাপিত সংসারে যঃ পরম

আশ্বাস বহন করে ফিরছে। "কথামৃত-বরিষণ গৌর জলধর" বলে প্রেমেশানন্দ-মহারাজই ঐ কবিরাজের বন্দনা গেয়েছেন—আমরা কেবল সুর মেলালাম মাত্র।

আমার জীবনে কথামৃত

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

কথামৃত বলতেই মনে পড়ে গাঢ় সবুজ রং-এর সুদৃশ্য ডবল ডিমাই সাইজের একখানি সুন্দর বই। কৌতূহলী হয়ে বইটি নাড়াচাড়া করেছিলাম। বলতে দ্বিধা নেই যে, কিছু বুঝিনি বা স্বাদ পাইনি। কয়েক বছর পরে, বয়স তখন ষোল সতের, বেলুড়মঠের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী আমাকে পরপর চারখণ্ড কথামৃত পড়তে দেন। পঞ্চম খণ্ড তখনও ছাপা হয়নি। আগ্রহসহকারে বেশ তাড়াতাড়ি বইগুলি শেষ করে তাঁকে প্রত্যর্পণ করি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বইগুলি সব পড়া হয়ে গেল?" অবিলম্বে উত্তর, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "সব বুঝতে পেরেছ?" আমারও তৎক্ষণাৎ উত্তর, "হ্যাঁ, সব বুঝেছি।" তিনি একটু হেসে বললেন, "সে কি? আমরাই যে এখনও অনেক জায়গা বুঝতে পারি না।" আমি মনে-মনে ভাবলাম, এর মধ্যে না বোঝবার কি আছে? গল্পগুলি তো বেশ সুন্দর। বাস্তবিক তখনও কথামৃতের প্রকৃত তত্ত্ব কিছু বুঝিনি বা বোঝবার চেষ্টাও করিনি। ফলে মনের মধ্যে বিশেষ একটা প্রভাবও পড়েনি। বরং 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' পড়ে স্বামীজীর গঙ্গার ধারে স্ত্রী-মঠের পরিকল্পনাটি মনে একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। মনে হয়েছিল, একটি নতুন জীবনের সন্ধান পাওয়া গেল। তবে কথামৃত খুব ভাল লেগেছিল এবং মনে আছে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সাগ্রহে পড়ে ফেলি। এবং এইটুকু হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে লাভ করবার কথাই বলেছেন। তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। বিশেষ করে ঐ প্রার্থনাটি খুব ভাল লেগেছিল, "মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।" অবশ্য শুদ্ধাভক্তি বলতে যা বোঝায় তা কি বুঝেছিলাম? মনে আছে, সেই থেকে মনে নানা প্রশ্ন জাগে, আর সেই প্রাচীন সাধুকে চিঠি লিখে জানতে চাই যে, ঈশ্বরকে সব সময় কি করে ডাকা যায়? তিনি উত্তরে অভ্যাসযোগ ও শরণাগতির ওপর জোর দেন—যেমনটি কথামৃতে আছে।

নাম এবং নামী যেমন অভেদ, কথামৃত এবং শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনই অভেদ। তাঁর

ওপর বিশ্বাস থাকলে তবে তাঁর কথার উপরেও বিশ্বাস আসে। ভাগ্যবশতঃ অতি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের উপর। মাত্র এগার বছর বয়সে বাড়িতে তিনখানা বড়-বড় ছবি আসে। ছবিগুলির পরিচয় পেলাম—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাঁর সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা নামে যিনি পরিচিত, এবং তাঁরই শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময়েই আরও শুনেছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দের একজন আমেরিকান শিষ্যা আছেন (পরে জেনেছিলাম আমেরিকান নন), এবং যিনি ভারতে এসেছিলেন, তাঁর নাম ভগিনী নিবেদিতা।

ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি এবং বিশ্বাসও ছিল, একজন ঈশ্বর আছেন, তাঁকে ডাকতে হয় সুখে-দুঃখে ও কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে। মনে কষ্ট পেলেও তাঁকেই জানাতে হয়। কিন্তু কে সেই ভগবান? কি তাঁর রূপ? শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখে কেন জানিনা দৃঢ় বিশ্বাস হল—ইনিই সেই ভগবান এবং এতদিন বাদে পেলাম একজন সজীব ভগবান। তখন থেকে সব প্রার্থনা—ছোট বড়—মনে কষ্ট হলে তাঁকেই জানাতাম, চোখের জল ফেলতাম। অনেক প্রার্থনা তাঁর কাছে করেছি। বলা বাহুল্য সবগুলিই 'দেহি, দেহি'। তাঁর কাছে যে সকাম প্রার্থনা করতে নেই তা কথামৃত পড়েই পরে জেনেছিলাম। কত সংকট মুহূর্তে প্রাণপণ করে তাঁকেই ডেকেছি যেন তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। পরে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছি যে, তখনকার কোনো প্রার্থনাই তিনি পূরণ করেন নি; কারণ তিনি অহেতুক কৃপাময়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে জীবনের গতি ফিরিয়ে দিলেন! তারপর থেকে আরম্ভ হল নিয়মিতভাবে একা এবং অনেকে একত্র হয়ে কথামৃতপাঠ—যা এখনও চলছে।

আমার নিজের মনে হয়, কথামৃতের মূল কথা, ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য—ঠাকুর আমাদের বারংবার এই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গটি তিনি বেশ সহজভাবে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন; যেমন "কোনো কঠোর তপস্যার প্রয়োজন নেই, সংসার ত্যাগ করতে হবে না, যা কাজ করছ তাই কর কিন্তু তাঁকে আশ্রয় করে।" তাহলে কিছুই কি করতে হবে না? সহজ উত্তর—সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস (তা দু'এক দিনের জন্যে হলেও), ঈশ্বরের নাম গুণানুকীর্তন, সদসৎ বিচার। গভীরে যেতে চাইলে ব্যাকুলতা—না থাকলে প্রার্থনা করা। তাঁকে আশ্রয় করে খুঁটি ধরে ঘোরা। "তাঁকে ভালবাসো, আপনার বোধ করো"। এটি যেন পরম আশ্বাস, আধ্যাত্মিক জীবনকে যা ভীতিপ্রদ করে তোলেনি। যদিও ক্রমশঃ বোঝা যায়, তাঁকে ভালবাসা, আপনার করা, বা ঈশ্বরলাভ কোনটাই সহজ নয়। কিন্তু আরম্ভ করা সহজ হতে পারে।

মানুষটি আনন্দময়, সহজ সরল, সকলের হৃদয়ে সহজে পৌঁছে যান। যেমনভাবে খুশি ডাকো, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মনে খুব দাগ কেটেছিল একটি পুকুরে

চারটি ঘাটের উদাহরণটি যা যত মত তত পথের অতুলনীয় ব্যাখ্যা। ছোটবেলা থেকে খ্রীস্টান ধর্মের উপর বিরূপতা ছিল নানা কারণে। কথামৃত পড়ে যীশুখ্রীস্টের উপর ভালবাসা এল। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ঘোষণা মনের দ্বন্দ্ব নিরসন করে। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবী সম্পর্কেও তাই। একই শক্তির নানা প্রকাশ। নানাভাবে তিনি সাধকের কাছে দেখা দেন। এইভাবে কত জটিল সমস্যারই সহজ সমাধান পাই।

বস্তুতঃ কথামৃত বহু শাস্ত্রের আকর। উপনিষদ্ পড়ার ইচ্ছা ছিল। শুনেছিলাম বড় কঠিন। আরম্ভ করে তেমন দুরূহ বোধ হল না। অবশ্য "শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তবিভ্রম কারণম্" অর্থাৎ সেই পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের বহু চুলচেরা তর্কবিতর্ক সযত্নে পরিহার করেছিলাম। কিন্তু মূল তত্ত্বের আভাস পেয়ে আনন্দ বোধ করি। একজন অধ্যাপক বললেন যে, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ পড়া থাকলে দুরূহ এবং জটিল তত্ত্বগুলি সহজ সরল হয়ে ওঠে। যেমন দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ;—যা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছে এবং শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক-প্রমাণের মাধ্যমে মনে হয় পরস্পরের মধ্যে বুঝি কোনো মিল নেই। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মতগুলির মধ্যে কোনো বিভেদ নেই—বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখামাত্র। তিনি ব্যাখ্যা করেন না, সহজ গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বহু শাস্ত্র পড়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহ, কিন্তু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কেমন সুন্দরভাবে "চিঠি পড়ার" উদাহরণটির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ শাস্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান জেনে নাও, তারপর সেটি পাবার জন্য উঠে-পড়ে লাগো।

সাধারণ লোক তন্ত্রশাস্ত্রের কিছুই জানে না। অথচ কথামৃত পড়লে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। এইরকম বহু বিষয়ে!

কি না পেয়েছি কথামৃতের মধ্যে? মনের যদি একটুও প্রসার ঘটে থাকে তা তাঁর কৃপায় কথামৃতেরই মাধ্যমে।

আগেই বলেছি মানুষটি আনন্দময়। তাঁর চালচলন এত সহজ সাদাসিধা; সব বিষয়ে ঔৎসুক্য; চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, সার্কাস কিছুই বাদ যায় না। এই সব কিছুই তিনি অকপটে গ্রহণ করছেন। সকলকে হাসি ও আনন্দে মাতিয়ে রাখেন। ফলে তাঁর শিষ্যদের জীবনও অনুরূপ আনন্দময়। আর যারা তাঁকে কিছুমাত্র অনুসরণ করতে চায় তাদেরও জীবনযাপন নীরস হয় না। বেদে বলেছে, ঈশ্বর রসস্বরূপ। কথামৃতের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই তার পরিচয় পাই। তাঁকে কঠোর তপস্বী, অসাধারণ বিদ্বান, গম্ভীর জ্ঞানী-পুরুষ এসব কিছুই মনে হয় না। কিন্তু ধীরে-ধীরে প্রকট হয়—তিনি এ-সবের বহু-বহু ঊর্ধ্বে। তাঁকে ধরা বড় কঠিন।

প্রতি পদে তিনি আশ্বাস দেন মানুষকে: কোনো ভয় নেই—এগিয়ে যাও। জীবনের সব সমস্যার সমাধানও করে দেন। একবার একটি ঘটনা অন্য পসঙ্গে

যথাযথ লিপিবন্ধ হতে না দেখে মনটা বিচলিত হয়। ইতিহাস বা সত্য রক্ষিত হল না—এই প্রশ্নটি মনকে আলোড়িত করে। হঠাৎ কথামৃত মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, যা সত্য তা সত্যই—কেউ বুঝুক বা না-বুঝুক। মন শান্ত হল। একটা নতুন আলো পেলাম। জগতে কত বিচিত্র লোক, কত বিচিত্র ভাব, প্রকাশও কত বিভিন্ন। সব গুলিকেই আমরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারলেও বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি। সেও তাঁরই অমৃতময়ী বাণীর ফল। তিনি বলেছেন, যার যেমন ভাব। কারোর ভাব নষ্ট করতে নেই। মনের একটা সান্ত্বনা মেলে কথামৃতের কৃপায়।

গীতা-উপনিষদের বক্তব্যগুলি তাঁর অনুপম ভাষায় সুন্দর-সুন্দর গল্পের মাধ্যমে সহজ সরল হয়ে যায়। কথামৃতে আছে—তাঁর কৃপা-বাতাস বইছে, পাল তুলতে হবে। তাঁর কৃপার কণামাত্র লাভ করে আমরা ধন্য ; আমরা অনুভব করি কথাটি সত্যি। নিজের উপলব্ধি দিয়েই এটি প্রমাণিত।

শূকর মাংস খেয়ে যে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রাখে সেই ধন্য। সেই আচারনিষ্ঠ যুগে কী অসমসাহসিকতার কথা এবং আশ্বাস! সমাজে পতিত বারাঙ্গনাদের কে এমন করুণামাখা কণ্ঠে সাদর সম্ভাষণ করেছেন—মা, তুই এইরূপে এখানেও আছিস? এত বড় মর্যাদা কে কবে এর পূর্বে দিয়েছে নারীকে?

কথামৃতের একটি মহৎগুণ যে, প্রতিদিনের লিপিবদ্ধ কাহিনীতে আমরা একটি সজীব মানুষের সন্ধান পাই ; ঈশ্বরের প্রেমে তন্ময়তা অর্থাৎ দিব্যোন্মাদ যাকে বলে—পাই তারও একটি ধারণা। জীবনী পড়ে ঠিক সে অনুভূতি হয় না। সমস্ত দক্ষিণেশ্বরে যেন তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। কত ছবি মনে ভেসে ওঠে। কখনও ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট, পশ্চিমের গোল বারান্দাটিতে দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন, কখনও-বা উঠোন দিয়ে যাচ্ছেন মন্দিরের দিকে, ফ্যাল্‌ফ্যালে দৃষ্টি! মন্দিরে গেলেও তাঁকেই মনে পড়ে—মাকে চামর নিয়ে আরতি করছেন। চাতালে বসে ঈশানের সঙ্গে কথা বলছেন ইত্যাদি। একসঙ্গে বহু চিত্র ভিড় করে মনে। পঞ্চবটী—পোস্তা—সর্বত্র যেন তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি। দেখছি, ভক্তগণ পরিবেষ্টিত—কত লোকের আনাগোনা—কত হাসি, গল্প—সকলকে আনন্দ দান, জীবনের পথনির্দেশ করে দেওয়া! আর তার মধ্যেই হঠাৎ সমাধিস্থ! কি অদ্ভুত! কি অপূর্ব!

প্রকৃত সাধু কাকে বলে? গৃহস্থের কেমন জীবন যাপন করা উচিত? সবেরই সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখি কথামৃতে। ছোটবেলা থেকে সত্য কথা বলার অহঙ্কার ছিল। কথামৃত পড়ে বুঝলাম কত কঠিন সে সাধনা। মন মুখ এক করে তবেই সত্য কথা বলা যায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা কি সম্ভব? কিন্তু বুঝলাম, সত্যের মানদণ্ড কি। প্রতিদিন কর্তবিষয়ে এইরূপ ধারণা স্পষ্টতর হয়। আদর্শটি এতই উচ্চ যে, তার নাগাল পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। যত দিন যাচ্ছে, এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে, মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

তাঁর কথায় "ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে, 'ঐ ঈশ্বর' অর্থাৎ আকাশের

দিকে সে দেখিয়ে দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে, যে তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে, তিনি এই সব হয়েছেন—যা কিছু দেখছি সবই তাঁর এক একটি রূপ।" এখন বুঝে নেওয়া সহজ হবে কে কোন শ্রেণীর ভক্ত।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের যে অধ্যাত্ম বাণীটি যুগ-যুগ ধরে মানবমনকে আশা ও আনন্দে ভাস্বর করে রাখবে তা হোল—"সকলে তাঁকে জানতে পারবে—সকলেই উদ্ধার হবে, তবে কেহ সকাল-সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুরবেলা, কেহ-বা সন্ধ্যার সময়। কিন্তু কেউ অভুক্ত থাকবে না। সকলেই আপনার স্বরূপকে জানতে পারবে।"

আজ জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে সেই প্রাচীন সাধুর কথাই মনে পড়ে বারবার, যিনি প্রথম কথামৃত পড়তে দিয়েছিলেন। সেদিন তাঁকে বলেছিলাম, "বুঝতে পেরেছি।" এখন বুঝেছি যে, কিছুই বোঝা হয় নি, একটা আভাস মাত্র পাওয়া গেছে। কথামৃতেই আছে, "তাঁকে কে বুঝবে? তিনি অনন্ত।" যাঁর কথা—তিনিও অনন্ত। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর।

কথামৃত প্রসঙ্গে

প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে একবার বলেছিলেন—'এর পর ঘরে-ঘরে আমার পূজো হবে।' শপথ করে বলেছিলেন। আজ অশেষ বৈচিত্র্যময় বিপুল জনসংঘের দেশ ভারতের সর্বত্র এবং বিশ্বের নানাস্থানে তাঁর প্রতিকৃতি সমাদৃত। তাঁর শিক্ষার অনুধ্যানের আগ্রহও প্রমাণ করে সে কথার সত্যতা। যুগাবতার, মহান্ আচার্য বা দেবমানব, যে দৃষ্টিতেই তাঁকে দেখি না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব চরিত্র তাঁকে সর্বজনপূজ্য করেছে। পূজা বা শ্রদ্ধা শব্দে যদি কিছু দূরত্বের ভাব থাকে, তবে বলি, তাঁর প্রতি ভালবাসা আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। সেই আকর্ষণ, সেই ভালবাসা বিশ্বের সহস্র-সহস্র মানুষের মধ্যে কিভাবে জেগেছে, আরও জাগছে, তা ভাববার বিষয়। আমাদের মনে হয়, এই দিব্যপুরুষের মহিমা প্রচারে সর্বাধিক প্রভাবশালী গ্রন্থ হল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা শ্রীম নামক মহান্ ব্যক্তির অদ্ভুত প্রতিভাবলে শ্রীঠাকুরের বাণীসমূহ সংরক্ষিত হয়েছে কথামৃত গ্রন্থে। এটি মানবজাতির সৌভাগ্য। জগতের ধর্মসাহিত্যে একটি দিব্যজীবনের এমন দিনলিপি এভাবে আর কখনও সংকলিত হয়নি। স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাণ্ডিত্য, প্রামাণিকতা ও ব্যাখ্যানৈপুণ্যের সমাহারে ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু এই বিশাল

রচনাটি বিষয়ের গভীরতা ও ভাষার গাম্ভীর্যে কেবল বিদগ্ধ ভক্ত জিজ্ঞাসুদের কাছেই আদৃত হয়েছে বলা যায়। ঠাকুরের ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত, সুরেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বাণী প্রকাশনের কিছু উদ্যোগ করেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর বাণী লিপিবন্ধ করায় উৎসাহী ছিলেন—কিন্তু ঠাকুরের সমর্থন পাননি। বোঝা যায়, যেন ঐ কাজ মাস্টার মশায়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। কালে দেখা গেল, কথামৃতই (মূল বা অনুবাদ) ঠাকুরের ভাববিস্তারের প্রধান বাহক হয়েছে। এ বছরে শ্রীম-র দিনলিপি সূচনার শতবর্ষপূর্তি এবং তাঁর দেহান্তের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হওয়া তথা গ্রন্থের স্বত্বমুক্তি উপলক্ষে এই গ্রন্থের বিরাট চাহিদার কথা নতুন করে জানা গেল। রচনার প্রাণময়তাই তাকে কালজয়ী করেছে। স্বামী নিখিলানন্দকৃত কথামৃতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বিশ্বের সাড়া জাগিয়েছে। ধর্মপুস্তক পাঠের নীরসতা ও কাঠিন্যের চিরপোষিত ধারণাকে মিথ্যে করেছে কথামৃত। অথচ গ্রন্থটি লঘু, একথা ভাবাও বাতুলতা। বর্ণনার গুণে গ্রন্থটি সুখপাঠ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় পুরুষের চরিত্র-মাহাত্ম্য অনুধাবন, তাঁর বাণীর মর্মগ্রহণ, তদুপরি তদনুসারে জীবনযাপন দুরূহ সাধনার বিষয়।

মাস্টার মশাই সুপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন জানি। সেইসঙ্গে তাঁর ছিল সাহিত্য-বোধ ও শিল্পরুচি। সেই সংস্কৃত মনের উপর বর্ষিত হয়েছিল ঠাকুরের শুভাশিস্, যা পূর্ণ বিকশিত করেছিল আধ্যাত্মিক জীবন। স্মৃতিধর ও শ্রুতিধর ঋষি শ্রীম ধ্যানসহায়ে পূর্বদৃষ্ট দৃশ্য ও শ্রুত কথার মর্মানুসন্ধান করে এই রচনাকে রূপ দিয়েছেন। এটি ঠাকুরের পূর্ণ জীবনী নয়। অথচ ঠাকুরের সম্বন্ধে যে প্রাথমিক পরিচয়টুকু না থাকলে তাঁর কথায় ভাবগ্রহণে বাধা জন্মাবে, তা দূর করতেই অবতারণা করেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত চরিতকথা, নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন রানী রাসমণির দেবালয়ের। লেখক বলেছেন—"ভক্তেরা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে দিবসের মধ্যে নানা অবস্থায় দেখিতেন। ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে কখনও একাকী, কখনও বা ভক্তসঙ্গে নানাভাবে থাকিতেন। সেইসকল অবস্থা ও ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ কথামৃতে আপাততঃ সন্নিবেশিত হইল।" এই মহামূল্যবান চিত্রসমষ্টিই আমাদের মুগ্ধ করে। শ্রীম-র বর্ণনায় আমরা যেন চাক্ষুষ করি সেইসব দিব্যদৃশ্য। বিশ শতকের কলকাতাবাসী আমরা অনেকেই আবাল্য দক্ষিণেশ্বর তীর্থের সঙ্গে পরিচিত। হয়ত বড়দের কাছে শিশুকাল থেকে শুনেছি মা ভবতারিণীর সঙ্গে এই অপূর্ব সাধকের অতি ঘনিষ্ঠ লীলার অলৌকিক সত্য কাহিনীগুলি। তবু বলা যায়, বড় হয়ে কথামৃত হাতে পেয়ে ঠাকুরের বিষয়ে নতুন চিন্তার বিশেষ প্রেরণা জেগেছে। এই গ্রন্থ কথায় তৈরী চলচ্চিত্র। শ্রীম-র চোখেই আমরা ঠিকঠিক দেখতে শিখেছি সেখানকার গঙ্গা, চাঁদনি, দেবালয়, বিগ্রহসমূহ, বাড়ী, বাগান, পুকুর প্রভৃতিসহ সমগ্র দেবস্থানটিকে। কিছুটা কল্পনা করতে পেরেছি রানীর উদার-মহান আয়োজন, ব্যবস্থাপনা, জাগ্রত তীর্থের প্রাণস্পন্দন। যেন আঘ্রাণ পাই ধূপ-কুসুমাদিসুবাসিত

স্নিগ্ধ সমীরণের। মন্দির-পরিচিতির শেষ অনুচ্ছেদের নাম 'আনন্দ-নিকেতন'। সেই নিকেতনের আনন্দময়তার রেশ বুঝি চিরকালের মানুষ অনুভব করবে এ গ্রন্থ পাঠ করে। সব কিছুই তো ঠাকুরের প্রকট লীলার স্মৃতি বিজড়িত ! শ্রীম যেন পাঠককে সাগ্রহে সঙ্গে নিয়ে মন্দির পরিক্রমা করলেন, অনুচ্চকণ্ঠে বন্দনা করতে লাগলেন এই তপোভূমির। তারপর নিজেই তাকে পৌঁছে দিলেন আরাধ্য দেবতার কাছে তাঁর অনুভূত অমৃতের আস্বাদ দেবার জন্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ্, ত্যাগ-প্রেম, কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় মূর্তি—বা আরও কত কি। কিন্তু জীবিতকালে এই মহামানব কেমনভাবে দিনযাপন করতেন, তাঁর অভ্যাস, বিশ্বাস, রুচি, মনন ও ক্রিয়া কেমন ছিল—তার বিশদ সংবাদ এমন করে কে দিয়েছে কথামৃত ছাড়া। অথচ লেখক প্রায়ই অদৃশ্য রয়েছেন বর্ণিত দৃশ্যে। ধন্য তাঁর গুরুসঙ্গ। তার ফলেই তিনি অনায়াসে এ রচনায় উত্তম পুরুষ বর্জন করে প্রথম পুরুষের সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন আত্মপ্রসঙ্গে। যেন সবই তিনি তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে দেখলেন ও লিখলেন। ঠাকুর ও তাঁর বাণীবিষয়ে শ্রীম ব্যক্তিগত মতামত বেশী না দিয়ে বর্ণনীয় বিষয়ের যথার্থতায় গুরুত্ব দিয়েছেন। বালকের নিরভিমানিতায় অকপটে উল্লেখ করেছেন কিভাবে তাঁর কাছে শ্রুত বিষয়ের পড়া নিতেন স্বয়ং ঠাকুর, কি জন্য কখন তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন।

জগতপূজ্য মহামানবদের জীবনই তাঁদের বাণী। তাই কথামৃত সেই দেবমানবের বাণীরূপ। মন ও মুখের একত্ব সাধনের যে উপদেশ তিনি কথামৃতের অধ্যায়ের ছত্রে-ছত্রে দিতেন তার দৃষ্টান্ত তাঁর এখানকার জীবনচিত্রেই সদা আলোকিত। একাগ্রতা, পবিত্রতা, হৃদয়বত্তা, দেহবোধশূন্যতা ও ঈশ্বরতন্ময়তার যে ভূরি-ভূরি প্রসঙ্গ তিনি গল্পের ছলে ভক্তদের দিবারাত্র শোনাতেন—তিনি নিজেই ছিলেন তার জীবন্ত উদাহরণ। আশ্চর্য কথক ঠাকুর, গল্পের ভাঁড়ার উজাড় করে বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের বিচিত্র অবস্থা, স্বভাব, শক্তি ও দুর্বলতার কথা ; আর তাকে এগিয়ে দিতে চেয়েছেন শুভ লক্ষ্যপথে অভ্রান্ত নির্দেশ দিয়ে। কথাসাহিত্যের রমণীয়তা এ গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ। উপমা নির্বাচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহে তিনি অদ্বিতীয় শিল্পী। প্রসাদগুণে তাঁর বাক্ভঙ্গী প্রাণস্পর্শী। আর্ত, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী নানাজন আসতেন তাঁর কাছে। একান্ত আগ্রহে তিনি তাদের কাছে সৎপ্রসঙ্গ করতেন। এই রচনায় দেখা গেছে তাঁর সদানন্দ মূর্তি। মার উক্তি সত্য যে 'তাঁকে কখনও নিরানন্দ দেখিনি।' ভাবে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেছে, যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন, তাতেও তত্ত্বকথার বিরাম নেই, উপরন্তু নিজেকে নিয়ে রসিকতা—কাউকে তাঁর হাত ভাঙ্গা বিষয়ে ভঙ্গী করে লেকচার দিতে বলছেন। কৌতুকের সঙ্গে এতে হয়ত কটাক্ষও থাকতে পারে আধুনিক মানুষের লেকচারপ্রিয় অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি।

কথামৃত আধুনিক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ। একজন মানুষ যিনি ঈশ্বর বই কিছু

ভাবেন না, কামিনীকাঞ্চনের বাতাসেও যাঁর শ্বাসরোধ হয়ে আসে—তিনি করুণায়, প্রেমে মানুষের ঘরে-ঘরে যেতেন ধর্মদান করতে। আর শুদ্ধসত্ত্ব বালক, সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, ভক্ত, যোগী, পণ্যারমণী প্রভৃতি নানা রুচি ও বৃত্তির অগণিত মানুষ সমবেত হতেন দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কক্ষে। সবার জন্য তাঁর দ্বার খোলা। আধার অনুযায়ী তিনি করতেন অবিরাম ধর্মপ্রসঙ্গ। অমোঘ হত সে কথাগুলি বক্তার প্রজ্ঞা, চরিত্র ও সহানুভূতির বলে। গল্প, হাসি, রঙ্গ-কৌতুক, নৃত্য গীত অভিনয় দিয়ে ভরিয়ে দিতেন তাদের মনপ্রাণ। অথচ লক্ষ্য, তাঁরই উপমা 'কম্পাসের কাঁটার' মতো ভগবানের দিকেই স্থির। তিনি আমাদের সহজ কথায় বুঝিয়েছেন এই জগতের নশ্বরতা, ঘৃণা জাগাতে চেয়েছেন অবোধ ভোগসর্বস্বতার প্রতি, তুচ্ছ করে দিয়েছেন আমাদের নিত্যবর্তমান ও বর্ধমান অহংকারকে। চোখের সামনে তুলে ধরেছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মানব, ঈশ্বর তথা ধর্ম সম্পর্কে খুলে দিয়েছেন স্বচ্ছ ও সুন্দর দৃষ্টি।

এযুগের ভাগবতকার শ্রীম ঠাকুরের অমৃতময় বাণী লিপিবন্ধ করেছেন জীবনের মহত্তম ব্রত হিসাবে। তাই আমরা পেয়েছি এই সুধাভাণ্ড তথা আনন্দের খনি। চিরদিনই মানুষ এখানকার অনিঃশেষ উৎস থেকে পাবে আনন্দ, পাবে শক্তির প্রেরণা। শ্রীম এই গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীমায়ের যে পত্রটি যোজনা করেছেন তা হল এ রচনার সত্যতার অভিজ্ঞান। সংশয়ের কোনো অবকাশ আর রইল না গ্রন্থের বিশ্বস্ততা বিষয়ে। লেখক একস্থানে লিখেছেন—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি জগতের আদর্শ—তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধন।"

সত্যই কথামৃতের দৃশ্যগুলি যদি বাণীসহ চিত্তে জাগরূক থাকে তবে তাই হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুধ্যান।

৪. সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে

মহাভাবে সমাধিস্থ…কণ্ঠে কথামৃত বিশ্বমন্ত্র-ভাষ…

এটা কি নিকষিত সত্য নয় যে, আজ বাংলায়, সর্বভারতে, ভারতের বাইরে এই নগ্নগাত্র শিশুকল্প পুরুষই সর্বাধিক পূজিত ?

…ঠাকুরের কথা কি বলব, মনে হয় তিনি আমার চিরপুরাতন বন্ধু…

পরমহংস গণধর্ম স্বীকার করে তার চরমমূল্য দিলেন।…তাই ব্যবহার করলেন সানন্দে জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গি…

স্রষ্টাকে সেই সাহিত্য অমরত্ব দেয় যা পৃথিবীকে ভালবাসতে শেখায়…কথামৃতে সেই অফুরন্ত ভালবাসার শিক্ষা…

কথামৃত দুঃখের দিনে, বেদনার দিনে অস্থিরতার ক্ষণে যেন একটি শান্ত সান্ত্বনা এনে দেয়—সেখানে মনের আশ্রয় মজুত আছে…

কথামৃত…আমার বেশি বয়সের ক্যালিডোস্কোপ…ফোকরে চোখ রাখলেই রকমারি রঙ… পৃথিবীটা এত বর্ণময়…

সাংবাদিক বিচারেও বইটি বিস্ময়…টেপ রেকর্ডার নেই, শর্ট হ্যান্ড না, অথচ ঠাকুরের সব কথা এমন বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করা…

কথামৃতের অডিও-ভিসুয়াল সম্ভাবনা শ্রীম জানতেন…

শ্রীম যেভাবে ঐতিহাসিক পুরুষ ও ঐতিহাসিক ভাবধারার ছবি এঁকেছেন তা ঐতিহাসিকের পক্ষে বিমুগ্ধ ঈর্ষার কারণ…

…তাই বেদ নয়, গীতা নয়, আমাকে যদি একটিমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থের নাম করতে হয়—সে বইটির নাম কথামৃত…

…কলিন উইলসানের অমন ডাকসাইটে বইয়ের মধ্যে হঠাৎ ভারতের শ্রীরামকৃষ্ণ কেন ?…

…ধর্মকে আঁকড়ে ধরার কোনো কারণ এখনো আমার জীবনে ঘটেনি…কিন্তু কথামৃত অনেকবারই পড়েছি, যখনই হাতের কাছে পেয়েছি পড়তে শুরু করলেই চোখ আটকে গেছে…

…সে গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় ঠাকুর জীবিত…স্থির হয়ে আছে সেই সময়…

আশ্চর্য বই।…পড়তে গিয়ে মনে হয় যেন পবিত্র পুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে…

কথামৃত ও কথামৃতকার

জ্যোতির্ময়ী দেবী

১৩০৫, ইংরাজি ১৮৯৮। পাক্ষিক উদ্বোধন এল রাজপুতনায় জয়পুরের বাড়ীতে। আমার তখন বয়স পাঁচ-ছয়। হাতেখড়ির পর প্রথম ভাগ শেষ করেছি বোধহয়। পিতামহীর ঘরে শুধু গল্প শুনি রামায়ণ মহাভারতের আর তাঁর ঘরের বইয়ের স্তূপ ঘাঁটি। সন্ধান পেলাম কথামৃতের গল্পের। উদ্বোধনের পাতায়-পাতায় কথামৃতের গল্প অসংখ্য।

'হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ।' 'এক গামলা রঙ-এ এসব রঙ ছোপানো।' 'হরি হরি হর হর! কেশব (কে সব) কেশব ? গোপাল গোপাল (গোরুর পাল)।'—রূপক গল্প, সরস কৌতুকে ভরা। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-ভরা প্রতারণার কাহিনী। হরি হরি (নেব ? নেব ? হর হর (নাও নাও)। কেউ বুঝিয়ে দিয়েছিল কিনা মনে নেই। উপদেশ, উপমা, গান, গল্প, শিক্ষা। ঈশ্বরে ভক্তি, নিরভিমান বালক-ভাব, বিনয়—পাতায়-পাতায় ছড়ানো। তখন খুঁজে-খুঁজে গল্পগুলি পড়েছি। তখনকার অন্য ভাল লাগা। সব ভাই-বোনে মিলে পড়া। আবার কত সুখ-দঃখের সংঘাতে বেদনার দিনে একলা বসে-বসে পড়া ও ভাবনা। ব্রাহ্মণ-ভক্তের প্রশ্ন—"জাতিভেদ ?" পরম উত্তর—"ভক্তিতে জাতিভেদ থাকে না। ভক্তের জাতি নেই।" নিন্দা নয়, সমালোচনা নয়। প্রশ্ন—সমাজসংস্কার, নারীর স্বাধীনতার অধিকার প্রসঙ্গে। উক্তি—প্রথম-প্রথম সমাজচিন্তা ও-রকম হয়। শেষ অবধি যা থাকবার থাকে, যা যাওয়ার যায়। ঈশ্বরলাভই উদ্দেশ্য, শ্রেয়—সত্য ও নিত্য, আর বিষয়—অনিত্য।

কথামৃতের উক্তি অনুসারে জানতে পারি—দেশ, কাল, মানুষের মন, তার চিন্তা, নিয়তই পরিবর্তিত বিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের প্রতিমুহূর্তের ভাবনা কথামৃতের বাণীতে বিভাসিত। তিনিই সমাধান করে দিচ্ছেন তাঁরই উপমায়। মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আড় করেই খাও—একই স্বাদ।

কয়েকবছর পরে বই আকারে কথামৃতের আবির্ভাব—পিতামহীর বইয়ের সংগ্রহে। আমার মাতামহী বইখানি পিতামহীকে পাঠিয়েছেন। শ্রীম-গেহিনী নিকুঞ্জ-দেবী আর মাতামহী সহোদরা ভগ্নী। আমাদেরও তিনি দিদিমা এবং ভক্তিভাজন শ্রীম আমাদের দাদামশাই ছিলেন সম্পর্কে।

নানা ভাগ্য বিপর্যয়ে দীর্ঘদিন কেটে যায়। গৃহজীবন ভেঙ্গে যাওয়ায় ধারার

স্রোতে কলকাতায় পিত্রালয়ে ভাই-বোনদের ও সন্তানদের শিক্ষা বিবাহাদির দায়িত্ব নিয়ে থাকি। মাতামহী ক্ষীরোদা দেবীও কাছাকাছি থাকেন। তাঁকে বলি, তুমি তো প্রায়ই নিকুঞ্জ দিদিমার বাড়ী যাও, আমাকে নিয়ে চলো, শ্রীম-কে প্রণাম করে আসি।

তখন পর্দাপ্রথার যুগ। আমাদের বাড়ির খুব সেকেলে ধরন। দুপুরবেলায় ঘোড়ার গাড়ি করে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে শ্রীম-র পুণ্য ভবনে গেলাম, বেলা দুটো হবে। শ্রীম তখন বিশ্রাম করছেন শুনলাম। আর দিদিমা তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে কোথায় যাবেন তখনই। বাড়িতে তখন প্রভাত মামা ছিলেন (তাঁদের পুত্র)। আর কেউ নেই। দু-চারটি কথার পর দিদিমা আর একদিন আমাকে আসতে বললেন। সে-দিন দর্শন হল না।

পরদিন সকালেই দিদিমার কাছে কে একজন এসে শ্রীম-র হস্তাক্ষরে আমার নাম লেখা আশীর্বাদস্বরূপ বই—কথামৃত প্রথম খণ্ড দিয়ে গেলেন।

আনন্দে শ্রদ্ধায় অভিভূত আমি। সেটি মাথায় নিয়ে প্রণাম করে কাছে রাখলাম। সেই বই এখনও আমার আছে।

তাঁর চরণে মাথা নত করে স্পর্শলাভ করার সুযোগ আর ঘটে ওঠেনি, নানা কাজে বিদেশ যাওয়াতে, দুর্ভাগ্যবশতঃ। একেই বোধহয় কর্মচক্রের ফল বলা ঠিক।

তাঁর তিরোধানের পর আকুল বেদনায় আরও কতবার তাঁর বাড়ি গেলাম। ব্যর্থ ক্ষোভময় সে যাওয়া।

আজ প্রণতি জানাই কথামৃতকে—যত মত তত পথ—মহাবিশ্বমন্ত্র প্রণতি—

মহাভাবে সমাধিস্থ। অর্ধবাহ্য কম্বু
কণ্ঠে কথামৃত বিশ্বমন্ত্র-ভাষ।
"যত মত তত পথ" ভরা এই ত্রিভুবন—
লোকে-লোকে চিরন্তন অভয় আশ্বাসি।
শুচি বা অশুচি পথ—অপথ বিপথ
সব পথে মহাকাল চির ধাবমান—
জ্ঞানী ভক্ত মূঢ় জীব জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
চলে "যত মত তত পথে" একই লক্ষ্য তাঁর সন্নিধানে॥

আবরণ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভগবান সর্বগুণাধার হয়েও একটি 'দোষে' মানুষকে বিহ্বল-বিব্রত করে এসেছেন ; চিরদিনই নিজেকে রহস্যাবৃত করে রাখলেন, কখনও স্পষ্ট হলেন না। বেশি কথায় না গিয়ে ঐ 'সর্বগুণাধার' কথাটুকুতেই আসা যাক না। একজন যখন বহু তপস্যার ফলশ্রুতি-হিসাবে বলে উঠলেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—আমি দেখে এলাম তাঁকে সর্বগুণাধার রূপে, আর একজন তখন অনুরূপ সাধনান্তে এসে বললেন—"দেখেছি বললেই হল ? তিনি তো নির্গুণ, নির্বিকল্প, নিরবয়ব, কোনো রূপেই, কোনো গুণের সূত্র ধরেই খুঁজে পাওয়ার বস্তু নন।"

অত উঁচু কথায় না গিয়ে আমাদের সাধারণ মানুষের স্তরেই নেমে আসা যাক। অত উঁচুতে পেঁছিবার উপায় রাখেননি বলেই তিনি মাঝে-মাঝে ত্রিতাপ-দগ্ধ আমাদের জন্যে তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেন যে তাঁদের মধ্যেও তাঁর ঐ 'দোষটুকু' সংক্রামিত করে দেন তা তিনিই জানেন। তাঁদের সকলেই যেন বেশ স্পষ্ট নন, সবাইকে ঘিরেই এমন একটা রহস্য আছে যা ভেদ করে সার বস্তুতে, তাঁদের শুদ্ধ সত্তায়, পেঁছানো অতিশয় কঠিন। আর, এও এক কৌতুকজনক ব্যাপার, এই দৈব-প্রতিনিধি যিনি যত বড়, তিনি নিজেকে এই ঢেকে রাখার কৌশলে যেন ততই দক্ষ।

দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে নিতে পারি ; কেননা তিনি এখনও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ, আমাদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। এখনও তাঁর সাধন-কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর কোনো-না-কোনো স্থানে কিছু-না-কিছু নিত্য ঘটে যাচ্ছেই—তাঁর আলোক ছড়িয়ে দিয়ে।

কিন্তু এত কাছে থেকেও আমরা এখনও স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি কি ? সন্ধান পেয়েছি কি সেই জ্যোতির মূল কেন্দ্রবিন্দু—যা এমন করে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে ?

পরমহংসদেব নিজেই বলেছেন—'ওরে, ওরা আমায় পাগল বলে। একদিন ঘরে-ঘরে আমার পুজো দেখবি।'

কথাটা দুই দিকেই সত্য। তিনি এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন যে, দৈনিক জীবনে তিনি কখনো-কখনো এমন মানসিক অবস্থায় পড়ে গিয়ে এমন আচরণ করতেন যাতে নিতান্ত শিশুর লক্ষণ তো বটেই, এমন-কি সময়ে-সময়ে বাতুলের লক্ষণও প্রকাশ পেত। নিশ্চয় জ্ঞানতঃ নয়, জ্ঞানতঃ হলেই সেটা হোত ভান, ভণ্ডামি। [তাঁকে] বোঝবার উপায় ছিল, সেইসব ভক্ত শিষ্যদের কথার মাধ্যমে যাঁদের দ্বারা পরিবৃত

থাকতেন। এটা হোল স্থূল মাধ্যম। আর একটা উপায় আছে, এই স্তরের সাধকদের আত্মবিচার। সাধারণ আত্মবিচার আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের সবারই আছে, যার জোরে এইরূপ পরিস্থিতিতে ভিষক বা মনস্তাত্ত্বিকের আশ্রয় নিই। কিন্তু এঁদের আচরণে মনে হয়, দৈবশক্তিতে কোনো এক গভীর অন্তদৃষ্টির জোরে এঁরা এইসব ভাবান্তরের একেবারে মূল তথ্যটিতে পোঁছে যান। নিশ্চিন্ত থাকেন, কখনো শিশু, কখনো বাতুল—'মা' যখন যেভাবে দেখতে চান। মনে হয় নাকি এই মাতৃনির্ভর চির-শৈশবই পরমহংস-চরিত্রের মূল উপাদান? মনে রাখতে হবে, এই মাতৃনির্ভরতা নিয়েই কঠিন কর্কট রোগে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত যে বাণীটি উদ্ধৃত করলাম, তার শেষাংশটি আরও রহস্যময়। একজন বাতুলের, এক শিশুর, এত বড় আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে আসে? এটা কি নিকসিত সত্য নয় যে, আজ বাংলায়, সর্ব ভারতে, ভারতের বাইরে, এই নগ্নগাত্র শিশুকল্প পুরুষই সর্বাধিক পূজিত?

এই গেল বাহ্যরূপের রহস্যাবরণ। এর পর তাঁর সমাধি-রূপ আছে। সেখানে পোঁছবার যোগ্যতা কে অর্জন করেছে?

এসব হল সত্যাসত্য বিচার-বিশ্লেষণের কথা। হয়ত তর্কাধীনই থেকে যাবে। কিন্তু একটি জায়গায় তিনি অবিসংবাদিত যুগপুরুষ হিসাবে থাকবেনই অমর হয়ে—সর্বধর্মসমন্বয়-মন্ত্রের ঋষি হয়ে। আমরা বারবার বহু মুখেই একথা শুনেছি; কিন্তু নির্বিচারে সব ধর্মকে নিজের জীবনে পরীক্ষিত করে, রূপায়িত করে, এত সুগভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে পূর্বে কেউ দিয়ে গেছেন এই মন্ত্র, এমন তো মনে হয় না।

মহাপুরুষরা জন্ম নেন নিজেদের জন্য নয়, জগদ্ধিতায়। সেখানে কে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করলেন, কে করলেন না—সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা, কে নিজেকে লুপ্ত, অর্ধলুপ্ত রেখেও ভগবানের কল্যাণদূত হিসাবে মানুষের মনে সু-প্রকট।

কথামৃত প্রসঙ্গ

প্রমথনাথ বিশী

কথামৃতের জনপ্রিয়তা আজও তুঙ্গে। এ-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে নূতন করে প্রমাণ পাওয়া গেল। ৫০ বর্ষ পূর্তিতে কপিরাইটের সীমানা শেষ হয়ে গেলে কথামৃতের বহুতর সংস্করণ বিভিন্ন প্রকাশক বার করেছেন।

এই জনপ্রিয়তার কী কারণ? প্রথম কারণ, বইখানার ভাষা। ভাষা-প্রসঙ্গে মনে

হয়েছে যে, যুধিষ্ঠিরের রথ যেমন মাটি স্পর্শ না করে শূন্যে চলত, কথামৃতও তেমনি যেন শূন্য দিয়ে চলছে। অধিকাংশ লেখকের কাছে ভাষা একটা আবরণ। তাতে বিষয়টা সবটা প্রকাশিত হয় না। কিছু অস্পষ্টতা, আর ছায়া থাকে। এ বইখানায় সেরূপ কোনো বাধা নাই। বক্তব্য ষোল আনা প্রকাশিত। রামকৃষ্ণদেব এক জায়গায় বলেছেন, মানুষের অহংবোধ ভগবৎ-উপলব্ধির অন্তরায়। কথামৃতের ভাষা প্রসঙ্গে একথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। যিনি 'কথক', তাঁর মনে অহংবোধ না থাকায়, তাঁর বক্তব্য যুধিষ্ঠিরের রথের মতো ভূমিস্পর্শ না করেই চলেছে। পাঠকের দৃষ্টি অনেক সময় ভাষার আবরণের দ্বারা ব্যাহত হয়। এখানে সে আবরণটারই অভাব। মনে হয়, রামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য শূন্য দিয়ে চলে এসে পাঠকের মনে প্রবেশ করেছে। New Testament-এ ভাষা সম্বন্ধে অনেকে একথা বলেছেন। সেসব বাণী যেন বক্তার মন থেকে বেরিয়ে ভূমি স্পর্শ না করে পাঠকের মনে এসে প্রবেশ করে।

কথামৃতের জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ, এর সার্থক উপমা প্রয়োগ। উপমা কালিদাসস্য বলা হয়ে থাকে। আরো বলা যেতে পারে উপমা রবীন্দ্রনাথস্য। তবে এঁদের উপরে রামকৃষ্ণদেবের জিত এইকারণে যে, তাঁদের উপমার ব্যাখ্যাতা আবশ্যক। কালিদাসের মল্লিনাথ প্রভৃতি আছেন। রবীন্দ্রকাব্যেরও ব্যাখ্যাতার অভাব নেই। কথামৃতের উপমাগুলি ব্যাখ্যাতার অপেক্ষা রাখে না। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের উপমার বস্তু সহজলভ্য বা সাধারণ পাঠকের সবসময়ের অভিজ্ঞতার বস্তু নয়। কথামৃতের উপমাগুলি চারিদিকের নিত্য পরিচিত বস্তু থেকে সংগৃহীত। পাঠকের তাদের সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়। অনেকদিনের পরিচয় হলেও কথনের গুণে নূতন-ভাবে চোখে প্রভাসিত হয়।

কথামৃতের আরেকটি গুণ—এর মধ্যে গ্রথিত প্যারাবলস্‌গুলি ; সেগুলোতেও এমন কিছু নেই যা পাঠকের বোধের অতীত। উদাহরণ তুলে দেখাতে গেলে কথামৃতের পাঁচটি খণ্ড উদ্ধার করে নিতে হয়। সে তো সম্ভব নয়। কাজেই জনপ্রিয়তার এই দুটি ইঙ্গিত, সর্বজনপরিচিত উপমা ও সর্বজনপরিচিত প্যারাবলস্‌, দিয়ে ক্ষান্ত হলাম।

কথামৃত পাঠের ফলশ্রুতি এই যে, যতক্ষণ পড়া যায় এবং তার পরে অনেকক্ষণ কোনো পাপচিন্তা মনে প্রবেশ করতে পারে না।

[শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের সঙ্গে ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম। তিনি যা বলেছিলেন তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হয়েছে।—শঙ্করীপ্রসাদ বসু]

শ্রীরামকৃষ্ণের যে-দিকটি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে তা হল—এই একজন মহাপুরুষ কখনো বুজরুকিতে ছিলেন না, অলৌকিকতা দেখান নি। কী অপূর্ব

কাহিনীটি তিনি বলেছেন—এক সাধু তপস্যা করতে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বহু বৎসর পরে নিজের বাড়িতে ফিরে তিনি ক্ষমতার বড়াই করতে লাগলেন—আমি জলের উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হতে পারি। কাজটা করে দেখিয়েও দিলেন। তাঁর ভাই এক পয়সা খরচা করে খেয়া নৌকায় নদী পার হয়ে বলল—তোমার ক্ষমতা তাহলে এক পয়সার? শ্রীরামকৃষ্ণ অলৌকিকতার সম্বন্ধে এই-যে বিদ্রূপ করলেন, এমন করার ক্ষমতা ধর্মের জগতের মানুষের আছে ভাবাই যায় না। ঠাকুরই কেবল এই এক পয়সার সাধুত্বের গল্প বলতে পারেন। ঠাকুরই বলতে পারেন—আমি মরছি গলার ব্যথায়, শালারা বলে ভগবান।

কথামৃত এখন বাংলার সবচেয়ে পপুলার বই। তা হয়েছে কারণ এর মতো হিউম্যান ভ্যালু আর কোথাও নেই। জীবনের যা ভিত্তি—তাই এর ভিত্তি। ঠাকুর প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাসী ছিলেন না, তাঁর সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্ন ছিল না। তাঁর মতো শিষ্যবৎসল কাউকে দেখা যায় নি। সকল মানুষের কাছে তাঁর আবেদন।

কথামৃতের উপমা, সে এক আশ্চর্য জিনিস। আমি উপমার গদীর মালিকের (রবীন্দ্রনাথের) কাছে বছরের পর বছর কাটিয়েছি। উপমার ঐশ্বর্য কাকে বলে জানি। উপমা আমার কাছে সহজে আসে। কিন্তু কথামৃতের উপমা আমাকে চমকে দেয়—এ কী কাণ্ড তিনি করে গেছেন! আগে জেনেছি, উপমা কালিদাসস্য, পরে বলেছি, উপমা রবীন্দ্রনাথস্য, এখন বলছি, উপমা রামকৃষ্ণস্য।

ঠাকুর আক্ষরিক অর্থে সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্যিকদের রচনায় পুরো ফ্রেস্‌নেস্‌ থাকে না, কারণ তাঁরা লেখায় মাজাঘষা করেন। সাহিত্য, খুব বড়ো সাহিত্যও, পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে ক্লান্তি লাগে। কিন্তু কথামৃত নিত্য নবীন, পুরনো নয় কখনো। আমিও ঈশারউডের মতো বলতে পারতুম—এ হল Eternal Now।

আর এর ভাষা।—ভাষা আছে বলে মনেই হয় না। একথা বিবেকানন্দের কিছু লেখা সম্বন্ধেও সত্য।

ঠাকুরের কথা কি বলব—মনে হয়, তিনি আমার চিরপুরাতন বন্ধু—My Eternal Friend, and the most intimate friend তাঁর কাছে সবকিছু খুলে বলা যায়, সব গোপন ব্যক্তিগত কথা। তাঁর কাছে সবকিছু কনফেস্‌ করা যায়। তিনি আমার সবকিছু দেখছেন, দেখেও ভালবাসছেন, তাঁকে কি লুকোবো? তাঁর কাছে প্রবেশাধিকার পায়নি এমন কেউ নেই। গিরিশকে তিনি ফিরিয়ে দেননি।

ঠাকুর সংসারকে মজার রসে রসিয়ে দেখতেন। তাঁর কাছে এলে মানুষ না হেসে পারত না। সকলে ফিরে যেত প্রসন্নতা নিয়ে। গভীর রসের সঙ্গে হাসির রসের মিলন—এ এক Rare Combination. আমরা গুরু বলতে বুঝি—তিনি ২৪ ঘণ্টার গুরুমশাই। আর আমার এই ঠাকুর ২৪ ঘণ্টার আপনজন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

সৈয়দ মুজতবা আলী

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তাঁরা স্বভাবতঃ এবং ঐতিহ্যবশতঃ ধর্মানুরাগী। তার কোনো বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না থাকলে সে তখন সবকিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যে-সব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তন-কালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোনো চর্চা ছিল না। বাংলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করেনি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোনো উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ।...

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণিজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হয়।...

রাজা রামমোহন খৃস্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, সেযুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে-বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমন কি অন্তরায়, সেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।...

রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাংলা ভাষাতে। পদ্য এসব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাংলা গদ্য নির্মাণ করে তারই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে, বাংলা গদ্য লেখা হয়নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাংলা গদ্য।...

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয় বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে-ক্রমে গণধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল। প্রমাণ-স্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্মমন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে

উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হবে, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের উন্নতি করতে পারেননি। এমন কি গীতার উল্লেখও আমি অল্প শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনিনি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত আহরণ করেননি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বার-বার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে-ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভেতরে ছিল না।... কিন্তু এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, হিন্দুধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় [ব্রাহ্মধর্মে] দীক্ষা নিয়েছেন, কিংবা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরীব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কিনা, এ বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তাহলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিত-জনকেও শেষপর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদ করতে হয়।

ঠিক এইসময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সবকিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে!...যার যেমন মাপকাঠি। স্যাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব—একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে?

তাই মাভৈঃ, যারা বলে আমাদের মতো পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের

মতো মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে। অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীন প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরী হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোনো জায়গায় টোল পড়েনি।

এঁর মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য খৃস্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গির। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য।' এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল। সময়মতো ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন-কি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের 'বেগের' প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন) আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গি সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি অস্বীকার করতেন না, কিন্তু যেখানে শুদ্ধমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার 'ছুঁৎবাই' রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিক্টোরীয় প্যুরিটানিজম্ থেকে—তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতেই লরেন্স, জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে দেবেন।

পরমহংস গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণ-ধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে পরমহংসদেব আসলে

বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থাভেদে একে ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সবকিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, 'কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারো নি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার স্তরে উঠতে পারবে না।' 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কি রকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না, কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষে বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি', 'তুমি', 'জগৎ'—এ সবের খবর থাকে না।"

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল, ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে। আর একটি কথা—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো, কিন্তু মতুয়ার (dogmatism) বুদ্ধি করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, এই হতে পারেন না। বলো, আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার ; আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন ; আমি জানি না, বুঝতে পারি না।

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বদা বর্জনীয়—এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে, কিন্তু প্রশ্ন, জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না ?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বার-বার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি 'মতুয়া' কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।···

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে-কোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—'মহতী বিনষ্টি' হয়—এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সেযুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন ? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সেযুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয়নি ? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে ?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের

অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেননি। তাই বার-বার দেখি, তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার-বার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে। বলছেন, কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কালট্-এ কনভার্ট' করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজনবিদিত—কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্তায় (*Per se*) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যাঁরা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর, তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে কতখানি কাজে লাগতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহু বার বলেছেন, 'কলিকালে-মানবের অন্নগতপ্রাণ।' এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণ-নীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে, অন্য কোনো চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নাই। তবু যাঁরা ধনে অনুরক্ত, তাঁরা বার-বার পরমহংসকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি ?'

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তাহলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে, জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখীর মতো, দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে, তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যেসব ব্রাহ্মভক্তের অর্থাভাব ছিল না, যারা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী, তাঁদের বার-বার বলেছেন—ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই একথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পোঁছতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রের মতো যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত, তাদের ক'জন বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী সে স্তরে পোঁছতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ-কথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি, তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোনো চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর—তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

যে পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশতঃ স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেরেছিলেন?'

এর উত্তরে বলবো, 'মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই।' এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষ জনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছিনোর পরও কোনো-কোনা মানুষ লোকহিতার্থে এ-সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ-শুকদেবাদি।' একথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এ-রকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এ-যাবৎ কেউ নির্মাণ করেননি।

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই। পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গির মতো পরে আল্লা-আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খৃস্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন, সে কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এলো কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস, চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমুলার দেখিয়েছেন, ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি গাহেন তখন তিনি বলেন, 'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।'

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই—'হে বরুণ, তুমিই বরুণ,

তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমূলার-এর নূতন নাম করেছিলেন, 'হেনোথেয়িজম্।'

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থাবরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা-আল্লা করেছেন তখন আল্লাই পরমাল্লা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোনো-কোনো শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সব কিছুর অবহেলা করেননি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ-যুগের হিন্দু সম্বন্ধে একথা হয়ত খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ-পন্থা কখনো গ্রাহ্য করেনি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান—ঋগ্বেদের এই বাণী—শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে। ['চতুরঙ্গ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

কথামৃতের কথায়

আশাপূর্ণা দেবী

মনে হয়েছিল, এ আর এমন কি! এতবার পড়া, এমন আকর্ষণীয় প্রিয় গ্রন্থ কথামৃত, তার সম্পর্কে কিছু একটু লিখে ফেলা, এই তো? খুবই তো সহজ, দু'-দিনেই হয়ে যাবে।

কিন্তু দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, হচ্ছে না। লিখতে গিয়ে দেখছি, যা নেহাৎ সহজ ভেবেছিলাম, তা মোটেই সহজ নয়। শক্ত করে তুলেছে নিজের মধ্যেই হঠাৎ জেগে-ওঠা প্রশ্নের কাঁটা।

'কথামৃত আমার কাছে একটি আকর্ষণীয় প্রিয় গ্রন্থ'—এ-কথা বলা কি আমার পক্ষে ধৃষ্টতা নয়? আমি কি একথা বলবার অধিকারী?

আমি কি কখনো ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাকুলতা অনুভব করেছি ? জিজ্ঞাসু হৃদয় নিয়ে, ঈশ্বরের স্বরূপ জানবার চেষ্টা করেছি, আর কথামৃতের অমৃতধারার মধ্যে তার সমাধান খুঁজে পেয়ে কৃতার্থবোধ করেছি ?

কাকে বলে নিশ্চলাভক্তি, কাকে বলে শুদ্ধাভক্তি, আর কেমন করে তা আসে, তা বোঝবার জন্যে অন্তরের মধ্যে কোনো প্রেরণা পেয়েছি ? অথবা ওই অমৃতবাণীর সাগরের মধ্যে আমাদের এই অতি সাধারণ গৃহীজীবনের জন্যে সহজ সরল ভাষায় সর্বশাস্ত্র মন্থন করা যে-অনন্ত উপদেশরাশি বিধৃত রয়েছে, সে উপদেশের অনুসরণ করবার সামান্যতম সাধনা করেছি ? সেই শিক্ষায় জীবনকে গড়ে তোলবার মানসে মনকে নির্মল, চিত্তকে অভিমান, অহমিকা, অসূয়াশূন্য করে তোলবার ইচ্ছেটুকুও মাত্র কখনো পোষণ করেছি ?

কোনো প্রশ্নেরই তো অনুকূল উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। কথামৃতে বহমান রসধারা তো এই দীর্ঘজীবনের শুকনো মাঠে-মাঠেই মারা গেছে। কিছুই তো গ্রহণ করতে পারিনি।

তবে ? তবে কেন প্রিয় ? কেন ভাল লাগে ?

তবে কি কথামৃতের মধ্যে যে-পরম সাহিত্যমূল্য রয়েছে, সেই বস্তুটিই আমায় বরাবর আকৃষ্ট করে এসেছে ?

কথামৃতের ছত্রে-ছত্রে যে-গভীর জীবনবোধের প্রকাশ, উপলব্ধির যে-ব্যঞ্জনাময় সঙ্কেত, উদার জীবনদর্শনের যে-সীমাহীন বিস্তার, অতুলনীয় তুলনাপ্রয়োগকৌশল, আর ছোট-ছোট গল্পকাহিনী পরিবেশনার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় মানবচরিত্রের যে-নিপুণ বিশ্লেষণ, এবং তার সঙ্গে সরস বাক্‌বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম প্রসাদগুণ—তা অবশ্যই উচ্চমানের সাহিত্যের দাবি রাখে। সর্বোপরি—বিশ্বাসের সততা—যা চিরায়ত সাহিত্যের মূলধন।

আপন হৃদয়সত্যকে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারার শক্তি, আপন বিশ্বাসকে অপরের বিশ্বাসের ভূমিতে স্থাপন করার দৃঢ়তা, জীবসত্তার মধ্যে শিবসত্তার উন্মোচন, এই গুলিই তো মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ, কথামৃত গ্রন্থে এইসব গুণগুলিই তো বর্তমান।

সেই সাহিত্যই স্রষ্টাকে অমরত্ব দান করে, যে-সাহিত্য পৃথিবীকে ভালবাসতে শেখায়। কথামৃতের মধ্যে তো সেই অফুরন্ত ভালবাসার শিক্ষা।

মনে হয়, আজ ঘরে-ঘরে গীতার মতো নিত্যপাঠ্য এই অমূল্য গ্রন্থখানি ভবিষ্য-কালের মূল্যায়নের কষ্টিপাথরে কেবলমাত্র মানবজীবনের পরমার্থ-নির্দেশক গ্রন্থ হিসেবেই নয়, চিরায়ত সাহিত্যগ্রন্থ হিসেবেও মূল্যায়িত হবে।

কথামৃতের শতবার্ষিকী সহস্র-সহস্র বৎসরের সূচনা মাত্র। বুদ্ধের বাণী, খৃস্টের বাণী তো আজো অম্লান। কথামৃত হাজার-হাজার বছর ধরে মানবজীবনকে আশ্রয় দেবে।

তবু বলব, কথামৃত—এই গুণগুলি ব্যতীতও আমার কাছে আরো কিছু, অধিক কিছু! কথামৃত দুঃখের দিনে, বেদনার দিনে, অস্থিরতার ক্ষণে, যেন একটি শান্ত সান্ত্বনা এনে দেয়। যেন মনের জন্যে মানসিক একটি আশ্রয় মজুত আছে, প্রয়োজনের সময় সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই হল।

অথবা শুধুই কথামৃত নয়, শ্রীশ্রীমা সারদামণির আর শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্যজীবনী এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অখণ্ড একটি আশ্রয়।

তবু এও জানি, একথা বলার যোগ্যতা আমার নেই। ভালো লাগে, শান্তি পাই, চাঞ্চল্যও দূর হয়, কিন্তু নির্দেশ-উপদেশগুলি গ্রহণ করতে পারি কই?

স্মৃতি হাতড়ালে—

কথামৃতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় অতি বাল্যে। আমার বইপাগল মার সংগ্রহ-ভাণ্ডারে ছিল তৎকালীন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের যত গ্রন্থাবলী। এবং বহুবিধ পত্রপত্রিকা। চালু-অচালু প্রায় সব। তবে মনে হয়, মলাটছেঁড়া বড়মাপের কোনো পুরনো পত্রিকার মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে লেখা এই কথামৃত কিছু-কিছু পড়ে থাকব। কারণ মেয়েও তো মায়ের মতোই পড়াপাগল। (স্কুল পাঠশালার বালাই তো ছিল না। অখণ্ড অবসরের সুযোগ—যা পাই তাই পড়া চলে। এমন কি মুদি-মশলার দোকানের ঠোঙাতেও যদি বাংলা হরফে কিছু ছাপা লেখা থাকে তো, ঠোঙাটিকে সাবধানে খুলে নিয়ে পড়ে ফেলে।)

একথা বলব না যে, সেই পত্রিকার (কোন্ পত্রিকা মনে নেই) পৃষ্ঠায় পড়ার সময় বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলাম। পড়েছি এইটুকু মনে আছে। যা পাই তাই পড়ি তো।

অতঃপর একসময় কথামৃত আস্তএকটি গ্রন্থ পড়ার সুযোগ হল, শ্বশুরবাড়িতে এক প্রতিবেশিনী মহিলার মাধ্যমে। যদিও তখন সেকালের নিয়মে নতুন বৌকে গুরুজনস্থানীয়া মহিলাদের সামনেও ঘোমটা দিতে হয়, গলার স্বর নামিয়ে কথা বলতে হয়, তবু তিনি একদা দুপুরে এসে হানা দিলেন দুতিন খানা বই হাতে নিয়ে। বললেন, বৌমা গো, চোখ থাকতে অন্ধ। একটু পড়ে শোনাও, শুনি।

বিয়ের সময়ই জানা হয়ে আছে, এবাড়ির নতুন বৌয়ের 'স্বরচিত' লেখা নাকি বইকাগজে ছাপা হয়, অতএব সে তো রীতিমত চক্ষুষ্মান। কাজেই চক্ষুষ্মান বৌকে নিজের পাঠযোগ্য বইটই রেখে দিয়ে সারা দুপুর পাঠের আসর খুলতে হয়। তবে —একটা মস্ত লাভ হয়, ফাঁকতালে বৌয়ের ঘোমটা কমে এবং গলার স্বর ওঠে। কারণ সে আসরে গুটি-গুটি অনেকগুলি মহিলারই সমাবেশ হয়, তাঁরাই উদারকণ্ঠে আদেশ দেন, 'আর একটু জোরে পড়ো বৌমা।' যতদূর মনে পড়ে, বইগুলির মধ্যে ছিল বোধহয় দু'তিন খণ্ড 'অমিয় নিমাই চরিত', একখানি কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী, আর একখানি কথামৃত। বোধহয় প্রথম খণ্ডই। মলাট ছেঁড়া, টাইটেল-

পেজও অন্তর্হিত।—নাম দেখেই ছেলেবেলার সেই কিছু খানিকটা পড়ার কথা মনে পড়ে যায়।

এই বইখানি দেখে কিছু কথা হয়। সমাগতারা সকলেই তো 'চোখ থাকতে অন্ধ নয়।' একজন বললেন, দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে নাকি তিনি এই পরমহংসের ঘর দেখেছেন। একজন বললেন, কোথায় নাকি তিনি 'পরমহংসের পরিবারকে' দেখেছেন। (তখন ওই ভাবেই বলতে শুনেছি।) আর বাড়ির একজন আত্মীয়া গুরুজন সগর্বে ঘোষণা করলেন, 'এই শ্রীম আমাদের স্বজাতি।' এমন কি শাখা-প্রশাখায় কিছু আত্মীয়তাও আবিষ্কার করলেন মনে হয়। হওয়া অসম্ভব নয়, গুপ্তদের সঙ্গে গুপ্তদের কিছু না কিছু যোগসূত্র থাকেই।

সে যাক, এত কথার পর প্রথমে কিন্তু 'অমিয় নিমাই চরিতই' ধরা হল। সে আসরে মাঝে-মাঝেই ধ্বনি উঠত, 'আহা! আহা! মধু! মধু!'

তা পাঠিকারও বেশ আকর্ষণ লেগে গিয়েছিল। 'দুপুরটা গেল' বলে আর আক্ষেপ আসত না।

'অমিয় নিমাই চরিতের' খন্ডগুলি সাঙ্গ হবার পর ধরা হয়েছিল কথামৃত। শুরু হতেই আকর্ষণ! শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, আর বিশেষ করে মা ভবতারিণীর মন্দির, আর মন্দিরসংলগ্ন পারিপার্শ্বিকতার নিখুঁত নিপুণ বর্ণনাটি যেন ছবির মতো লাগে।

জন্মগৃহ উত্তর কলকাতার প্রায় শেষপ্রান্তে শ্যামবাজার অঞ্চলে, ছেলেবেলায় মা বাবা ভাই বোন মিলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাওয়া হয়েছে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে, সে এক উত্তেজনাময় আনন্দের ভ্রমণ! (সে যুগে অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্যে কীই-বা আয়োজন ছিল?)

কথামৃতের সূচনায় লিখিত বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে তাই ছবিটি চোখের সামনে ফুটে উঠত। সেই প্রথম ঠাকুরের ঘরটি দেখে অতি বাল্যেও মনে হয়েছিল, যেন এইমাত্র ঘর ছেড়ে কোথাও উঠে গেছেন, এইমাত্র আসবেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘ দিনই তো সেই রকমই ছিল। মাঝে অবশ্য অনেক দিনই যাওয়া হয়নি। কিছুদিন আগে দেখলাম, সে ঘরের মেঝে মোজাইকে মোড়া। কেন জানি না, ঘরের এই উন্নতি দেখে হঠাৎ বুকটা যেন খাঁ-খাঁ করে উঠেছিল, মনে হয়েছিল মস্তবড় কী একটা হারিয়ে গেল। মেঝের মাঝামাঝি জায়গায় একটুখানি লম্বা দাগরাজী করা লাল সীমেন্টের সেই মেঝেটি খুঁড়ে তুলে ফেলার সময় কারো মনে কোনো ক্ষতিবোধ এল না? মনে হয়েছিল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদামণি, 'নরেন' আর অসংখ্য ভক্তবৃন্দের পদধূলিস্পর্শে ধন্য সেই সীমেন্টের চাপড়াগুলি কি ফেলে দেওয়া হয়েছে? কোথাও রেখে দেওয়া হয়নি?

যাক ও কথা! (বয়স হলেই বোধহয় ভাবপ্রবণতা বাড়ে)। সেই অনেকদিন আগের কথাই বলি—পাঠের আসর যখন বেশ জমজমাট, এবাড়ি ওবাড়ি থেকে

দুপুরের 'গ্রাবু' খেলার আড্ডা ভেঙে আরও দু'চারজন মহিলার আবির্ভাব ঘটছে, সহসাই একদিন সেই আসর ভঙ্গ হয়ে গেল। কারণ, গ্রন্থগুলির মালিকানী ভক্তিমতী সেই মহিলাটিকে হঠাৎ সে পাড়া থেকে চলে যেতে হল। ভাড়াটে বাড়ি, বদল হলো আর কি।

তিনি গেলেন, বইগুলিও তাঁর সঙ্গে চলে গেল, কথামৃত তখনো শেষ হয়নি।

শ্রোত্রীদের মধ্যে হায় হায়! 'আহা দুপুরটা একটু ভালয় যাচ্ছিল। কী সব জ্ঞান-গর্ভো কথা শুনছিলাম।'

তবে ওই পর্যন্তই। সেই পাঠের আসর চালু রাখার প্রেরণা বিশেষ কেউ অনুভব করলেন না!

এদিকে পাঠিকার মধ্যে তুমুল 'হায় হায়!' বইটা শেষ হল না। তাছাড়া মহিলা বলেছিলেন, যার কাছ থেকে বইটি এনেছিলেন, তার কাছে পরবতী আরো খণ্ড আছে।

এমন দাবি করব না যে, ধর্মকথার জন্যেই এত আগ্রহ আকুলতা। বইটা শেষ হল না, এটাই আক্ষেপের কারণ। তখনকার আমলে গেরস্থ ঘরের বৌ-টৌয়ের কোনো ব্যাপারেই ব্যাকুলতা প্রকাশের আইন ছিল না। এমন কি—মা-বাপের অসুখ করেছে শুনলেও নীরবে অপেক্ষা করতে হতো, ওপরওলাদের 'বিবেচনা'র উদারতা কতটা তা দেখতে।

তবে পাড়ার একটা লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, কিছুদিন চেষ্টা চালানোর চেষ্টা করলাম, সেখান থেকে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু বারে-বারে খোঁজ করিয়েও মিলল না। আর অস্বীকার করব না, ক্রমশঃ আগ্রহটাও কমতে-কমতে থেমে গেল। লাইব্রেরীতে গল্প উপন্যাসের তো অভাব নেই। তা ছাড়া—যদিও তখন নেহাতই 'শিশুসাথী', 'খোকাখুকু'র লেখিকা, তবু তার তাগাদা আছে—আছে মনের মধ্যেও তাগিদ।

সে যাক, সেই আমার কথামৃতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপর জীবনের অনেকখানি পথ পার হয়ে প্রথম দ্বিতীয় দুটি খণ্ড হাতে এল। বিশেষ একটি বিষণ্নতার দিনে একজন উপহার দিয়ে গেল। পড়লাম পরম আগ্রহে। জ্ঞানাবধি রবীন্দ্রনাথকেই জীবনের পরম আশ্রয় ভেবে এসেছি। দেখলাম, তেমন 'আশ্রয়' এখানেও বিদ্যমান।

পড়তে দারুণ ভালবাসি, পড়াই প্রাণ, তবু—বিধিবদ্ধভাবে নিয়ম করে কখনোই কিছু পড়বার সুযোগ ঘটেনি। না বা পড়ায়, না বা লেখায়। সাংসারিক জীবনের রোগ শোক সুখ দুঃখ, অভাব অসুবিধে, সবকিছুর মধ্যে থেকে এলোমেলো ভাবে লেখা, আর এলোমেলো ভাবে পড়া হয়েছে। আর লেখাটা বাড়তে-বাড়তে—'পড়া'টাকে প্রায় কোণঠাসা করে রেখেছে।

কত বইই পড়বো বলে সরিয়ে-সরিয়ে রাখি পড়ার জন্যে, আর সময় বার করা যায় না। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। তবু কোনো কিছুই 'নিত্যপাঠের'

অভ্যাস বজায় রাখতে পারা যায় না। একবার পড়ে শেষ করে ফেলার বস্তু তো নয় ?

'শেষ নাহি যার, শেষ তারে কে করবে ?'

তবু যখনই পড়ি সমান ভালো লাগে। যেন নতুন লাগে, নতুন করে ভালো লাগে। দুঃখের দিনে, বেদনার দিনে, ক্ষতির দিনে, শরণ নিতে ইচ্ছে হয়।

পড়তে-পড়তে কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে, সেইকালের পরিপ্রেক্ষিতে, মা ভবতারিণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণ ! গঙ্গার ধারের সেইঘরে বারান্দায় এক জীবন্ত বিগ্রহ—জিজ্ঞাসু শ্রোতাদের সামনে অনর্গল বর্ষণ করে চলেছেন, অমৃতময়ী কথার ধারা। উপলক্ষ হয়তো সেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা, লক্ষ্য তো অনন্ত কালের পৃথিবী।

শ্রীশ্রীঠাকুরেরর তো অনন্ত ভাব, অনন্ত বৈচিত্র্য, তবু কেন জানিনা মনে হয়—সেই কথামৃতবর্ষী মুখটি যেন একটু মধুর সূক্ষ্ম কৌতুক-হাস্যোদ্‌ভাসিত। যেন মানবচরিত্রের যাবতীয় দুর্বলতা তাঁর কাছে কৌতুকের বিষয়। কথার ধারাস্রোতের মধ্যেও মাঝে-মাঝেই ঝিলিক দিয়ে উঠছে সেই কৌতুকের কণা। ঝিলিক দিয়ে উঠছে—চোখের কোণায়, ঠোঁটের রেখায়। অথচ তার অন্তরালে রয়েছে গভীরতর বেদনার আভাস।

'লোক না পোক,' এই মন্তব্যটির মধ্যে যেমন রয়েছে মজার ভঙ্গি, তেমনি রয়েছে বেদনা। মানুষ শব্দটার প্রকৃত অর্থ যে, 'মান' সম্পর্কে 'হুঁশ' থাকা—এমন সহজ সরল ব্যাখ্যা আগে কবে শুনেছে লোকে ?

সকলের জন্যে, সর্বসাধারণের জন্যে, ঠাকুর আশ্চর্য সহজ ভাষায় দিয়ে গেছেন সর্ববিধ শিক্ষা, সর্বোত্তম শিক্ষা। কিন্তু আপাতসহজ এই কথাগুলি কি সত্যিই সহজ ? সেই আশ্চর্য সহজ কথাগুলিই তো আজ প্রবল প্রাণশক্তির জোরে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হতে চলেছে। দিনে-দিনে উন্মোচিত হচ্ছে তার সহজতার মোড়ক, উদ্ঘাটিত হচ্ছে গভীর ভিতরের গভীর অসীম অর্থ। মানবজীবনে যে-কোনো স্তরে, যে-কোনো অবস্থায়, আর যে-কোনো চিন্তায় যত প্রশ্ন উঠতে পারে—মনে হয় বোধহয় সেই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর আছে এর মধ্যে।

এই উদ্ঘাটন তো আরোই হতে থাকবে, যুগে-যুগে আসবেন নতুন ব্যাখ্যাকার, দেশে-দেশে অনূদিত হবে, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নয়, আগ্রহী মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনে। এযুগ হয়তো এখনো সমুদ্রের তীরে বসে ঝিনুক কুড়োচ্ছে মাত্র।

এসব কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতাই, কতটুকু জেনেছি, কতটুকু বুঝেছি ? পৃথিবীকেই বা কতটা জানি ? ঠাকুরের কথাতেই বলতে হয়—একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে ? একথা শুধু আমার নিজস্ব বিশ্বাসের ধারণা।

শ্রীরামকৃষ্ণ আমার কাছে বিশাল একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন। কে ইনি ? ছদ্মবেশী স্বয়ং 'তিনিই' ? সম্ভবামি যুগে-যুগের অঙ্গীকার পালনার্থে এ যুগের এই রূপ ?

তবে এ রূপটি বড় করুণাঘন। 'বিনাশে'র ব্যবস্থা নেই, শুধুই পরিত্রাণ। এই পরিত্রাণের মন্ত্র ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্যে সঞ্চিত থাকবে কাল থেকে কালান্তরে।

সমকাল কখনোই কোনো কিছুরই সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারে না, বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় বিভ্রান্ত হয়। বিতর্কের ঝড় ওঠে. অথবা ঔদাসীন্যের নিথরতা দেখা যায়। বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কারগুলিও যেমন. জ্ঞানের পরমাশ্চর্য আবির্ভাবও তেমন, গ্রহণ করতে সময় লাগে, বুঝতে সময় লাগে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের 'সময়সীমার' মধ্যে প্রবাহিত অসীম অপার 'কথামৃত সাগরের' অনেকখানিই অসঞ্চিত রয়ে গেছে. হারিয়ে গেছে অনেক অমূল্য বাণী।

পরম শ্রদ্ধেয় পরম ভক্ত শ্রীম আপন নামটুকু পর্যন্ত আড়ালে রেখে ঠাকুরের লীলার শেষের কটি বছরের অমূল্য 'কথা'গুলি লিপিবদ্ধ করে রেখে জগতের যে-উপকার করে গেছেন, তার জন্য তিনি চিরকাল নমস্য হয়ে থাকবেন। আক্ষেপ হয়, যদি তিনি আরো আগে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসতেন।

তবে আবার ঠাকুরের কথার মধ্যেই সব আক্ষেপের সমাধান। 'অমৃত কলসী-কলসী খেলেও যা, একফোঁটা খেলেও তা।'

অর্থাৎ ওই এক ফোঁটার মধ্যেই আছে অমরত্ব দানের শক্তি। অবশ্য খেতে হবে। ওই একফোঁটাটুকুও সত্যিকার নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমরা তো সব জ্ঞানপাপী। জানি, বুঝি, ইচ্ছেও আছে, তবু হয়েও ওঠে না। 'আমার জীবনে কথামৃত'—এই প্রশ্নটি চিন্তা করতে গিয়ে নতুন করে এই সত্যটির মুখোমুখি হতে হল। তবু বলি—কথামৃত আমার বড় প্রিয় গ্রন্থ।

সার্থকনামা কথামৃত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ছোটবেলাটা কেটেছিল কাশীতে। থাকতুম মিশ্রীপোখরায় লক্ষ্মীকুণ্ডতে, স্থানটা লাক্‌সা থেকে বেশী দূর নয়। এই লাক্‌সাতেই রামকৃষ্ণ মিশন 'হোম অফ সার্ভিস' (বা সেবাশ্রম, হাসপাতাল) এবং অদ্বৈত আশ্রম, সাধুদের মঠ। বন্ধুদের প্রভাবে আমার দাদারা ক্রমশ এই অদ্বৈত আশ্রমের সংস্পর্শে এসে পড়েছিলেন, সেইসঙ্গে আমিও।

সে-ই আমার ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

অবশ্যই শিশুমন (বা বালক মন) আকৃষ্ট হয় লোভে। আমার মতো বালখিল্য যারা তাদের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন গিরিজা-মহারাজ। মোটাসোটা, সদা প্রফুল্ল, স্নেহময় মানুষটি, যিনি সর্বদাই আমাদের জন্যে কিছু-না-কিছু খাদ্যবস্তুর সংগ্রহ

রাখতেন। কোনো পুজোর পর (কালীপুজো, দুর্গাপুজো প্রভৃতি, তা ছাড়া ভাণ্ডারা তো ছিলই, ঠাকুর মা স্বামীজীর জন্মতিথি এসবে আহার্যের আয়োজনও কম নয়) বহুদিন পর্যন্ত তাঁর ভাণ্ডারে যা নষ্ট হবে না এমন মিষ্টান্ন—বালুশাহী ধরনের—থাকত। তিনি খেতেন না, খেতাম আমরাই। এই গিরিজা-মহারাজ পরে নাকি কাশ্মীরে দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘদিনের কথা, অন্তত ৬৫ বছর আগের—তবু তাঁকে মনে আছে। বিশেষ মনে আছে কালীপুজোর রাত্রে স্নেহময়ী মায়ের মতো ঘুমে অচেতন ছেলেদের ঢুলে-ঢুলে মুখে প্রসাদ তুলে দেওয়া।

মনে আছে অধ্যক্ষ চন্দর মহারাজকে, মনে আছে অতি সুপুরুষ ও সুগায়ক নীরদ মহারাজকেও।

এই প্রসঙ্গে চন্দর মহারাজের একটি আশ্চর্য শক্তির কথা যদি বলি—খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে কি?

আমরা কাশী থেকে চলে আসি ১৯২২ সালে, তখন আমার ১৩ বছর বয়স। তারপর যদিও কাশী গেছি দু'এক দিনের জন্যে—সেবাশ্রমে কি অদ্বৈত আশ্রমে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কারণ প্রধান আকর্ষণ যে মানুষটি, তিনি তখন ওখান থেকে বদলি হয়ে গেছেন।

একেবারে গেলুম আমি আর সুমথবাবু—যেটা ১৯৩৭ সাল হবে; মানে ঠাকুরের মূর্তি এসে পেঁছেছে, তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কাপড়মোড়া অবস্থায় আছে। আমাদের পেঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হয়েছিল, কেউই তখন মঠে নেই বিশেষ। পুরনো ঠাকুরঘরে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে আসছি, নজরে পড়ল সেই আবছা অন্ধকারে চন্দর মহারাজ তাঁর অভ্যস্ত ইজিচেয়ারটিতে বসে আছেন, পাশে নিত্যসঙ্গী লাঠিটি।

অন্ধকার বেশ কিছুটা নেমেছে, তবু কেউ তখনও আলো জেবলে দেয় নি। আমি ওঁকে চিনতে পেরে (প্রধানত পরিবেশে) কাছে গিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি সেই ছায়াচ্ছন্ন আলোকেই কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে উঠলেন, 'তুমি ধ্যানেনের ভাই না?' ধ্যানেন আমার বড়দার নাম। অল্পবয়সে ১৫ বছর অনেকখানি সময়। চেহারার বহু পরিবর্তন ঘটে—সুতরাং এ চিনতে পারাটা প্রায় অলৌকিক শক্তির পরিচয়।

সাধুদের থেকে সাধুদের ইষ্টদেবের দিকে মন যাবে—এ স্বাভাবিক। তবু তখন জানতুম, তিনি বড় একজন সাধু, ওঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মঠ মিশন ও আশ্রম গড়ে তুলেছেন।

তিনি আর একটু কাছে এলেন, কথামৃতের নাম শুনলুম—২২-এর শেষে ও ২৩-এর গোড়ায়, যখন আমরা নারকেলডাঙ্গার ষষ্ঠীতলা রোডের এক ভাড়াবাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সে বাড়ি পছন্দ নয়, বদলাতে হবে বলে আমাকে কোনো

স্কুলে ভর্তি করা হল না। আগেও হয়নি—কারণ কলকাতায় কোনো ভালো বাড়ির অভাবে আমরা ৬ মাস আঁদুলে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেখানেও নানা অসুবিধা, বিশেষ দাদাদের যাতায়াতের।

অথচ আমারও পড়াশুনোর ক্ষতি বন্ধ করা দরকার। তাই তাঁরা ব্যবস্থা করলেন, এক শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে আমি পড়ে আসব, যে-শিক্ষকের নাম আশুবাবু (ঘোষ?)—তিনি ছিলেন মর্টন স্কুলের শিক্ষক। উক্ত মর্টন স্কুলেরই হেডমাস্টার ছিলেন শ্রীম বা মহেন্দ্র গুপ্ত মশাই।

এই খানেই আমার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ও কথামৃতের প্রথম পরিচয়। আশুবাবু পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে শ্রীম'র কথা তুলতেন। তিনি কি মহৎ কাজ করেছেন, জাতির কী পর্যন্ত উপকার, তা আজ অত কেউ না বুঝলেও পরে বুঝবে—এইসব কথা বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

সেসব আমার বোঝার কথা নয়। আমি তখনই গল্প উপন্যাস পড়ছি—বা গিলছি। তবু ঠাকুর যে একজন সত্যিকারের মহাপুরুষ, এই রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়েছিল।

এই আশুবাবুই মধ্যে-মধ্যে কথামৃত থেকে পড়ে শোনাতেন। বোধহয় বই নয়, কোনো একটা বাঁধানো খাতা থেকে পড়তেন। সব কথা না বুঝলেও চমৎকার উপমাগুলো বেশ ভাল লাগত এটা মনে আছে। আগে মনে হত, সাধুরা বুঝি সব সংস্কৃতে কথা বলেন, এখন দেখলাম, অতি সহজ কথায় সাধারণ মানুষের মতোই কথা বলেন কেউ-কেউ। তবু সে পরিচয়ও অতি সামান্য।

এর কিছু পরেই হাতে পড়েছিল শিশির পাবলিশিং হাউসের শিশুতোষ সিরিজের অন্তর্ভুক্ত (ছ'আনা দাম, ছ'/সাত ফর্মার ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী আকারের বই, বোর্ডে ফ্ল্যাশকাট বাঁধাই! কী দিনই ছিল!) গল্পে রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের আরও গল্প, প্রভৃতি চারখানি বই।

গল্পগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বহু গল্প মুখস্থ হয়ে গেছল। আমার বড়দাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, 'এসব কার লেখা? রামকৃষ্ণ কি নিজে লিখেছেন?' বড়দা বললেন, 'দূর! তিনি লিখতে পারতেন না। মুখে-মুখে উপদেশ দেবার সময় এইসব গল্প বলে গেছেন। বোধহয় এগুলো কথামৃত থেকে নেওয়া।'

তাও 'বোধহয়'। দাদাও পড়েন নি।

এর বহুদিন পরে, শরৎ-মহারাজের 'রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' হাতে পড়ে। তাতে বহুস্থানেই কথামৃতের উল্লেখ বা উদ্ধৃতি আছে। তখন মনে হয়েছে, এই বইখানা অবশ্যই পড়া দরকার। তবে কিনে পড়ার ক্ষমতা নেই, আর তখন কর্মযজ্ঞে নেমে পড়েছি—অবসরও কম।

আরও বেশ কিছুকাল পরে, বন্ধুবর ভুবনবাবুর শ্রীগুরু লাইব্রেরীতে বসে অল্প-অল্প করে ঐ বইয়ের খণ্ডগুলি পড়ি। বই কিনে সম্পূর্ণটা একসঙ্গে পড়ার

সুযোগ পাই আরও ঢের পরে, ষাটের কাছাকাছি পেঁাছে। তবে সেই বিচ্ছিন্ন পাঠেই যেমন মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম, এমন বোধহয় অন্য কোনো বই পড়েই হইনি। তখনই মনে হয়েছে, এর নাম সার্থক হয়েছে—সত্যই এ অমৃত। আসলে এই বই-ই যথার্থ মানুষের জীবনে গীতা বা বেদের মতোই অপরিহার্য, তেমনি কল্যাণকর।

কৃতজ্ঞতার ঋণ

সন্তোষকুমার ঘোষ

তিনি আমাদের হাতে রঙিন সেই চোঙটা ধরিয়ে দিতেন। ফোকরে চোখ রাখলেই রকমারি রং। পৃথিবীটা যে এত বর্ণময়, তা সেই বয়সে আমাদের চেতনায় ছিল না। শৈশবে চোখ খুলতে একটু দেরি লাগে।

সেই চোঙটাই কি ফিরে এল হাতে এই ঝুনো বয়সে, একটি 'পুঁথির' চেহারা নিয়ে? তখন আমার জীবনের একটা কঠিন সংকট। ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি, আর ভাবছি, জ্বালা জুড়োই কোথায়! এত যে বই গোগ্রাসে গিলেছি, গিলি, কই কোনও কাজে আসছে না তো! যুক্তির কচকচি, জ্ঞানের বড়াই, মনে হয় সব ছায়ার সঙ্গে লড়াই, শূন্যে আস্ফালন, তাতে সারবস্তু কিছু নেই।

বিশ্বাসী এক বন্ধুর শরণ নিলাম। বললাম, আপনি যে-শান্তি পেয়েছেন, তার কয়েক কণা আমাকে দিন। এক দানা চিনি। নইলে দাঁতে এই ধু-ধু প্রান্তরে খালি যে কিচকিচ বালি। তাঁর কাছে পেলাম ঃ কথামৃত, নতুন করে। তখন খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত এই বইটিকে কী বলব? আমার বেশি বয়সের ক্যালিডোস্কোপ? অবান্তর বলেই এতক্ষণ উল্লেখ করিনি, সেই কালটা আমার যৌবনের বিকাল।

নতুন করে পড়তে গিয়ে দেখি, আরে একী, পাতায়-পাতায় শান্তিজল, সবটা মিলে স্নিগ্ধ শীতল স্নান। যার তুলনা পেয়েছি গীতাঞ্জলি পর্যায়ের কিছু-কিছু গানে, আর কোথাও না।

কথামৃত। সেই ভাষায় লেখা বই, যা আমার নয়। এখন আর নয়, এই লেখাটার তো নয়ই। পশ্চিম বাংলার লৌকিক-মৌখিক ভাষা লোপ পেয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, স্মরণীয় তাঁরা বরণীয় তাঁরা, কিন্তু এই অঞ্চলের বাগ্‌ধারা তাঁদের লিপিচাতুর্যে, তৎসাম্যের প্রাবল্যে, কবে ভেসে গেছে। পরবর্তীকালে তারাশঙ্করে, বা বিভূতিভূষণে স্থানিক বাক্‌রীতির ছাপ-ছোপ কিছু-কিছু মেলে, কিন্তু সংরক্ষণের স্থায়ী সুঠাম কাজ কথামৃততেই প্রথমে। (হুতোম শ্রেণীর ফুচকা রচনা এই হিসাবের বাইরে)। এই গ্রন্থের আধ্যাত্মিক

আবেদন হয়তো সবার কাছে নয়, কিন্তু সাহিত্যমূল্যে উত্তরকালের সকলের। কেননা বাগ্‌ধারা হল একটা ভাষার প্রাণ, বাকি যা, তা গঠন, নির্মাণ।

সাংবাদিক বিচারেও বইটি বিস্ময়। রেকর্ডার নেই, শর্টহ্যান্ড না, অথচ অধ্যবসায়ী এক ব্যক্তি (যিনি স্বনামের চেয়ে শ্রীম, মণি, মাস্টার ইত্যাদি ছদ্মনামে প্রচ্ছন্ন থাকতেই ভালবাসেন) ঠাকুরের সব কথা বিশ্বস্ত টুকে রাখছেন। গস্‌পেল-এর সঙ্গে তুলনা হয় বটে, কিন্তু আমার মতে এর প্রামাণিকতা 'সুসমাচার'-সম্পদের চেয়ে বেশি। কেননা, প্রত্যক্ষ সহচরেরা, বিশেষত স্বামীজী বলেছেন, 'ব্রাভো'। সর্বোপরি শ্রীশ্রীমা বলছেন, যেন 'তাঁহার কথাই' শুনছেন। এই সার্টিফিকেটের পর আর কথা নেই। নিছক সাংবাদিক রচনা হিসাবেও শত বর্ষ আগেকার কীর্তিটি একালের অনেক জারনালিস্টিক ভ্যানিটিকে চুপ্‌সে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একেবারে 'দূর শালা' সুদ্ধ উৎকলনের সাহস আর ক'জনের হত?

ঠাকুরের কবিত্ব, তাঁর পরমত্ব, পরবর্তীকালে যা কিছু নিয়ে আলোড়ন হয়েছে, তার মূল খনি ওই কথামৃত। শ্রীম লিখে রাখলেন, তাই তো রামকৃষ্ণ-বচন হয়ে গেল উৎকীর্ণ প্রস্তরশাসন, যা পর্বতবৎ স্থির ও কঠিন, আবার সমুদ্রের মতো দোলায়-দোলায় আন্দোলিত। যেন তখন ঘটেনি, ওই গত শতকের আশির দশকে নয়, বলছেন 'এখন।' এইটি আবিষ্কার করে ঈশারউড বলেন Now—এই একটি শব্দই সমুদয় কথার লক্ষণ। ওই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে ঠাকুরের শরীররক্ষাও মিথ্যা মনে হয়। তিনি যাননি, আছেন, নিত্যবর্তমান অন্তরে-অন্তরে। সেই মন্দিরের গর্ভগৃহে কথামৃত একটি অনির্বাণ দীপালোক।

শাস্ত্র কী? কারও বাইবেল, কারও কোরাণ; হিন্দুরা না জেনেই বলে, বেদ। আসলে মূল বেদ হল—আদি আগন্তুক মানুষদের আদিম আর্তি, বিস্ময়, বেদনা, বাসনা। ব্রহ্মের ধারণা এসেছে বেদান্ত বা ঔপনিষদিক যুগে, যত দূর জানি। সেই উপনিষদ-সমূহেরও সারাৎসার ভগবদগীতা। কিন্তু গীতা তো সংস্কৃত—সকলের অধিগম্য নয়, সেহেতু বুদ্ধ-বাণী প্রচার করতে হয় পালিতে। বহুজনের কাছেই যদি না পৌঁছনো গেল, তবে বহুজনের হিতে লাগবে কেমন করে? ঠাকুরের আপাত-সরল বাণী বোধ্য করে তাকে তুলে সসম্ভ্রমে রাখা—সহজ ছিল না। যিনি নিজের বুকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'এখানেই তিনি', আবার 'মা তুই কোথায়' বলে কেঁদে আকুল হন, তাঁকে কোনও পাত্রে ধরা অসম্ভব। মনিজম্‌, ডুয়ালিজম্‌ ইত্যাদি কোনও ইজম্‌-এর ভাঁড়েই কুলোবে না। সেকালের মনীষীরা কূট তর্কের অরণ্যে দিশাহারা, অথচ প্রচলিত অর্থে নামমাত্র শিক্ষিত একটি পূজারী ব্রাহ্মণ একটি উপমায় সাকার-নিরাকারের তর্ক নিরস্ত করে বন থেকে বেরিয়ে আসেন। সাকার ঈশ্বর? যেন জল। ছোঁয়া যায়। নিরাকার রূপ হল বাতাস। আছে যে ঘর জুড়ে সেটা সর্বদা টের পাই না, কিন্তু হাওয়া বন্ধ হলেই রুদ্ধশ্বাস। মর্মে-মর্মে বুঝি—ছিল।

এমন কত উপমা। লৌকিক, সহজপাচ্য, দেশি। ঠাকুর বলেছেন, ব্রহ্ম কখনও

উচ্ছিষ্ট হন না। উচ্ছিষ্ট করা যায় না যে ঠাকুরকেও, স্বাদে নয়, বর্ণে নয়, গন্ধে নয়—শ্রীম'র স্টেনোগ্রাফিকে হার-মানানো কীর্তিটি না থাকলে আমরা কি জানতে পারতাম? তাই বেদ নয়, গীতা নয়, আমাকে একটিমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থের নাম যদি করতে বলা হয়, আমি বিনা দ্বিধায় বলব, মানুষ যদি অমৃতের পুত্র হয়, তবে সেই বইয়ের নাম কথামৃত।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান, কাশীরাম দাস বলেছেন। কথামৃতে পাই আরও কিছু বেশি—মহামানবের কথা। সাধ্য কী যে, এর মূল্যায়ন করি? নিজেই বুঝে উঠতে পারি না যে, আমার অধীত, অনধীত অজস্র গ্রন্থের মধ্যে এই পুণ্য-পুস্তকটি কিসের সমান? তবে মনে পড়ে, সেই যে একটা আত্মিক সংকটে এই বইটি প্লুত রক্তকে অশ্রুশুভ্র করে দেয়, লাল রং হয় শাদা—কৃতজ্ঞতার সেই স্মৃতি, সেই চোখের জলের ঋণ কি মোছা যায়? সেই অমৃতস্বাদের অনুভূতি মোছবার নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

বিমল কর

বছর পঁচিশ হয়ে গেল প্রায়। আটান্ন-উনষাট সাল হবে হয়ত। তখন বয়স-দোষে চেষ্টা করেছিলাম এমন কিছু বই পড়ার যা মাথায় ঢুকলে আখেরে কিছু উন্নতি হতে পারত। এই সময়, ব্রিটিশ-লেখক কলিন উইলসান-এর একটি বই হাতে আসে, 'দি আউটসাইডার'। এই বইটির নাম তখন মুখে-মুখে শোনা যেত। খোদ সাহেবদের দেশে যত নামকরা পত্র-পত্রিকা রয়েছে, রয়েছেন যত বিজ্ঞ সমালোচক, সকলেই এই বইটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছিলেন বলে শুনেছি। একটি সমালোচনার কথা আমার অস্পষ্ট মনে আছে। তাতে বলা হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন উল্লেখযোগ্য বই আর বোধহয় প্রকাশ পায়নি।

আমাদের দেশেও 'দি আউটসাইডার'-এর যশখ্যাতি এসে পেঁছৈছিল। অনেকেই এই বই পড়েছেন। বইটি নিয়ে আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। ওই বইয়ের প্রায় শেষের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে। প্রধানত আলোচনার ভিত্তি হল—মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ জীবনী সম্পর্কে একটি বই, এবং মাদ্রাজ থেকেই প্রকাশিত অন্য একটি বই যার নাম ছিল 'দি গসপেল অব রামকৃষ্ণ'।

সত্যি বলতে কি, কলিন উইলসানের অমন ডাকসাইটে বইয়ের মধ্যে, যেখানে জগতের অতিবিখ্যাত ব্যক্তিদের, প্রধানত যাঁরা কবি, লেখক, শিল্পী, দার্শনিক তাঁদের মানসিকতা, দৃষ্টি ও দর্শন নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা রয়েছে, এবং সকলেই সেই পাশ্চাত্ত্য জগতের, তখন হঠাৎ ভারতের শ্রীরামকৃষ্ণ কেন?

একথা ঠিক, বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে উৎসাহের অন্ত নেই। অনেক গুণিজন এই মানুষটির জীবন ও ধর্মচিন্তা নিয়ে ভালো-ভালো বইও লিখেছেন। তবু এ-যুগের এক ছোকরা, তেজী লেখক, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে উৎসাহ বোধ করলেন কেন?

ব্যক্তিগতভাবে আমি রীতিমত অবাক হয়েছিলাম। অবশ্য পরে মনে হয়েছিল, লেখক শ্রীরামকৃষ্ণকে যে-দৃষ্টিতে বিচার করতে চেয়েছেন—তার প্রয়োজন ছিল।

বইটি আমার হাতের কাছে নেই। কিন্তু তার কয়েকটি লাইন আমি পুরনো খাতায় টুকে রেখেছিলাম। এখানে সেই কথাগুলি লিখে দিই:

"Ramakrishna at the opposite extreme, could plunge to a depth of imaginative ecstasy which few Westerners have ever known, except those mediaeval saints who also were able to give up their minds as he did to contemplation and serenity."

ব্যক্তিগতভাবে আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অজ্ঞ। যে-পরিবারে মানুষ সেই পরিবারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে গুরুজনরা পড়াশোনা করতেন। আমার নিজের কোনো উৎসাহ ছিল না। হয়ত পাপীতাপী বলে। মাঝে-মাঝে কথামৃত পড়ার চেষ্টা করেছি এইমাত্র।

আজ যে-বয়সে এসে পেঁৗছেছি সেই বয়সে অনেকেই শুনেছি ধর্মগ্রন্থ আশ্রয় করেন। এখন পর্যন্ত আমি করিনি। তবে 'কথামৃত' পড়ার চেষ্টা করি মাঝে-মাঝে।

কেন করি?

একটি বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। যে-জীবন আমরা যাপন করি, যে-পরিবেশ নিয়ে বেঁচে আছি, যে-ধরনের বিক্ষিপ্ত মানসিকতা আমাদের, যতরকম অবিশ্বাস আর আত্মনিগ্রহ নিয়ে দিন কাটাচ্ছি, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সরল, স্নিগ্ধ, হৃদয় থেকে উঠে-আসা গভীর বিশ্বাসের কথাগুলি অনুভব করার শক্তি আমাদের নেই। শুধুই চোখ দিয়ে পড়া যায় যে-লেখা সে-লেখা চোখের বাইরে হারিয়ে যায়! যে-লেখা মনে ঠাঁই পায় তার মূল্যই স্থায়ী। 'কথামৃত' বা রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অন্যান্য বই পড়েও যদি ভণ্ড, মিথ্যাচারী, হৃদয়হীন থাকতে হয় তবে সে-পড়ার মূল্য কী! শ্রীরামকৃষ্ণের তৎকালীন ভক্তজনের যে হৃদয়-পরিবর্তন ঘটেছিল—আমাদের তা ঘটে না কেন?

কথামৃতের একজায়গায় আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন:

"...যাদের কোনো ঠাকুরের দিকে মন নেই তাদের কথা আলাদা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে—বারোয়ারীতে এমন মূর্তিও করে। ও-সব লোক সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে, আর চিৎকার করে বন্ধুদের বলে, 'আর ও-সব কি দেখছিস, এদিকে আয়, এদিকে আয়'।"

আমাদের স্বভাব হয়ে গিয়েছে 'ও-সব' লোকের মতন। ঝাঁটা মারাই দেখছি। অন্য পাশে যা ভাল পড়ে থাকল—তা আর দেখি কই!

অনুভূতির কথা চার আনা বোঝানো যায়, বারো আনা যায় না। কথামৃতে যা আছে, আমার ধারণায়, তা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির কথা। বারো আনা রয়েছে জলের তলায়, সাদামাটা কথা হলেও। সেই কথা যাঁরা বুঝতে পারেন তাঁরা যথার্থই ধন্য হবেন। সাধারণে তা পারে বলে আমার মনে হয় না।

কথামৃত পাঠ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রায় আশি বছর ধরে বাংলাভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত একটি অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ। সবচেয়ে জনপ্রিয় বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। অথচ এখানি সাহিত্য গ্রন্থ নয়। বইটি যাঁকে নিয়ে লেখা তিনি বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না, যিনি লিখেছেন তাঁরও অন্য কোনো সাহিত্যকর্ম পরিচিত নয়। এই বই কোনো বিশেষ ধর্ম-মতাবলম্বীদের অবশ্যপাঠ্য পবিত্র গ্রন্থও নয়। বিখ্যাত সাধু শ্রীরামকৃষ্ণের এখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থও নয়। ইংরেজিতে যাকে হেগিওগ্রাফি বলে এখানি অনেকটা সে-জাতীয়। এই ধরনের বইয়ের এতখানি জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কোনো সম্প্রদায় গড়ে যান নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা একটি গুরুবাদী সম্প্রদায় ও মিশন গড়ে তোলেন। সেখানকার দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা যতই হোক না কেন, তার বাইরেও অগণিত অদীক্ষিত জনসাধারণ রামকৃষ্ণদেবকে শ্রদ্ধা করে। ইদানীংকালের অনেক ধর্মগুরু সম্পর্কেই অনেকের মধ্যে মতভেদ আছে, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণকেই নিতান্ত ছিদ্রান্বেষীরা ছাড়া আর সকলেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করে। এমনকি নাস্তিকের পক্ষেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হতে কোনো বাধা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর প্রতি যার কোনো আগ্রহ নেই অথচ সাহিত্যশিল্পে আগ্রহ আছে এমন মানুষও কথামৃত বইটিতে এক বিপুল রসের ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে যাবে।

আমি অল্প বয়স থেকেই ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কে আমার কখনো তেমন আগ্রহ জাগেনি। ছাত্র বয়সে পরীক্ষার আগেও আমি কোনো ঠাকুর-দেবতার দরজায় মাথা ঠুকিনি। এখন প্রায় মধ্য বয়সে পৌঁছে এবং দু-একবার মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়েও, ধর্মকে আঁকড়ে ধরার কোনো কারণ আমার জীবনে এখনো ঘটেনি। বরং এখন বেশ ভালো ভাবেই জানি যে, ঈশ্বর বা কোনো

সর্বনিয়ন্ত্রী শক্তির অস্তিত্ব থাকার কল্পনাটাই হাস্যকর। যারা ভগবানে বিশ্বাসী, তারা সবাই এক ধরনের পাগল। অবশ্য পৃথিবীতে নানা ধরনের পাগল থাকার প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে।

কৈশোরের শেষে, যখন হাতের কাছে যে-কোনো বই দেখলেই প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়তুম, সেই বয়সে আমি কথামৃত প্রথম পড়ি। নিশ্চয়ই ভালো লেগেছিল, নইলে প্রথম খণ্ড পড়বার পর বাকি খণ্ডগুলি সংগ্রহ করার আগ্রহ জাগত না। প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে পড়িনি, যেখানে বেশ লম্বা-লম্বা অনুচ্ছেদে জ্ঞানের কথা আছে, সেসব জায়গা বাদ দিয়ে গেছি। বলাই বাহুল্য, ভক্তিরস নয়, যে-কারণে বইটি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তা সাহিত্যরস। এই গ্রন্থের নায়ককেও ভালোবেসে ফেলেছিলুম, কারণ, ইনি শুকনো সন্ন্যাসী ছিলেন না, ইনি রীতিমতো রসে-বসে থাকতেন।

মাস্টারমশাই ওরফে শ্রীম ওরফে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাহিত্যজীবী ছিলেন না কিন্তু সাহিত্য রচনাকৌশল তাঁর ভালোই জানা ছিল। তাঁর বইটি দিনলিপির ফর্মে লেখা হলেও, হুবহু দিনলিপি যে নয়, তাও একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারা যায়। সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনও অবিকল লিখিত হয় নি। অথচ আগাগোড়া সে-রকম একটা ধারণা বজায় রাখা হয়েছে। এটা একটা সাহিত্যেরই কৌশল। বর্ণনাও উত্তম পুরুষে নয়, সেইজন্য নিজের সম্পর্কে অতিকথনের আশঙ্কা নেই। এবং প্রথম থেকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বা মহাপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। মোটামুটি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যুবক, যিনি মূর্তিপুজায় বিশ্বাস করেন না, তিনি খানিকটা খোলা মন নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের এক সাধুকে দেখতে গেছেন, প্রথমদিনের সাক্ষাৎকারের এই বিবরণটির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি একালের অধিকাংশ পাঠককে তাঁর সঙ্গী করে নিয়েছেন। শ্রীম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন বৃন্দে দাসীর কাছ থেকে। এই সাধুটি খুব বইটই পড়েন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বৃন্দে জানায় যে, 'আর বাবা বইটই! সব ওঁর মুখে।' প্রথম দিনে এই সাধুটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, তবু এঁর ব্যক্তিত্বের মাধুর্য শ্রীম-কে স্পর্শ করে, এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরিবেশটি তাঁর ভালো লাগে। এবং সেই টানে তিনি আবার ফিরে আসেন। দ্বিতীয় দিনের আলাপ-আলোচনায় দক্ষিণেশ্বরের সেই সাধু এমন সব মোক্ষম উপমার পর উপমা দিয়ে যান যে, পাঠক হিসেবে আমরাও অভিভূত হয়ে যাই। সংসারে থেকেও ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ দেবার প্রসঙ্গে পরপর এলো—বড় মানুষের বাড়ির দাসীর কথা, জলচর কচ্ছপ আর ডাঙায় তার ডিমের কথা, কাঁঠাল ভাঙার সময় হাতে তেল মাখার কথা, দই থেকে মাখন তোলার কথা। প্রত্যেকখানি উপমাই অতিশয় দেশজ। কোনো ধর্ম-আলোচনায় এরকম কথা আমরা আগে কখনো শুনিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের পর্যবেক্ষণ-শক্তি ছিল অসাধারণ, সেইসঙ্গে ছিল রসবোধ, এই দুটি মিলিয়ে তিনি জীবনের এমন-

টুকরো-টুকরো ছবি তুলে ধরতেন যা প্রত্যেকটিই মর্মস্পর্শী। শ্রীম'র কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর গুরুর বাক্‌ভঙ্গিটি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলে মানুষটিকেও আমাদের সামনে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক তথাকথিত গ্রাম্য ও অশালীন শব্দ ব্যবহার করতেন। তাঁর জীবনীকার যদি তাঁর কথকতা থেকে সেইসব শব্দ বাদ দিতেন তবে তা হতো অমার্জনীয় অপরাধ।

পরে এই বইখানি অনেকবার পড়েছি। যখনই হাতের কাছে পেয়েছি, পড়তে শুরু করলেই চোখ আটকে গেছে, শেষ না করে পারিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও বাণীতে আমার হৃদয়ের অবশ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তবে একজন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আমার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বইটিতে গত শতাব্দীর অনেক মানুষকেও বেশ অন্তরঙ্গভাবে পাওয়া যায়। অবশ্য এই গ্রন্থের আদ্যন্তিক ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কোথাও কোথাও সন্দেহ জাগে, শোনা কথার ওপর নির্ভর করে যে-সব সাক্ষাৎকারের কথা আছে, তার সবকিছু বোধহয় সঠিক নয়। পরিণত বয়সের সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হয়, বইটিতে আগাগোড়া ভারসাম্য রক্ষিত হয় নি, পুনরুক্তি প্রচুর এবং, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মদের লেকচার দেওয়ার বিরুদ্ধে বারবার বললেও নিজেও কোথাও-কোথাও লম্বা-লম্বা লেকচার দিয়েছেন। কিংবা ওভাবে হয়তো লেকচারের ভঙ্গিতে তিনি বলেন নি, লেখার খুঁত হয়েছে।

তাহলেও, বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে যারা কৌতূহলী তাদের এ বই পড়তেই হবে। শুধু একালে নয়, আগামী কালেও।

কথামৃত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কথামৃত এমনই এক আকর গ্রন্থ যা কারও ভালোমন্দ মন্তব্যের মুখাপেক্ষী নয়। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত এইগ্রন্থটি কালের সমস্ত উপলকে ব্যথিত করে আজও বহমান। তার জোর, তার ভিত এমন এক স্বচ্ছ, বাস্তব ও সত্য জীবনবোধের ওপর যা মানুষ বহু আয়াসেও অর্জন করতে পারে না। মানুষ যা পারে না স্বয়ং ভগবান্ তা পারেন। কথামৃত আমার কাছে এক অপার বিস্ময়ের বস্তু। শ্রীম ভগীরথের মতো স্বর্গের ধারাকে মুক্তি দিয়েছেন মর্ত্যের মানুষকে উদ্ধার করতে।

কিন্তু সমস্যা তো সদ্‌গ্রন্থ নিয়ে নয়। সমস্যা মানুষকে নিয়ে। কথামৃত নিয়ে যে-হুজুগে দেশ সরগরম সেই হুজুগের মূলে যদি একটু ভক্তি বা ধর্মকে জানার ইচ্ছা থাকত, যদি থাকত ভগবানের প্রতি আগ্রহ, তাহলে আমাদের দুঃখ ঘোচার একটা আশা জাগত মনে।

কিন্তু তা তো নয়। কথামৃত তার অমৃত পরিবেশন করে চলেছে, আমরা প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষেরা খুঁড়ে চলেছি স্বীয় সমাধি। কথামৃত আমাদের কাছে বুঝি-বা বচন হয়েই থেকে গেল।

তবু আশা করি, কোথাও কোনো বারুদের স্তূপ তৈরী আছে। কথামৃতের একটি স্ফুলিঙ্গই সেখানে যথেষ্ট। সেই আত্ম-আবিষ্কারের বিস্ফোরণ যদি ঘটে তবে এত কষ্ট করে দেহধারণ করে তাঁর আসা সার্থক হবে। কত কষ্ট পেয়েছেন ঠাকুর নরদেহে, সব কষ্টের অবসান ঘটবে। ঠাকুর তৃপ্ত হবেন।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ।

কথামৃত এক ধ্রুপদী সাহিত্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

একশো বছর ধরে কথামৃত লক্ষ-লক্ষ বাংলাভাষীর আদর কাড়ছে এবং সাম্প্রতকালে ব্যবসায়-স্বার্থের তাগিদ থাকলেও নতুন করে হিড়িক তুলতে পেরেছে, এর কারণ আমি অন্যদিক থেকে ভেবেছি। এ বই তো বেদ-বাইবেল-কোরান-ত্রিপিটকের মতো আদতে মূল ধর্মগ্রন্থ নয়। নয় কাব্য কিংবা রম্য উপন্যাস। যদি বলি, এক বিরাট সাধকপুরুষের জীবনী এ বই, এবং সেই সাধকপুরুষের প্রতি লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভক্তির অন্ত নেই—তাহলেও কথাটা অর্ধসত্য হবে। ভারতে সাধকপুরুষদের সংখ্যা সামান্য নয়, এবং তাঁদের প্রতি ভক্তিমান মানুষেরও কমতি নেই। অথচ তাঁদের নিয়ে লেখা আর কোন্ বই এমন করে শতাব্দী পেরিয়ে ধ্রুপদী মহিমায় উত্তীর্ণ হতে পারছে!

সেদিন নতুন করে কথামৃত পড়তে গিয়ে এসব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। এ বইয়ের ভেতরে আসলে ধ্রুপদী সাহিত্যের শক্তিমত্তা শুধু ফুটে রয়েছে, তাই নয়—সমকালীন সাহিত্যের রীতি-প্রকরণও অবিকল প্রতিবিম্বিত। এ যেন তথাকথিত চিত্রোপন্যাস—একাধারে চলচ্চিত্র আর উপন্যাস, দৃশ্যকাব্য আর কাব্যের আশ্চর্য সমাহার। দেখা আর পড়া দুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। চোখ দিয়ে দেখি, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি। শ্রীম'র প্রতি বিস্ময়-শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে।

দক্ষ চিত্রকরের মতো তিনি সেই সাধকপুরুষের জীবনের ঘণ্টায়-ঘণ্টায় মিনিটে-মিনিটে একটি করে অনবদ্য স্কেচ এঁকেছেন। সংলাপ রেকর্ড করেছেন নিপুণ যন্ত্রীর প্রযুক্তি-কৌশলে, কলমের ডগায়। এ যেন মহাভারতের সঞ্জয়ের কথাবার্তা—কালগত ব্যবধানে আমরা যখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রে পরিণত। আমাদের মনের চোখে ভেসে উঠছে টিভি-পর্দার দৃশ্যের মতো পরমহংসদেবের ছবি, তাঁর বাণী, তাঁর লঘুগুরু পরিহাস, জটিল ধর্মতত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা। আমরা পৌঁছে যাচ্ছি—উনিশ শতকের

রহস্যময় এক পীঠস্থানে—যেখান থেকে উচ্চারিত হচ্ছে জীবনের বহু সরল সত্য; ধর্মের রূপ প্রকাশিত হচ্ছে মানবধর্মে ; গৃহীর ধূসর অবয়বে ঝলকিত হচ্ছেন সন্ন্যাসী ; এবং সন্ন্যাসীর জ্যোতির ভেতর গৃহীর বলিষ্ঠ আদল ফুটে উঠছে। এ যেন বজ্রগর্ভ কালো মেঘের আনাগোনা। শ্রীম-র কৃতিত্ব এখানেই।

একশো সাতচল্লিশ বছর আগে রামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ তাঁর বাণীকে প্রাতিষ্ঠানিক সংহতিবদ্ধ করে গেছেন। যীশুখৃস্টের বাণী থেকে পল যেমন চার্চের মাধ্যমে খৃস্টধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক সংহতিবদ্ধ করেছিলেন, ঠিক তেমনি। কিন্তু আমার ধারণা, প্রকৃত রামকৃষ্ণদেব—যিনি তত্ত্বের বাইরেকার রক্ত-মাংসের মানুষ এবং আদর্শ গৃহীপুরুষ—তাঁকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে পাব না, পাব কথামৃতে। বস্তুত এই এক আশ্চর্য বই, যা পড়তে গিয়ে মনে হয়, যেন সেই পবিত্র পুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। বিশ্ব ব্যাপারের জটিল রহস্যময় প্রেক্ষাপটের সামনে শ্রীম আমাদের পৌঁছে দিতে পেরেছেন। তাই বইটি পড়তে-পড়তে বারবার প্রশ্ন ওঠে নিজের কাছে, কী এই বিশ্ব, কী এই জীবন—ঋগ্বেদের সেই আকুল প্রশ্ন :

কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎকো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ।

(১ : ১৬৪ : ৪)

প্রথম জাতককে কে দেখেছিল, যখন অস্থিহীন অস্তিত্ব অস্থিকে ধারণ করল ? মাটি থেকে প্রাণ ও শোণিতের উদ্ভব। কিন্তু আত্মার উদ্ভব কোথা থেকে ? কোনো পণ্ডিত এর জবাব দিতে পারবেন ?

কিন্তু এ তো দার্শনিক প্রসঙ্গ। কথামৃতের প্রকৃত সাফল্য হয়তো এটাই যে তার ভেতর আমরা একটা সময়কেও ডিটেলস্-এ দেখতে পাই। তাই এ বই একাধারে ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শন।

কথামৃত সম্বন্ধে কথামৃতকার

কবিতা সিংহ

কথামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সারা বিশ্বের মনীষীদের মতামত আজ আমাদের জানা। কিন্তু স্বয়ং কথামৃতকার শ্রীম কথামৃতকে কি চোখে দেখতেন, কথামৃত যে তাঁর কতখানি ছিল, এবং কথামৃতের ভবিষ্যতের নতুন চেহারা সম্বন্ধে তিনি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন তাই নিয়েই এই আলোচনা। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি

মঙ্গলবার, দক্ষিণ কলকাতার গদাধর আশ্রম থেকে ফেরার পথে, শ্রীম ভুলক্রমে কালীঘাটের ট্রামে কথামৃতের একটি ডায়েরী ফেলে আসেন। দুদিন বাদে ডায়েরীটা আবার ফিরে আসে তাঁর কাছে। তখন তিনি বলেছিলেন—'দুদিন কি শোক গেছে! পুত্রশোকেরও অধিক। ভাগবত মানেই কথামৃত।'

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীমর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দেখা হয়। পূর্ণ পাঁচটি বছরও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করতে পারেন নি। প্রথম পরিচয় থেকেই নিজস্ব রীতিতে তিনি এই মহাসাক্ষাৎকারের ডায়েরী রেখেছিলেন। সেই সাতাশ বছর বয়স থেকে ৭৮ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর ধ্যান জ্ঞান চিন্তা এবং প্রতিদিনের জীবন-যাপন ছিল রামকৃষ্ণময় কথামৃতে মাখা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মেধাবী ছাত্র এবং মহান শিক্ষক সারাজীবন ধরে লিখলেন কেবল একটিই মহাগ্রন্থ, যার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। আর কিছু নয়। অবশ্য তিনি এই মহাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদও করেছিলেন। স্বামীজীর শিষ্যা জোসেফিন ম্যাকলাউড বলেছিলেন—

"I request Mr. M to translate *Kathamrita* himself, because he speaks and writes brilliant English. After Swamiji I do not hear anybody speaking such good English.'

কথামৃত পড়তে-পড়তে, তার অসাধারণ আঙ্গিক এবং সাহিত্যের প্রসাদগুণ আস্বাদ করতে-করতে তাই পাঠকের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে, এমন সোনার কলম যাঁর তিনি কেন আর কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি? এর উত্তর পাই, শ্রীমর-ই আর একটি উক্তিতে—'এ কি মানুষের কাজ? উনিই যন্ত্র বানিয়ে লেখালেন, জীবনে আনালেন, আর আপন কাজ করালেন।'

ঠোঁটে একটি আঙুল, স্কুলের মধ্যে সামান্য অবসর পেলে আত্মমগ্ন একা একা ঘুরছেন, আর কথামৃতের কথা ভাবছেন। কথামৃতের যে-আঙ্গিক তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তা হ'ল নাটকের আঙ্গিক। সঙ্গে রয়েছে দলিলের মতো বাস্তব বিবরণী, দিন-ক্ষণ সব। কারণ শ্রীম চাইতেন, পাঠক কথামৃতের এক-একটি পাতা পড়বেন আর মনের মঞ্চে তার পুনরাভিনয়ের দ্বারা লেখকের মতো প্রত্যক্ষদর্শীর রস আস্বাদ করবেন।

কথামৃতের অডিও-ভিস্যুয়াল সম্ভাবনাও তিনি জানতেন। তাই অডিও সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—শোনা বা পড়া, এ দুইই শ্রবণের অন্তর্গত। ভিস্যুয়াল সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—আমার বহুদিনের ইচ্ছে, তাঁর জীবনের ঘটনা নিয়ে কেউ ছবি আঁকে। ছবিতে কথামৃত হয়। এখন আছে বর্ণরূপী কথামৃত।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে শ্রীম'র দেহাবসান হয়। অসহ্য নিউরালজিয়ার যন্ত্রণা নিয়েও, তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও, কথামৃত রচনা করে গেছেন। রচনার সময়ে তিনি সংযমে থাকতেন। কেবল ধর্ম বা সত্য, নীতি বা মনুষ্যত্বের কথাই নয়,

কথামৃত আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগ্রন্থেরও অন্যতম। কত মানুষের প্রেরণা আর মুক্তির স্থল।

শ্রীম বলেছেন, মিউজিক, পেইন্টিং এ্যাণ্ড পোয়েট্রি—এই তিনটে দিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়। এই তিনটেই ফাইন আর্টস। স্কালপচারও আর একটি। ওতেও হয়। ঠাকুরের মুখে শুনেছি, নবীন ভাস্কর সারাদিনে একবার বেলা তিনটেয় হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন। অত সংযত হয়ে, অত তপস্যা করে, তবেই দক্ষিণেশ্বরের মা কালীকে বানিয়েছেন। তাইতো অত জীবন্ত। যে বানাবে তার মন ঐ দৈবভাবে একেবারে মিলে যাবে, তবে হাত দিয়ে ঐ ভাব পাথরে ফুটে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের নির্মাণও ঠিক ওই ভাবে—একটি মানুষের সারা জীবনের সাধনায়, সংযমে—তাই কি কথামৃত ভবতারিণীর মতো জীবন্ত—ভাগবতের মতো অনন্ত!

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সংকট অর্থনৈতিক কি দৈহিক বিপর্যয় নয়, সবচেয়ে বড় সংকট হল আধ্যাত্মিক বিপর্যয়। ইংরেজীতে বললে আরও পরিব্যাপ্ত শোনাবে, স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিস। প্রাচুর্যে জীবন হারিয়ে যায়, দারিদ্র্য সয়ে যায়। জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন খুবই কম। অন্যদিকে রোগশূন্য, যন্ত্রণাশূন্য দেহ হতে পারে না। দেহও এক যন্ত্র ; সুতরাং যান্ত্রিক গোলযোগ থাকবেই। বাড়ির যেমন খাজনা, ট্যাক্স, দেহের মাশুল তেমনি জরা, ব্যাধি। দৈহিক উৎপাতও সহ্য করা যায়, গাছ থাকলেই যেমন পাখি থাকবে, বাঁদর আসবে।

কিন্তু আত্মিক অবয়বে যখন ফাটল ধরে, মন যখন হেলে পড়ে, কি শূন্য হয়ে যায়, তখন মানুষের আহার, নিদ্রা, মৈথুন হয়ত থাকে, গতি থাকে, অভ্যাস থাকে, মানুষ থাকে না। লক্ষ্যহীন অবস্থান। দিন আসে, দিন যায়, বয়স বেড়ে চলে। মৃত্যু এসে একদিন ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়। অবশিষ্ট আর কিছুই পড়ে থাকে না। ছিল আর নেই, এর মাঝে জীবনের যে-উপত্যকা, সেখানে ক'দিনের জন্যে অর্থহীন বিচরণ।

লক্ষ্য মানুষের বাইরে নেই, আছে ভেতরে। আমরা যাকে জাগ্রত অবস্থা বলি, সেও এক ধরনের নিদ্রা। নিদ্রিত মানুষকে অভ্যাসই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অভ্যাসের জগৎ প্রকৃত জগৎ নয়। সুদীর্ঘ এক স্বপ্ন। স্বপ্নেই জন্ম, স্বপ্নেই সংসার সাজানো, হাসি, কান্না, মৃত্যু। বোধে জাগ্রত হয়ে বোধি না হলে, মায়ার টানা-পোড়েনের

আবরণ থেকে, মিথ্যার ঊর্ণনাভ-নিঃসৃত জাল থেকে, মুক্তির আশা নেই। মুক্তির অপর নাম জীবন।

শঙ্কর বলছেন, দৃশ্যং সর্বমনাত্মা স্যাদ্‌দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ। দৃশ্যমান প্রপঞ্চ সমস্তই অনাত্মা, মায়া। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের দ্রষ্টা, তাঁহাকেই বিবেকী পুরুষের আত্মা বলিয়া জানিবে। শঙ্কর আরও বললেন, পথ্যাচর্পটবিরচিতকন্থঃ পুণ্যাপুণ্য-বিবর্জিত পন্থঃ। নাহং নত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে! পথপতিত জীর্ণ বসনখণ্ড দ্বারা কন্থা প্রস্তুত করিয়া ধারণপূর্বক পাপপুণ্যবর্জিত পথে গমন করো। দেখ, কি আমি, কি তুমি, কি এই লোক, কেহই কিছু নহে, সকলই অলীক।

আকাশের ঈশানকোণে সামান্য একটু মেঘ যেমন ধীরে-ধীরে আকাশ ছেয়ে ফেলে, ধীর বাতাস যেমন ক্রমে ঝড়ের চেহারা নেয়, বৈরাগ্যেরও ঠিক সেই একই ধরন। একটু-একটু করে মনের আকাশ ছেয়ে ফেলে, যেন অজগরের গ্রাস। প্রমোদে মন ঢেলেও তখন প্রাণ ভরে না। আনো সখি বীণা আনো, প্রাণ খুলে করো গান, নাচো সবে মিলি ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে। তবু সেই একই আক্ষেপ, প্রাণ কেন ভরে না? আর তখনই মনে পড়ে যায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা,

"আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে যাকে 'আমি আমি' করছ, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার করো—তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে, তুমি কিছু নও। তোমার কোনো উপাধি নেই।"

'এটা সোনা, এটা পেতল—এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা—এর নাম জ্ঞান।'

এই উক্তির পাশে শঙ্করকে রাখি,

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দন বনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমা,
গাঙ্গ্যং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী,
সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥

জীব! তুমি পরব্রহ্মকে একবার প্রত্যক্ষ করো, দেখবে সমস্ত জগৎসংসার নন্দন-বন, সব বৃক্ষই তখন কল্পতরু, সমস্ত জল তোমার কাছে গঙ্গোদক, সব কর্মই তখন পুণ্যকর্ম, সব কথাই যেন দেববাক্য, ভূমণ্ডলের সব স্থানই পুণ্যধাম বারাণসী, যেখানেই অবস্থান করো না কেন, সে অবস্থান আনন্দপ্রদ।

ঠাকুর বলছেন, খই যখন ভাজা হয় দু'চারটে খই খোলা থেকে টপটপ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মতো, গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোলার উপর যেসব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মতো হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মতো দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাকলে একটু গায়ে লালচে দাগ হতে পারে।

সংসারী লোকদের যদি বলো যে, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্যে গৌর নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল'। প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেত। হরিনাম-সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারত যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই, 'যুবতী মেয়ে' কিনা পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কিনা—ধুলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

নিতাই কোনও রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ির কার্নিসের ওপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হল, ও তার ফলও হল।

তুমি কাঙ্গাল বেশে এসেছ হরি কাঙ্গালে করুণা করিতে হে,
প্রেম বিতরিতে মরুসম চিতে, পতিত জনে তারিতে হে ॥
রামকৃষ্ণ নামে অমিয় ঢালা, হেরিলে ও-রূপ জুড়ায় জ্বালা,
(তব) চরণতলে পরাণ সঁপিলে, ভাবনা পালায় দূরেতে হে ॥
করি তব কথা অমৃত পান, জাগিয়া উঠিছে অবশ প্রাণ,
হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, তোমার মধুর নামেতে হে ॥

সেই অবতারপুরুষ তাঁর লীলা সংবরণ করে দীর্ঘ সময়ের পারে চলে গেছেন। সেই ভক্তমণ্ডলীও আর নেই। জড়বাদ, দেহবাদ, ধীরে-ধীরে তার ছায়া বিস্তার করে চলেছে। পড়ে আছে কয়েকখণ্ড বই, আমাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ, যে-গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় ঠাকুর জীবিত, স্থির হয়ে আছে সেই সময়।

"সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতাল বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথীবক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে-করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ-মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল। সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে।"

১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। শ্রীম ঠাকুরকে দর্শনের জন্যে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। প্রথম দর্শন। "সিধু বলিলেন, 'এটি রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা। অনেক অতিথি কাঙ্গাল আসে'।"

রাসমণির সেই দেবালয় আজ পুণ্য পীঠস্থান। সেদিনের মতো অল্পবিস্তর সবই আছে, নেই কেবল সেই প্রাণপুরুষ, নেই সেই সময়। সে মানুষও আর নেই। এ যুগ হল বিষয় আর বিষয়ীর। এ যুগের ঈশ্বর হলেন, কেরিয়ার। বিষয়ী মানুষ সম্পর্কে ঠাকুর বলতেন, "হাজার লেকচার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু করতে

পারবে না। পাথরের দেয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম করে আসে কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো।"

ভাবপ্রবণ মানুষ কথামৃতের পাতায় সেই সময়কে এখনও খুঁজে পাবেন। শতাব্দী পারের কুসুমগন্ধবাহী বাতাস তাঁর গায়ে এসে লাগবে। দক্ষিণপ্রান্তের নহবতের সুরও শুনতে পাবেন। ঠাকুরের কক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবেন, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের ওপর বসিয়া আছেন। ঘরে একঘর লোক,··· একটি ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র।"

সময়, বেলা তিনটে কি চারটে। দিনটি হয়ত রবিবার। তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে সেই পুণ্যকক্ষে এখনও উপবেশন করা যায়। অসংখ্য ভক্ত বসে আছেন চৌকি ঘিরে। ঠাকুর এখনও বসে আছেন সহাস্যমুখে। মাস্টারের সে একই পশ্ন :

মাস্টার—ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে-মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নাম গুণগান, বস্তু-বিচার; এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মাস্টার—কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে; টাকার জন্যে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।

ঠাকুর গান ধরলেন—

ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে ॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তিচন্দন মিশাইয়া (মার), পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও ॥

গান থেমে গেল। ঠাকুর বলতে লাগলেন, ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।

এমন সময় কেউ হয়ত ঘরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। কে ইনি? নিরঞ্জন হতে পারেন। "ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিত লোচনে সস্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, 'তুই এসেছিস'।"

মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখো, এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা

পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী—এসব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দেখছ না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ।"

রাসমণির দেবালয়ে আজও রাত নামে ধীরে-ধীরে। "ভক্তরা একে-একে বিদায় নিতে থাকেন। মাস্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয়, মন মুগ্ধ হইয়াছে; বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান। খুঁজিতে-খুঁজিতে দেখিলেন, মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জ্বলিতেছে, ক্ষীণ আলোক।"

সময়ের পথে হাঁটতে-হাঁটতে শতাব্দীর পারে চলে এসেছি, তবু অতীত যেন স্তব্ধ হয়ে আছে—নাটমন্দিরে, অবলুপ্ত পঞ্চবটীতে, বেলতলায়। সাধনার ইতিহাস সহজে মোছে না। পীঠস্থানে সবই থেকে যায়। সময় সেখানে স্থির।

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past.

সেই মন নিয়ে সেই দৃষ্টিতে তাকালে আজও আমরা দেখতে পাব—'ঠাকুর সেই ক্ষীণালোক-মধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী—নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছেন। আত্মারাম সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে। অনপেক্ষ। সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ। নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শতাব্দীর একটি আকর গ্রন্থ

নিমাইসাধন বসু

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বড় আক্ষেপ ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও ভালো জীবনী লেখা হয়নি। তিনি রামকৃষ্ণ-ভক্ত ও অনুরাগীদের অনুরোধ করেছিলেন, সব অলৌকিক ঘটনা বাদ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনচরিত লিখতে। আপাতদৃষ্টিতে সোজা হলেও প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণের মতো একজন মানুষের জীবনী লেখা ছিল অতি দুঃসাধ্য কাজ। বিশ্বসাহিত্যে খুব কম লেখকই সার্থক জীবনীকার হয়েছেন। দেশে-

বিদেশে আজ পর্যন্ত যত জীবনীসাহিত্য রচিত হয়েছে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল শ্রীমবা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। কথামৃতের কিছু অংশ পড়ে বিবেকানন্দ শ্রীমকে লক্ষ ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক জায়গায় ধরেছেন। দুঃখের কথা, খুব কম লোকেই তাঁকে বোঝে।" এ হল ১৮৮৯ সালের কথা। তার সাত বছর আগে (২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮২) বরাহনগরে এ-বাগানে ও-বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সঙ্গে থেকে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন। দেখে মনে হয়েছিল, "আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।" এই সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার, ভক্তের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে, ঐতিহাসিকের কাছে। এই সাক্ষাৎকারের ফলেই শুরু হয়েছিল ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ কথামৃতের উপাদান সংগ্রহ। শ্রীম রামকৃষ্ণের কাছে বসে যেদিন যা দেখতেন বা তাঁর মুখে যা শুনতেন, সেইদিনই তার দৈনন্দিন বিবরণ ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। ফলে রামকৃষ্ণ কথামৃত শুধু সর্বোচ্চ ধর্মসাহিত্য বা জীবনীসাহিত্যই হয়ে ওঠেনি, একটি যুগপুরুষ ও ঐতিহাসিক যুগের আকর গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।

কথামৃত প্রচলিত অর্থে জীবনী নয়। একেবারে সূচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র ছাড়া সমগ্র গ্রন্থটি তাঁর শেষ জীবনের কয়েক বছরের কিছুদিনের বিবরণ ও বাণীর সঙ্কলন বলা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথামৃতের অসাধারণ গুরুত্ব ও মহত্ত্বের কারণ, যাঁকে নিয়ে এই গ্রন্থ লেখা হয়েছে, এবং যিনি লিখেছেন, উভয়েরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যিক মনীষী অলডাস হাক্সলি কথামৃত প্রসঙ্গে বলেছেন—শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে জিনিয়াস অত্যন্ত বিরল ব্যাপার—আরও বিরল ঐ জিনিয়াসের সাক্ষাৎ সংবাদ-লেখক এবং বিবরণ-লেখক। হেনরি জিমার শ্রীম'র গ্রন্থটিকে সম্মোহক কথাচিত্র বলে বর্ণনা করেছেন। টমাস মান কথামৃত পড়ে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলেন এবং অভিজ্ঞতার বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই মনীষীরা কেউই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বা ভক্ত ছিলেন না। তাছাড়া তাঁরা কথামৃতের অনুবাদ পড়েছিলেন মাত্র। মূল রচনার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পাননি। কিন্তু কথামৃত কতখানি সার্থক ও কতখানি তথ্য এবং সত্যনিষ্ঠ তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষী স্বয়ং শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীম'কে আশীর্বাদ জানিয়ে শ্রীমা বলেছিলেন—"তোমার নিকট যে-সমস্ত তাঁহার কথা আছে, তাহা সবই সত্য। আমি একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল যে তিনি এ সমস্ত কথা বলিতেছেন।" বিবেকানন্দ শুধু মুগ্ধ ও অভিভূত হননি। রচনার মৌলিকতা ও মাধুর্য দেখে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিশ্চয় শ্রীম-র সঙ্গে রয়েছেন।

কথামৃতের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক মূল্য বুঝতে হলে বিবেকানন্দের আর একটি উক্তি মনে রাখা প্রয়োজন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী থেকে তাঁর

বাণীর ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এর কারণ, স্বামীজী মনে করতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও পথের সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছিল তাঁরই নিজের জীবনে। রামকৃষ্ণের শিক্ষা ও উপদেশ, অনিন্দ্যসুন্দর মুক্তার মতো গল্পগুলি—শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিভ্রান্ত মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছিল ও প্রকৃত সত্যের পথনির্দেশ করেছিল। ভিন্নধর্মাবলম্বী মানুষও তাই ছুটে আসত তাঁর কাছে। গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে ধর্ম ও দেবত্বের বাস্তব রূপায়ণ দেখেছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের দিন থেকেই শ্রীম এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলে দিনলিপি লিখেছিলেন।

শ্রীম এমন সার্থক হয়েছিলেন কেন ? এর প্রধান কারণ হল তিনি তাঁর গ্রন্থে কোথাও নিজেকে প্রাধান্য দেননি। প্রাধান্য দেননি বললেও ভুল বলা হবে। তিনি প্রায় অনুপস্থিত। অথচ প্রতিটি দিনের বর্ণনায়, প্রতিটি চরিত্র বা ঘটনা-চিত্রণে, তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, সাহিত্যশৈলী, ও চিন্তাশীল মনের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। দক্ষ ফটোগ্রাফারের মতো তিনি জানতেন কিভাবে ভালো ছবি তুলতে হয়। শিক্ষা, মানবিকতা, প্রেম ও শুদ্ধাভক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। রামকৃষ্ণের বাণী ও লোকশিক্ষার ব্যাখ্যাকার না হয়ে তিনি বাহক হতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "যার কাঁচা ভক্তি সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি (Silver Nitrate) মাখানো থাকে, তাহলে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না।—একটু সরে গেলেই, যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ।" মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের—ঈশ্বর ও গুরুর প্রতি পাকা ভক্তি ছিল। তাঁর মনের কাঁচে ভক্তির কালি মাখানো ছিল বলেই রামকৃষ্ণের দিব্যজীবন ও বাণী এভাবে ফুটে উঠেছিল। আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রীম'র। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষায়-তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা কৃতী। এনট্রান্সে দ্বিতীয়, এফ এ-তে পঞ্চম এবং বি-এ পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় হয়েছিলেন। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গভীর পড়াশোনা ও অনুরাগ ছিল। কথামৃতের প্রতি পাতায় এই শিক্ষা ও মননের ছাপ রয়েছে। অথচ অতি সাধারণ পাঠককেও তা কোনও সময়ে ভীত বা বিভ্রান্ত করে না।

বোধহয় প্রথম দিনেই মহেন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত বিশেষ প্রতিভা শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে ধরা পড়েছিল। তাই সস্নেহে তিনি কোথায় থাকেন, কি করেন, জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন "আবার এসো"। দ্বিতীয় দিনে যখন জেনেছিলেন যে, মাস্টারের বিবাহ হয়ে গিয়েছে ও ছেলে আছে, তখন আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন—"যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে, ছেলে হয়ে গেছে।" তারপরই সস্নেহে বলেন, "তোমার লক্ষণ ভাল ছিল।" হয়ত গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ না করলে তিনি ধর্মজীবনের সর্বোচ্চ মানে পৌঁছতে পারতেন। কিন্তু কথামৃতের লক্ষ-লক্ষ পাঠক ও উনিশ শতকের ধর্ম, সমাজ ও

সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতাদের পক্ষে তা বোধহয় ক্ষতিকর হত। সন্ন্যাসী শ্রীম'র পক্ষে কথামৃত এভাবে লেখা হয়ত সম্ভব হত না। কেননা কথামৃত মূলত সংসারী মানুষের জন্য লেখা। রামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের কাছে এই বই প্রকৃতই অমৃতের মতো। শ্রীম নিজে গৃহী ছিলেন বলেই এমনভাবে রামকৃষ্ণের বাণী ও দিব্যজীবনের গভীর তাৎপর্য অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও এই গুরু দায়িত্বভার দিয়েছিলেন তাঁকে। রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে কেউ-কেউ (যেমন শিবানন্দ) তাঁর কথার নোট নেবার চেষ্টা করলে ঠাকুর নিষেধ করতেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু এর কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—"বাণীর লেখক গণেশকে তিনি আগেই চিনে রেখে-ছিলেন, যেমন চিনেছিলেন বাহক দেবপক্ষী গরুড়কে বিবেকানন্দের মধ্যে।" স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীম'কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, "এখন বুঝতে পারছি কেন আমরা কেউ তাঁর জীবনী লেখার চেষ্টা করিনি—ও-কাজটা আপনার জন্যই ছিল।" কিন্তু পূর্বেই বলেছি, প্রচলিত অর্থে কথামৃতকে রামকৃষ্ণের পূর্ণ জীবনচরিত বলা যায় না। অথচ অন্য কোনও গ্রন্থে আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ এমনভাবে মূর্ত কাছের মানুষ হয়ে ওঠেননি। কথামৃত পড়ার সময় মনে হয়, সহাস্য স্নেহ ও করুণাময় মানুষটির একান্ত সান্নিধ্যে বসে তাঁর কথা শুনছি, তাঁকে প্রত্যক্ষ করছি। শ্রীম'র গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেও রামকৃষ্ণের বাণী সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ মানুষটি ও কথামৃতের মধ্যে এমন নিবিড় যোগসূত্র কেউ করতে পারেননি। চরিত্র চিত্রণে শ্রীম যে দুর্লভ ক্ষমতা দেখিয়েছেন, যেভাবে একটি ঐতিহাসিক পুরুষ ও ভাবধারার ছবি এঁকেছেন তা যে-কোনও সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিকের বিমুগ্ধ ঈর্ষার কারণ।

আমেরিকান লেখক পল ব্রানটন শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নাস্তিক কিভাবে আধ্যাত্মিক প্রভাবে আসবে। উত্তরে শ্রীম বলেছিলেন, "জেনে বা না জেনে যেভাবেই লঙ্কা চিবানো হোক মুখ জ্বলে যাবেই।' এই কথাটিকেই অন্যভাবে বলা যায় যে, অমৃত পান করলে মানুষ মৃত্যুঞ্জয় হবেই। এই মৃত্যুঞ্জয় মানে কিন্তু শারীরিক মৃত্যুঞ্জয় নয়। যীশু থেকে রামকৃষ্ণ কেউই সেই অর্থে মৃত্যুকে জয় করেন নি। কিন্তু কথামৃতের প্রকৃত স্বাদ পেলে এবং অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলে, সাধারণ মানুষ হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, দম্ভ, লোভ, মিথ্যাচার প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের অহর্নিশ মৃত্যুকে জয় করতে পারে। শ্রীম সেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন ও অকৃপণভাবে তা অন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। মাস্টারমশাই শ্রীম'কে বলা হত 'ছেলেধরা মাস্টার।' রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের কেউ-কেউ তাঁর ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর অনেক ছাত্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আজও অসংখ্য মানুষ তাঁর কথামৃত পড়ে এই ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। মাস্টারমশাই এই অর্থে এখনও ছেলেধরার কাজ করে যাচ্ছেন।

সমাজচিত্র অঙ্কন শ্রীম'র উদ্দেশ্য ছিল না। তবুও সমকালীন যুগের সামাজিক

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে কথামৃতে। ব্রাহ্ম-সমাজ এবং কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাদের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তথ্য রয়েছে কথামৃতে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষদের চরিত্রের নানান দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে শ্রীম'র গ্রন্থে। তারও ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। কিন্তু কথামৃতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব হল এক বিস্ময়কর অনন্য ঐতিহাসিক যুগপুরুষের জীবনের মৌলিক উপাদানরূপে। সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং শ্রীম'র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান। সর্বোচ্চ ধর্মীয়, সামাজিক ও সাহিত্য-আদর্শের এমন সমন্বয় কথামৃত ছাড়া অন্য কোনও গ্রন্থে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

প্রথম দর্শনে শ্রীম'র মনে হয়েছিল, "বই না পড়লে কি মানুষ মহৎ হয় ? কি আশ্চর্য, আবার আসতে ইচ্ছা করছে।" একইভাবে কথামৃতের লক্ষ-লক্ষ পাঠকের প্রথমবার পড়ে বিস্ময় জাগে, মনে হয়, কি আশ্চর্য আবার পড়তে ইচ্ছা করছে। সংসারযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ যখন পড়ে—"সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে"—বা যখন সহাস্যে রামকৃষ্ণ বলেন, "না গো, তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন ? তোমরা রসে-বশে বেশ আছো"—তখন মনে ভরসা জাগে, আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। এই অভয়বাণী শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ-ভক্তদের জন্য নয়, সবার জন্য। আর যিনি এই বাণী এমনভাবে লিখে গেছেন, অমন একজন মানুষকে চিরকালের জন্য এত সহজলভ্য করে গেছেন, তাঁর কাছে আমরা ঋণী হয়ে আছি।

কথামৃতের প্রেরণা ঃ বিপ্লবীদের জীবনে

শিশির কর

ইতিহাসে দেখা যায়, গোলা-বারুদের চেয়ে কম অগ্ন্যুদ্গার ঘটায়নি লেখনী। আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামেও পুস্তক-পুস্তিকা পত্র-পত্রিকা কম শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল না। মুক্তিসংগ্রামে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে বইপত্রের ভূমিকা ছিল অসীম। পরাধীনতার গ্লানির জন্য মর্মবেদনা এবং স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাতে বইপত্র কী বিপুল-ভূমিকা নিয়েছিল, তার যথাযথ মূল্যায়ন এখনো হয় নি।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—দুভাবেই বইপত্র আমাদের মুক্তিসংগ্রামে প্রভাব বিস্তার করে। কোনো-কোনো বই তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে, বিপ্লব আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আবার কোনো-কোনো বই বিপ্লবীদের চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে ও মনকে তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, স্বামী বিবেকানন্দের

পত্রাবলী হল সেইসব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা অগ্নিযুগের তরুণদের দেশের মুক্তির জন্য জীবন-মরণ-পণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, বিশেষতঃ সশস্ত্র বিপ্লবীদের চরিত্রালোচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরাই বিশেষ জোর দিয়ে এঁদের উপর ধর্মের বিপুল প্রভাবের কথা বলেছেন। সে ধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়, দেহমনকে পবিত্র রাখার ধর্ম। এই ব্যাপারে গীতা ও রামকৃষ্ণ কথামৃত রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিসাধনায় সিদ্ধ। সেজন্য বিপ্লবীরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা কীভাবে রামকৃষ্ণ কথামৃতকে গ্রহণ করতেন, তার একটা দৃষ্টান্ত নিম্নের গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে আমরা পাই:

"In the Anusilan Samity-system Vivekananda's Works were considered as text books to be used to gather recruits. Libraries in the name of Vivekananda were also found in the house of revolutionaries. Ramakrishna Kathamrita and Vivekananda's Karmayoga were favourite books."

বিপ্লবীদের যেসব গোপন পাঠাগার ছিল, সেখানে যেসব বইপত্র রাখা হত, তাদের মধ্যে কথামৃতও থাকত। মানসিক শক্তি অর্জন ও চিত্তের শুদ্ধির জন্য সেযুগে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে কথামৃত ছিল অবশ্যপাঠ্য বইগুলির অন্যতম।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর চিঠিপত্রে চরিত্র-গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তে অনুরোধ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী, এবং বিনোবা ভাবে প্রমুখ তাঁর অনুগামীগণ রামকৃষ্ণ কথামৃত ও রামকৃষ্ণ-উক্তিকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তার ভুরি-ভুরি নিদর্শন তাঁদের জীবনীতে ও তাঁদের রচনায় রয়েছে।

কথামৃত ও বাংলা নাটক

নীলনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণের ভাবধারা সমাজের সকল স্তরের মানুষকেই স্পর্শ করেছে—নাট্যকার তার সংস্পর্শে এসে জীবনে বা রচনায় তাকে অঙ্গীভূত করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে রামকৃষ্ণের সংলাপের সরলতা, সহজবোধ্যতা, চিত্রময়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য-গুলি নাটকীয় সংলাপের পক্ষে আদর্শস্থানীয়, কারণ নাটক লোকজীবনকে কেন্দ্র করে লোকজীবনের জন্যই গড়ে ওঠে। বর্তমান য়ুরোপের নাট্যজগতের এক বিশিষ্ট-ব্যক্তিত্ব পোলান্ডের গ্রোটোস্কি (Jerzy Grotowski) কিছুকালপূর্বে কেন্দ্রগুলির

গ্রামীণ পরিবেশে একটি নাট্যকর্মশালা (Theatre Workshop) পরিচালনা করেছিলেন। গ্রোটোস্কি য়ুরোপে 'পুওর থিয়েটার' (Poor Theatre) প্রবর্তনার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। সর্বসাধারণের থিয়েটারের মূলভিত্ত হিসাবে গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তেমনি ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে রামকৃষ্ণের ধর্মীয় শিক্ষাদানের পদ্ধতিটিও (Modes of Religious Communication) তাঁর মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। [Advocate of a Poor Theatre : Pranjoy Guha Thakurta, 'Sunday'—30.3.81]

প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণের ভাব আদানপ্রদানের রীতি এবং ভাষার সর্বজনীনতা—নাটকীয় সংলাপ এবং ঘটনাসংস্থানের দিক থেকে বিশেষভাবে উপযোগী জেনেই গিরিশচন্দ্রের মতো নাট্যকার 'তাঁর কাছে নাটক লেখা শিক্ষা' করেছেন। গিরিশচন্দ্র অবশ্য 'কথামৃত'-নির্ভর নন কারণ রামকৃষ্ণের "অমৃতকথা" তিনি স্বয়ং শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, সেইসঙ্গে পেয়েছিলেন তাঁর অনুপম নাট্যভঙ্গিগুলি প্রত্যক্ষ দর্শনের দুর্লভ সৌভাগ্য—যা অভিনেতা গিরিশচন্দ্রকে প্রয়োগরীতিতে প্রভাবিত করেছিল। গিরিশের নাটকে রামকৃষ্ণ-ভাবধারা বা ধর্মীয় চিন্তাগুলিকে বাদ দিলেও তার বড় অংশ জুড়ে আছে রামকৃষ্ণের সংলাপ, বিশিষ্ট উপমারীতি এবং সংলাপ ও উপমাপ্রয়োগের রামকৃষ্ণ-শৈলী। গিরিশ, সমকালীন কলকাতার সর্বশ্রেণী ও সমাজের সংস্পর্শে এসেছেন কিন্তু তাঁর নাট্যসাহিত্যে সকল কিছুকে ছাড়িয়ে উঠেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

গিরিশ-সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে অমৃতলাল বসুকে বাদ দিলে আর প্রায় সকলেই নির্ভর করেছেন কথামৃতের ওপর। অমৃতলাল রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎদর্শন পেয়েছিলেন কিন্তু গিরিশের মতো তাঁর দৃষ্টি ও মানসিকতা কতখানি সজাগ ছিল, তা নির্ণয় করা কঠিন। অমৃতলালের একমাত্র 'আদর্শবন্ধু' নাটকেই রামকৃষ্ণ চরিত্র-চিত্রের সাক্ষাৎ মেলে—অন্যত্র ছড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ ভাবধারার কিছু-কিছু পরিচয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক। বাগবাজার অঞ্চলের অধিবাসী (যেখানে রামকৃষ্ণের উপস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রভাব), ক্ষীরোদপ্রসাদের পক্ষে রামকৃষ্ণের প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার হিসাবে যোগদানের সূত্রেও তিনি রামকৃষ্ণ-চিন্তার সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁর নিজের কথা থেকেই জানা যায়, তিনি জড় বিজ্ঞানকেই একমাত্র সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়ে-ছিলেন কিন্তু কালক্রমে তাঁর পরিণতি ঘটেছে জড়ের অন্তরালে চৈতন্যস্বরূপকে উপলব্ধিতে। প্রথমে তিনি রামকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ মানবরূপেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু জীবনের গোধূলি লগ্নে তাঁর চিন্তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, যার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ রচনা 'নরনারায়ণে'। সাক্ষাৎ রামকৃষ্ণদর্শন না

পেলেও শ্রীমা ও রামকৃষ্ণ-অন্তরঙ্গদের সংস্পর্শে তিনি রামকৃষ্ণকেই লাভ করেছিলেন। তাঁর নাটকের ভাব ও সংলাপে কথামৃত-প্রভাব সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গে রাঠোর', 'উলূপী', 'মিডিয়া' প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ক্ষেত্রে। যৌবনে বিলাত গমনের অপরাধে নিজ সমাজে তিনি যে-লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন তারই স্বাভাবিক পরিণতি তাঁর হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষে। পাশ্চাত্য নাস্তিক্যবুদ্ধির আবহাওয়ায় লালিত দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুধর্মের আচার-আচরণ, দেবতা-মহাপুরুষদের নিয়ে এককালে যথেষ্ট ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। একদিন তাঁরই হাতে কথামৃত তুলে দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রতনয় দিলীপকুমার। এই গ্রন্থটি দ্বিজেন্দ্র-মনোজগতে কি বিপুল পরিবর্তন এনেছিল তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন দিলীপকুমার তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে। এই সময় তাঁর মানসিক পরিবর্তনের কথা জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর রচনা থেকেও জানতে পারা যায়। দেবকুমারবাবু জানিয়েছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'সাধারণ বন্ধুদের অগোচরে', গোপনে 'শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং সিদ্ধদেবতা পরমহংস রামকৃষ্ণের' জীবনীগ্রন্থ, 'উপদেশ ও কথামৃত' দেবকুমারবাবু মারফত সংগ্রহ করে পাঠ করতেন। ঐ পর্বে বন্ধুদের সমক্ষে যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক শুরু হত তখন সে তর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল যোগদান করলেও তাতে পূর্বের মতো জোর থাকত না ; এবং একদিন সেই তর্কের সময় দেবকুমারবাবু যখন 'কোনো-কোনো মহাপুরুষ বা মহাত্মার উক্তি' তাঁর কাছে উত্থাপন করেছেন তখন বিনা প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে উদ্বেল হয়ে তিনি গেয়েছেন :

'আমি চিনি না, জানি না, বুঝি না, তথাপি তাঁহারে চাই
আমি সজ্ঞানে, অজ্ঞানে, পরাণেরি টানে কার পানে ছুটে যাই।'

কথামৃত পাঠের পর দ্বিজেন্দ্র-চিন্তাজগতে এই পালাবদলের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে দেবকুমারবাবুর কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন দিলীপকুমার। তখন নাট্যকারের আয়ু-প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়। সেইকালে তিনি যে তিনখানি নাটক রচনা করেছেন ('ভীষ্ম', 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী') তিনটিতেই কথামৃতের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষ করে দুটি সামাজিক নাটক—'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী'—মঞ্চসাফল্য লাভ না করলেও পরিবর্তিত চিন্তার পরিচয় হিসাবে দ্বিজেন্দ্র-নাট্যসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। 'পরপারে' নাটকের 'ভবানীপ্রসাদ' ও 'বঙ্গনারী'র কেদার চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের নব-চেতনার পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ভবানীপ্রসাদের মাতৃ-বন্দনামূলক শরণাগতির গানগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের 'শেষ পারানীর কড়ি'—যা তিনি সাদরে 'কণ্ঠে তুলে' নিয়েছেন। 'বঙ্গনারী'র 'কেদার' চরিত্র দ্বিজেন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। আপাতদৃষ্টিতে কেদার পাগল—কিন্তু তার পাগলামির অন্তরালে আছে অপূর্ব সারল্য এবং নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। কেদার কখনো-কখনো নিজেই নিজেকে শাসন করে—'কেদার, সভ্য হও।' এমনি এক শাসন-

মুহূর্তে নাটকের অপর একটি চরিত্রের (সদানন্দ) জবানীতে নাট্যকার স্বয়ং যেন বলে উঠেছেন, 'না কেদার, সভ্য হয়ো না। বড় খাঁটি জিনিষ আছো।...এ জিনিস ভারতের নিজস্ব।...শরীরে বল, মনে স্ফূর্তি, মুখে সারল্যের জ্যোতি।...পুরাণে অনেক চরিত্র পড়েছি, ইতিহাসও অনেক ঘেঁটেছি কিন্তু এরকম সরল, গোঁয়ার, ত্যাগী, অস্থির, সদানন্দ চরিত্র আর দেখিনি।' পুরাণ-ইতিহাস বহির্ভূত এই আনন্দময় চরিত্র নাট্যকারের কল্পনা নয়—আবিষ্কার।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৈশোরে রামকৃষ্ণ ভাবধারার নিকট সংস্পর্শে এলেও মঞ্চে যোগ দেওয়ার পর কিছুকাল বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন সেই পরিমণ্ডল থেকে। আবার নাটক রচনার সূত্রেই ফিরেছেন তাঁর বাঞ্ছিত আশ্রয়ে। 'রামানুজ' রচনাকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ-অন্তরঙ্গদের তিনি সান্নিধ্যলাভ করেছেন এবং সে সম্পর্ক আমৃত্যু অবিচ্ছিন্ন ছিল। 'রামানুজ' নাটক রচনার কিছুকাল পূর্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'রামানুজ-চরিত' প্রকাশিত হয়—সেটি অবলম্বন করেই অপরেশচন্দ্রের নাট্যরচনাপ্রয়াস। নাটক রচনাকালে অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীদের। এই নাটকের 'কাঞ্চীপূর্ণ' চরিত্রটি রামকৃষ্ণ-চরিত্রের আদর্শে গঠিত এবং সংলাপ সম্পূর্ণভাবে কথামৃত-অনুসারী। প্রসঙ্গত নাটকটির একটি দৃশ্যের বিশেষ মর্যাদার অধিকার স্বীকৃতির প্রয়োজন। রামানুজের আচণ্ডালে প্রেমবিতরণের দৃশ্যটি দেখতে দেখতে সঙ্ঘজননী সারদাদেবী গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। অভিনয় শেষ হওয়ার পরেও তাঁর অর্ধ-সমাহিত অবস্থা। অবশেষে গোলাপ-মায়ের চেষ্টায় তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এই একই দৃশ্য অবলোকন করে স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জন' করতে থাকেন এবং তারপর কিছুদিন তাঁর 'কৃপার ভাণ্ডার' উন্মুক্ত করে 'দলে-দলে ভক্তগণকে' দীক্ষা দিতে থাকেন।

অপরেশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'কর্ণার্জুন' এবং 'শ্রীগৌরাঙ্গ'-তেও কথামৃতের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বর্তমান।

গিরিশযুগের প্রায় সমস্ত নাট্যকারই কোনো না কোনোভাবে কথামৃতের কাছে ঋণী। সেকালে খ্যাতিমান নাট্যকারদের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'অভিনেত্রীর রূপ'-এর নাট্যরূপ (অমুদ্রিত) মঞ্চসাফল্য অর্জন করে। এই নাটকে কথামৃতের প্রভাব নাট্যকারের ব্যক্তিজীবনকেও আলোকিত করেছে।

মনোমোহন গোস্বামীর অনেক নাটকেই কথামৃত প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। 'ধর্মবিপ্লব'-এ (কালাপাহাড় কাহিনী অবলম্বনে) বামাচরণ চরিত্র এবং 'বিধির বিধান'-এ পুলহ ঋষি চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবিত, সংলাপ কথামৃত-অনুসারী। 'সমাজ' নাটকের মধ্যে জীবসেবার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্যাবলীর পরিচয় বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত। সর্বধর্মসমন্বয়, পরধর্মসহিষ্ণুতা ও মানবসেবা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ মনোমোহন এবং সমকালীন

নাট্যকারদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে—সে আদর্শ তাঁরা স্বতই লাভ করেছিলেন কথামৃত থেকে।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত নাট্যকার হিসাবে খ্যাত না হলেও তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ একসময়ে মঞ্চে সাড়া জাগিয়েছিল। হারাণচন্দ্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর উপন্যাস 'কামিনী ও কাঞ্চন' রামকৃষ্ণ-চিন্তার ভিত্তিতেই রচিত। উপন্যাসটির নাট্যরূপ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছিল—তবে মুদ্রিত হয় নি। 'তত্ত্ব মঞ্জরী' (ফাল্গুন, ১৩১৩) পত্রিকায় উপন্যাসটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'লেখক মহাপুরুষ রামপ্রসাদ চরিত্রে জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়াচার্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের সরল মাতৃনির্ভরতা, জীব-দুঃখকাতরতা, কামিনী-কাঞ্চন বিজয়, জ্বলন্ত ত্যাগ, অপরিসীম দয়া, অলৌকিক শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির যথাযথ চিত্র অংকন করিয়াছেন।' বলা বাহুল্য, হারাণচন্দ্রের কাছে সে চিত্রের মূল উপাদান ছিল কথামৃত।

১৯৪৮ সালের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনী অবলম্বন করে নাটক রচনা-প্রবাহ সুরু হয়েছে এবং সেই ভাবপ্লাবন মঞ্চ-যাত্রা-ছায়াচিত্রের মাধ্যমে জনজীবনকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছে। এই নবপ্রবাহের সূত্রপাত কালিকা থিয়েটারে 'যুগ-দেবতা' অভিনয়ের (১৯৪৮) সঙ্গে সঙ্গে। রামকৃষ্ণ জীবনী অবলম্বনে 'যুগদেবতা' নাটকটির প্রথম নামকরণ হয়েছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকা-নন্দ প্রভৃতি লোকপূজ্য চরিত্রগুলির অভিনয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের ব্যক্তিচরিত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি সাধারণ ভক্তের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে—এই আশংকায় একদল ভক্তের আপত্তিতে শেষপর্যন্ত পরিবর্তিত নামে রূপক-নাট্য-রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়। অবশ্য চরিত্র-পরিকল্পনা ও সংলাপে কথামৃতের অবাধ ব্যবহার নাট্যকারের অভীষ্ট সিদ্ধ করেছিল। প্রায় পাঁচশত রাত্রির অভিনয়—সমকালের বিচারে এক বিস্ফোরণ। এর ফলে অচিরেই রঙ্গমঞ্চ, যাত্রা ও চলচ্চিত্র-জগতে রামকৃষ্ণ-ভাবধারা তীব্রগতিতে প্রবাহিত হয়েছে। শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে কথামৃতের ব্যাপক প্রভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন গ্রন্থটির শতবর্ষপূর্তিবর্ষে 'কথামৃত' নামে একটি দর্শক-সফল ছায়াচিত্রের পরিবেশনা। বর্তমানকালের প্রায় প্রত্যেক খ্যাতনামা নাট্যকারই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কিত নাটক রচনা করেছেন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'নটী বিনোদিনী', দেবনারায়ণ গুপ্তের 'পরমারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণ', মন্মথ রায়ের 'মহা উদ্বোধন' এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'গিরিশচন্দ্র', 'রাণী রাসমণি' প্রভৃতি জীবনীনাট্যেও শ্রীরামকৃষ্ণই প্রধান আকর্ষণ। আর যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানেই তো তাঁর অমৃতময় কথাসমষ্টি—কথামৃত।

'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ঃ চিরায়ত সাহিত্য

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণকথার অনির্বচনীয় মাধুরী প্রথম জনসমাদৃত হয় বাংলা পত্র-পত্রিকায়। সেইসঙ্গে সমকালীন ইংরেজী পত্রিকায়ও তাঁর বাণীর ইংরেজী অনুবাদ কিছু-কিছু প্রকাশিত। সাগরপারে ম্যাক্সমূলার সম্ভবতঃ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণী' নামে ছোট্ট অথচ মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন। বাংলায় এবং ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণকথা ধারাবাহিকভাবে নানাভাবে প্রকাশ করেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে শ্রীম।

কথামৃত তাঁর ব্যক্তিগত অনুধ্যান—তবু মাস্টারমশাইয়ের নিপুণ সৌন্দর্যগ্রাহী হৃদয় কেমন করে একের পর এক শ্রীরামকৃষ্ণকথার মাল্যসূত্র গ্রন্থন করে চলেছিল সেকথা ভেবে এখনো আমাদের সমান বিস্ময়। অনেকেরই প্রশ্ন, কথাগুলি ঠিক-ঠিক লিপিবন্ধ হয়েছিল তো? মাস্টারমশাইয়ের নিজের কথা কিছু মিশে যায় নি কি? 'বালিতে চিনিতে মিশে যাওয়া'র আশঙ্কাও কেউ-কেউ করেছেন!

আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যধন্য বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগীরা কেউ এ-আপত্তি তোলেন নি! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার সঙ্গে আর কারু কথার মিশাল তো এই ভক্তদের কাণেই সবার আগে বাজবে!

তবে লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন শশধর তর্কচূড়ামণি 'সাহিত্য'-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি চিঠিতে। শোনা যায়, ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারেরও আপত্তির কথা। কিন্তু এ আপত্তির লিখিত কোনো প্রমাণ পাইনি। আর এক আপত্তির কথা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বিদ্যাসাগর-প্রয়াণ দিবস ১৩ই শ্রাবণ তারিখে বীরসিংহ গ্রামে ১৯৮১ সালে গিয়ে শুনলাম সেখানকার কোনো বিশিষ্ট পণ্ডিতের মতে বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদৌ কোনো সাক্ষাৎকার ঘটে নি। সেদিনের জনসভায় আমার প্রস্তাব ছিল, ১৯৮২ সালে এই প্রয়াণদিবসের অনুষ্ঠানের কাছাকাছি সময়েই ৫ই আগস্ট তারিখে যেন বিদ্যাসাগর-শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকার স্মরণ করা হয়। বলাবাহুল্য, সে প্রস্তাব নিয়ে কোনো প্রচেষ্টা সম্ভব হয় নি। কী-কী প্রমাণবলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি আদৌ ঘটে নি বলে কোনো 'বীরসিংহ' মনে করেন, তা এ-পর্যন্ত লিখিত আকারে দেখি নি। ইতিহাস-বিষয়ে কিঞ্চিৎ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন তো চেষ্টা করবেন। আমাদের ধারণা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকারের বিবরণটি এক বিধাতা ছাড়া আর কারু কল্পনায় আসতো না, এবং ৫ই আগস্ট, ১৯৮২ তারিখে

ইতিহাসের মাধ্যমে তিনিই এ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকাহিনীর ক্ষুদ্র হলেও ভাবগত দিক থেকে বিশালতম পরিচয় এ সাক্ষাৎকারের সত্যবিবরণে রয়েছে।*

যে-কারণে 'কথামৃত' চিরকালীন সাহিত্য—তার অন্যতম উপাদান ওই বিদ্যাসাগর-শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার। অথচ একটি দিনের ঘণ্টা পাঁচেকের আলোচনার সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ! বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপও স্বল্পসময়ের। কিন্তু বঙ্কিম-মানসের মূল্যায়নে এটুকু আলোচনাও বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। এ সাক্ষাৎকারেরও প্রতিবাদ কেউ-কেউ করেছেন। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমের জবানবন্দী আর পাওয়ার উপায় নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণকথা ও শ্রীমর বর্ণনা—এ দুই পাশাপাশি একটি অংশ আমরা দ্বিতীয় ভাগ 'কথামৃত' থেকে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করি। ভক্তি-বিশ্বাসের পটভূমিতে বিধৃত এ বিবরণ 'কথামৃতে'র ঈশ্বরসর্বস্বতারই উদাহরণ। তবু দুই কথাশিল্পীর যোগ্য সম্মেলনের এমন এক বাণীচিত্র বর্ণনার অংশটিতে রয়েছে, যা 'কথামৃতে'র আশ্চর্য মাধুরীর প্রমাণ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। অপর ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন করবার জন্য। তাঁকে দর্শন করলে মনের অন্ধকার দূরে যায়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শত সূর্য যেন উদয় হল। তবে সভাসদ লোকেরা পুড়ে গেল না কেন? তার উত্তর—তাঁর জ্যোতি জড় জ্যোতি নয়। সভাস্থ সকলের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হল। সূর্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ভক্তদের কাছে এই কথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতেই একেবারে বাহ্যরাজ্য ছাড়িয়া মন অন্তর্মুখ হইল। 'হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল' এই কথা উচ্চারণ করিতে না করিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ।

"ঠাকুর সমাধি-মন্দিরে। ভগবান দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃৎপদ্ম কি প্রস্ফুটিত হইল। সেই একভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু বাহ্যশূন্য। চিত্রার্পিতের ন্যায়। শ্রীমুখ উজ্জ্বল ও সহাস্য।" [কথামৃত: ২য় ভাগ: ১১ই মার্চ ১৮৮৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ মাধ্যমে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা উপলব্ধি করলাম। সেইসঙ্গে হৃদয়পদ্মের প্রস্ফুটনে শ্রোতাদের ভাবটি পাঠকের প্রাণেও সঞ্চারিত।

কেউ বলতে পারেন, কথামৃত তো 'ধর্ম'—'সাহিত্য' বলি কেমন করে?

* শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকার সংবাদ অনতিবিলম্বে কেশবচন্দ্র সেনের পত্রিকায় বেরিয়েছিল। দ্রঃ 'কেশবচন্দ্র সেনের পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি প্রসঙ্গ' অধ্যায়।—সম্পাদক।

যে কারণে উপনিষদ বা বাইবেল সাহিত্য, সেইকারণে কথামৃত সাহিত্য ! অনুভূতির নিবিড়তায় রস—সেই রসের স্পর্শে সৌন্দর্য । যাঁরা শৃঙ্গাররস মানেন, তাঁরা পরমানন্দরসও মানতে বাধ্য । অনুভূতির গভীরতা যেখানে সেখানেই বাণীর শিল্পরূপ—তার তাই সাহিত্য ।

'কথামৃতে' যেমন ঈশ্বরানুভবের সহস্রপ্রকাশ, তেমনি আছে ঈশ্বরসন্ধানের ব্যঞ্জনা নিয়ে নানান গল্প । অমন আশ্চর্য সব উদাহরণের মালা শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন করে তাঁর কথাসূত্রে গেঁথেছিলেন, ভাবলে অনেক কথাই মনে জাগে । তার একটি হল গল্পগুলি তাঁর মুখ থেকে এসে চিরকালের গল্পে পরিণত । হয়তো লোককথায়, পুরাণে, প্রবাদ-প্রবচনে, শাস্ত্রে ও প্রাচীন সাহিত্যে এরা ছড়িয়ে ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিভায় সেই গল্পলহরী—কথামৃত এবং অন্যান্য বাণীসংগ্রহে একত্রে সংগ্রথিত ।

জীবের অন্তর্নিহিত চিরন্তন ব্রহ্মস্বরূপের গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় শোনা যাক : "কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব । গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই । একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল । লাফ দিতে গিয়ে বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল । বাঘটা মরে গেল, ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল । তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায় । তারাও ভ্যা ভ্যা করে, সেও ভ্যা ভ্যা করে । ক্রমে ছানাটা খুব বড় হলো । একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল । সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক ! তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে । সেটাও ভ্যা ভ্যা করতে লাগলো । তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল । বললে, দেখ, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ —ঠিক আমার মতো দেখ । আর এই নে খানিকটা মাংস—এইটে খা । এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগল । সে কোনমতে খাবে না—ভ্যা ভ্যা করছিল । রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে । নূতন বাঘটা বললে, এখন বুঝিছিস্, আমি যা তুইও তা ; এখন আয় আমার সঙ্গে বনে চলে আয় ।

"তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই । তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি ।" (কথামৃত : ২য় : ৪ঠা জুন, ১৮৮৩)

স্বামীজীর বক্তৃতায় এ গল্পের বাঘ সিংহে পরিণত । তাছাড়া আর সব ঠিক আছে । এ গল্পটির মূল রচনা হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, কিন্তু গল্প বলাটি তাঁর । এই ছোট্ট একটি গল্পে মানবাত্মার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মস্বরূপের এমন উদ্ভাসনের সঙ্গে তুলনীয় আর কি ভাবা যেতে পারে ? তুলনায়, সাংখ্যদর্শনে রাজপুত্রের নিজেকে ব্যাধপুত্ররূপে আত্মপরিচয়বিস্মৃতির কাহিনীটি অনেক দুর্বল । পরমসত্যের এই স্থিরবিন্দুতে প্রতিষ্ঠাই চিরায়ত সাহিত্যের চিহ্ন । এমন অজস্র দিকচিহ্ন 'কথামৃতে'র বৈশিষ্ট্য ।

নিজের উপমাপ্রয়োগের শক্তি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ সচেতন। কিন্তু সারা কথামৃত জুড়ে একের পর এক উপমার বিস্তার তাঁর অন্তর্নিহিত কবিসত্তার কথাই মনে করিয়ে দেয়, যে সত্তার রহস্য কোনো কবি বা সমালোচকই ব্যাখ্যা করতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথানুসারে তিনিই জগজ্জননী, অন্তরে থেকে যখন যেমন প্রয়োজন 'রাশ ঠেলে দেন'। নিয়ত সাধন ভজনের 'রাশ' ঠেলায় উপমা কিছুদূর এগোয়, কিন্তু মা যার আনন্দময়ী, তার রাশ ঠেলার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য অন্তহীন হয়ে পদে-পদে ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে।

উপমার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ—কালিদাস, বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাস নন। জীবনের সহজ সুপরিচিত অথচ এ-পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র থেকেই তাঁর উপমা চয়ন। সে উপমায় প্রকৃতির টাটকা সজীবতা ও নিজস্ব গন্ধ সব সময়ই মিশে আছে। এদিক থেকে পল্লীবাংলার মুক্তপ্রাণতা তাঁর বাণীসাহিত্যের স্বধর্ম। অবশ্য নগরজীবনের সান্নিধ্যে এসে কলকাতার ছায়াপাত তাঁর উপমায় বা উদাহরণেও ছায়াপাত করেছে। কিন্তু এর মধ্যেও সেই নিভূষণ সারল্য—যা সভ্যতার কারিগরিতে মূলতঃ বঙ্কিম-স্বভাব নয়, যা অন্তরের সহজধর্মজাত—তাই সকলকে গ্রহণ করেও নিজের সারল্যে প্রতিষ্ঠিত।

তাঁর উপমা-সৌন্দর্যের অতল অনুপম সৌন্দর্যের অনেক উদাহরণের দু'একটি—"কি জান, যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভক্তের চক্ষে তিনি সাকাররূপে দর্শন দেন। যেমন অনন্ত জলরাশি। মহাসমুদ্র। কূল-কিনারা নাই। সেই জলের কোনো কোনো স্থানে বরফ হয়েছে; বেশী ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি-হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। আবার যেমন সূর্য উঠলে বরফ গলে যায়—যেমন জল তেমনি জল, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানপথ—বিচারপথ—দিয়ে গেলে সাকাররূপ আর দেখা যায় না; আবার সব নিরাকার। জ্ঞানসূর্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল। কিন্তু দেখ, যারই নিরাকার, তারই সাকার।" (৩য় ভাগ ঃ ১৭. ১২. ৮৬)

ঈশ্বরের সাকার-নিরাকারত্ব নিয়ে যুগযুগান্তের ধর্ম-দর্শনের কোলাহলকে এক নিমেষে স্তব্ধ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারে থাকার আদর্শটি বলছেন—"ঠিক পাঁকাল মাছের মতো। পুকুরের পাঁকে সে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না।"

"এই মায়ার সংসারে বিদ্যা অবিদ্যা দুইই আছে। পরমহংস কাকে বলি? যিনি হাঁসের মতো দুধে জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ফেলে দুধটি নিতে পারেন। পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।" (ঐ)

কলকাতায় থিয়েটার দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরদর্শনের উপমায় সে প্রসঙ্গ—"ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায়। যখন উপাধি সব চলে যায়,—বিচার বন্ধ হয়ে যায়, তখন দর্শন। তখন মানুষ অবাক সমাধিস্থ হয়। থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত

গল্প করে, এ গল্প সে গল্প। যাই পর্দা উঠে যায় সব গল্প টল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে তাইতে মগ্ন হয়ে যায়।" (কথামৃত ঃ ৪র্থ ভাগ ঃ ১৫. ৭. ৮৫)

মিউজিয়ামে (যাদুঘরে) দেখেছিলেন ফসিল পাথর হয়ে গেছে। অমনি সাধুসঙ্গের উপমা মনে এলো। "সাধুর কাছে থাকতে থাকতে সাধু হয়ে যায়।" (ঐ ২৩. ১০. ৮৫)

মনুমেন্টের উপমায় বলছেন ঃ "অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়, কিন্তু নীচের জিনিস লয়ে থাকে। ঘর বাড়ী, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। মনুমেন্টের নীচে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ গাড়ী-ঘোড়া সাহেব-মেম—এইসব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র, ধু ধু করছে। তখন বাড়ী, ঘোড়া, গাড়ী, মানুষ—এসব আর ভাল লাগে না ; এ সব পিঁপড়ের মতো দেখায় !!" (কথামৃত ঃ ৫ম ঃ ১.১.৮৩)

অভিজ্ঞতার এই ক্ষণবস্তুদের চিরসত্যের বহন করে তোলা চিরায়ত সাহিত্যের আর এক লক্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমালোকে সব উপমারই ধ্রুবনক্ষত্র এক পরমসত্য। সাহিত্যস্বাদের আনন্দ কখন ব্রহ্মস্বাদে পরিণত !

বাংলা সাহিত্যে চর্যাগান থেকে শুরু করে বৈষ্ণব-শাক্ত, আউল-বাউল, সুফী-মুর্শিদা, কীর্তন-ধ্রুপদাঙ্গ, আগমনী-বিজয়া, দাশরথি-নীলকণ্ঠ, ব্রহ্মসঙ্গীত—এসব ঐতিহ্যের এক পূর্ণ পরিণত বিকাশ কথামৃতের কথা ও ভাবের জগৎ।

তিনি আমাদের চেনা, তবু অচেনা। বাংলায়, ভারতে বা বিশ্বে যে যেখানে পরমতমের সুরে তার বেঁধেছেন, তার সঙ্গেই তাঁর সুরের মিল। তবু নিজের সুরে তিনি অনন্য।

কথামৃতে লোক-কাহিনীর ব্যবহার

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর তাবৎ কথাসাহিত্যে দুটি ধারা—একটি লিখিত অন্যটি মৌখিক। লিখিত গল্পকাহিনী রচিত হবার বহু আগে থেকেই পৃথিবীর সব দেশেই মৌখিক গল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। খুব আদিমকাল থেকে মানুষ তার জীবনের নানা লৌকিক অলৌকিক, বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য ঘটনাবলী, বিচিত্র ঘটনা ও দুর্ঘটনা, প্রতিদিনকার নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ইত্যাদিকে নিয়ে বিচিত্র সব গল্পকাহিনী রচনা করে আসছে। এইসব মৌখিক গল্পকাহিনীগুলি লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে লোককথা, কিংবদন্তী ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এইসব লোককথাগুলির ভিতরে আছে পৃথিবীসৃষ্টির কাহিনী থেকে শুরু করে নানা জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ,

বৃক্ষলতাদি এবং মানুষের আবির্ভাবের কাহিনী। অপরদিকে তেমনি আছে নানা অলৌকিক অতিপ্রাকৃতমূলক কাহিনী। নানা রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত, বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনার খতিয়ান। তার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে লোকায়ত মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনাচরণের বিচিত্ররূপ এবং সাধারণ মানুষের নানা বিশ্বাস ও সংস্কারের এক বিচিত্র কাহিনীর পটভূমিকা। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যায় এই সব গল্প-কাহিনী এবং কিংবদন্তীগুলি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে, তার মূলে আছে লোকায়ত জীবনদর্শন। লোক অর্থে স্বাভাবিকভাবে জনসমষ্টি বোঝালেও বিশেষ অর্থে এমন মানুষের গোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের উপর বিদগ্ধ বা পরিশীলিত মানুষের প্রভাব পড়েনি। এরা সাধারণ জীবনচর্যার প্রাত্যহিক উপকরণ থেকে জীবনচর্যার প্রাথমিক সত্যকে স্বীকার করে নেয় এবং যুগযুগান্তরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তা সত্যকার জীবনদর্শন হয়ে ওঠে। তার মধ্যে থেকে তারা পায় প্রাত্যহিক চলার প্রেরণা, নৈতিক মানদণ্ড ও জীবনাচরণের নির্দিষ্ট ধারা। এইসব লোককথাগুলির মধ্যে সেইসব জিনিসই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। উপনিষদের যুগ থেকে শুরু করে আজকের যুগের আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষরা, ধর্ম-জগতের মহামানবেরা, বারবার এইসব লোককথা ও কিংবদন্তীর কাহিনীগুলিকে ব্যবহার করে আসছেন তাঁদের ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায়। জাতকের গল্পগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই কেবল উপদেশাত্মক নয়, জীবন সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতার কথাও প্রকাশ করে। তার সঙ্গে দেখা গেছে, এইসব গল্পকাহিনীর সাহায্যে বুদ্ধদেবের বাণী ও বৌদ্ধধর্মের দর্শনকে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে, লোক-প্রচলিত কাহিনীকেই সংকলন করে বৌদ্ধধর্মের নীতি, দর্শন ও তত্ত্বকথাকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। একদিন যা ছিল লোকায়ত জীবনের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার কাহিনী, তা পরে জাতকের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যাকারী গল্পকাহিনী।

এইসব লোকপ্রচলিত কাহিনীতে একদিকে যেমন প্রাত্যহিক জীবনচর্যার কথা থাকত তেমনি লোকায়ত মানুষের জীবন সম্পর্কিত নিয়মনীতিগুলিও তার মধ্যে সংযুক্ত থাকত। তাই ধর্মপ্রবক্তা এবং দার্শনিকের সুবিধা হত এইসব গল্পগুলি ব্যবহার করার। কারণ জনসাধারণ তার মধ্য থেকেই নিয়মনীতির কথাও যেমন জেনে যেত তেমনি তার মধ্য দিয়ে সহজভাবে কঠিন দার্শনিক সত্যগুলিও উপলব্ধি করতে পারত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সমগ্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এইসব লোককথা কিংবদন্তী ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে। যেমন কথামৃতের পঞ্চম পরিচ্ছেদে নরেন্দ্র, ভবনাথ ও মাস্টারমশাই আলোচনা করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন সহাস্যে বললেন যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; তবে ভাললোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দলোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন, তা'বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বোঝালেন,

যদি বলা হয়, বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাবো, তার উত্তর হচ্ছে, যারা বলছে, 'পালিয়ে এসো' তারাও নারায়ণ, তবে তাদের কথা শুনবে না কেন? এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন: 'একটা গল্প শোনো, কোনো বনে একটি সাধু থাকেন। তার অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছে, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময় একটা রব উঠলো, 'কে কোথায় আছো পালাও —একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্য পালালো না। সে জানে হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল, নমস্কার করে স্তব-স্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে, 'পালাও পালাও।' শিষ্যটি তবু নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগলো। তুমি কেন হাতী আসছে শুনে চলে গেলে না? সে বললে, 'গুরুদেব যে আমায় বলে দিয়েছিলেন, নারায়ণই মানুষ, জীব-জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে যাই নাই।' গুরু তখন বললেন, 'বাবা, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।' ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন— আবার ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের সঙ্গে তফাত থাকতে হয়— এই সত্য উপলব্ধির ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উপমাটি অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে আধ্যাত্মিক সত্যটিকে।

মুখে মুখে প্রচলিত গল্পকাহিনীগুলিকে নিয়ে লোকসংস্কৃতির প্রধান সাহিত্য-উপাদান হিসাবে নানা গল্প কাহিনী রচিত হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী এইসব প্রচলিত মৌখিক কাহিনীগুলি (Oral Tales) বিশেষজ্ঞেরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন (১) ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী বা Explanatory Tales (২) পুরাণ কাহিনী বা Myths, (৩) পশুপক্ষীর কাহিনী বা Animal Tales, (৪) নীতিকাহিনী বা Fables, (৫) স্থানিক কাহিনী বা Legends বা ইতিকথা (৬) রোমাঞ্চকর কাহিনী বা Novella, (৭) বীরকাহিনী বা Hero Tales, (৮) রূপকাহিনী or Fairy Tales, (৯) হাস্যরসাত্মক কাহিনী বা Anecdotes (১০) সূত্রধারী কাহিনী বা Formula Tales, (১১) ক্রমপুঞ্জিত কাহিনী বা Cumulative Tales. শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কথামৃতের মধ্যে সর্বত্রই এ ধরনের নানা লোককথা কাহিনীর ব্যবহার বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। লোককাহিনীগুলির জন্মের পিছনে আছে লোকায়ত মানুষের নানা অভিজ্ঞতা, বিচিত্র ঘটনাসংস্থানের মুখোমুখি হওয়া, নানাবিধ বিশ্বাস, সংস্কার, জীবনযাত্রা প্রণালীর বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি। লোকসংস্কার ও

লোকবিশ্বাসগুলি এমন জিনিষ যে, সেগুলি কোনো যুক্তি বা তর্কের ধার ধারে না। তাই বিচিত্র-সব আজগুবি ঘটনা ও কার্যকারণবিহীন বক্তব্যের মধ্যেই লোকসংস্কার ও বিশ্বাসগুলি টিঁকে থাকে এবং তার মধ্যে দিয়ে জন্মলাভ করে নানা কাহিনী ও গল্পকথা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও নানাভাবে এই লোকবিশ্বাসের গল্পগুলি ব্যবহার করেছেন। তা করেছেন তাঁর ধর্মমত, আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করার জন্যে। যেমন এক জায়গায় নরেন্দ্রকে হোমা পাখীর সঙ্গে তুলনা করে বেদের উল্লিখিত হোমা পাখি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-দানকারী কাহিনীটি (Explanatory Tales) উপস্থিত করেছেন, ফলে নরেন্দ্র অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বিবেকানন্দ সম্পর্কিত ধারণাটি সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং 'নিত্যসিদ্ধ'-এর স্বরূপটি আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। কথামৃতের ১ম খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ বক্তব্যটি এভাবে উপস্থিত করেছেন : "এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে একরকম দুরন্ত ছেলে, বাবার কাছে যখন বসে কেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খেলে তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনো বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখন আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমা পাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে-পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে-পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

কিভাবে লোকসংস্কার গড়ে উঠে, কিংবা লোকসংস্কার কেনই বা যুক্তিহীন হয়েও আজও টিঁকে আছে— তার আনুপূর্বিক ইতিহাস আজও বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষিত হয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয়নি। ফ্রেজার-টাইলার-ল্যাঙ প্রমুখের গবেষণা এ-পর্যন্ত আমাদের এ-বিষয়ক যে জ্ঞান প্রদান করে তাও আমাদের কোনো শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সাহায্য করে না। অন্যদিকে পরবর্তীকালে গবেষকেরা, যেমন মেলিনোওস্কি-বোয়াস-র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও বেনেডিক্ট প্রভৃতি আধুনিক নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তসমূহ লোকসংস্কারের কার্যকরী ভূমিকা (function) ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ তত্ত্বের (Diffusionist theory) বিভিন্ন দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করলেও লোকসংস্কারের উদ্ভব প্রসঙ্গে চূড়ান্ত কোনো মতামত দিতে সক্ষম হননি। সংস্কৃতির বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী ফ্রেজার-টাইলার প্রমুখ পণ্ডিতেরা অনুমানভিত্তিক যে-সব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আজও তাই আমাদের আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে কাহিনীগুলি তাঁর আধ্যাত্মিক

তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বা দার্শনিক উপলব্ধির স্বরূপ নির্ণয়ে বার বার ব্যবহার করেছেন তার ভিত্তি কিন্তু বাংলাদেশের লোকায়ত গ্রাম্যজীবন এবং তার বিশ্বাস ও সংস্কারমূলক লোকায়ত গ্রামীণ সমাজ। তার ফলে সাধারণ বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতিমূলক আচার থেকে এসব গল্প কাহিনীগুলি সংগৃহীত হওয়ায় বাঙালীর লোকায়ত জীবন-চর্চা এবং চর্যার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন প্রকাশিত তেমনি ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম দর্শনের মধ্যে নিহিত মর্মবাণীগুলিও এই প্রেক্ষাপটে প্রকাশ করায় লোক-সাধারণের কাছে অত্যন্ত সহজবোধ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পকাহিনী ব্যবহার ও প্রয়োগে প্রধান বৈশিষ্ট্যটিই এখানে।

কথামৃতের গদ্যরূপ

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

'রামকৃষ্ণ কথামৃত বাংলায় রচিত শ্রেষ্ঠ জীবনী ও ধর্মসাহিত্য।' গ্রন্থটি আত্ম-প্রকাশের পর স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ এবং আরও অনেকেই অপার বিস্ময় নিয়ে গ্রন্থটিকে 'অমর চিরন্তন' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এ কথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য। গ্রন্থটি অনূদিত হবার পরে তা বিশ্বসাহিত্যের সর্বকালের সম্পদরূপেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতের বহু স্থলেই শ্রীম-সংকলিত কথামৃত ক্লাসিক ধর্মসাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষের এটি নিত্যপাঠ্য—অজস্র জনাকীর্ণ সভায় নানা দৃষ্টিকোণে গ্রন্থটির আলোচনা হয়ে থাকে। স্বামী নিখিলানন্দ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ 'গসপেল অব রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় অলডাস হাক্সলির এ প্রসঙ্গে স্বীকৃতি স্মরণ করা যেতে পারে: "শিল্প সাহিত্যের জগৎ থেকে আধ্যাত্মিকতার জগতে প্রবেশ করলে সেখানে উপযুক্ত রিপোর্টারের অভাব আরও বেশি লক্ষ্য করতে হয়।" অধ্যাত্মপরায়ণ ঋষি এবং ধ্যানপরায়ণ মানুষ হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নানা ভাব ও সাধনা সম্মিলিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌমিকতা অনস্বীকার্য। কথামৃতের মধ্যে ধর্মীয় ও দার্শনিক নানা তত্ত্ব নিরাশায় আশা সঞ্চার করে। শ্রীরাম-কৃষ্ণের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অনুভূতির যে তরঙ্গ উঠত—তারই সুগভীর রূপকে শ্রীম গ্রন্থটির মধ্যে সর্বকালের জন্যে বিধৃত করে রেখেছেন। ধর্মানুভূতির অনির্বচনীয়তা, সাকার-নিরাকার তত্ত্ব, ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গও এ গ্রন্থের বিরল সম্পদ। যে শিক্ষাপ্রদ উক্তিগুলি অনুসরণ করতে পারলে আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা আসে, তাও নিঃসন্দেহে শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ উত্তরাধিকার। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মেলবন্ধন হিসেবেও গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেও কথামৃতে

এমন একজাতীয় বিস্ময়কর সাহিত্যরস আছে—যা গ্রন্থটির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। সর্বোচ্চ ধর্মসাহিত্য হয়েও কথামৃত রসসাহিত্য এবং এর গদ্য—রূপ ও রীতির অভিনব স্বতন্ত্র পাঠযোগ্যতা যেমন অর্জন করেছে—তেমনি এই গদ্যরূপ শৈলীর বিশিষ্টতা এনেছে। সেক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পী এবং রসভাষ্যকার। ঐশ্বরিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এমন এক শক্তি ছিল—যা সাধারণ বুদ্ধি-জীবী বা পণ্ডিতের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণ যখন গদ্যে কথা বলে গেছেন—তখন সমস্ত জীবনতত্ত্বই ব্যাখ্যাত হয়েছে তাঁর মৌখিক গদ্যে। সে গদ্য শুধুমাত্র বুদ্ধিগত জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। সে গদ্যের মধ্যে বস্তু, তত্ত্ব, মত-বাদের স্পষ্টতা আছে। তথাপি মনে রাখতে হবে—সে গদ্য কথা হয়েও বাণী, ঈশ্বর প্রাণিত ব্যক্তির মুখ দিয়েই তা উচ্চারিত।

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথাই গদ্যে বিধৃত এবং গদ্যবাহন মুখের কথা এখানে বাণী হয়ে উঠেছে। উপলব্ধির তাৎপর্য বা সত্যের প্রকাশ এ গদ্যরূপকে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনায় মহিমান্বিত করেছে। কথামৃতের গদ্যের বৈচিত্র্য, দীপ্তি, নাটকীয়তা, গভীরতা আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সমগ্র কথামৃত—কথার স্বতন্ত্র সংগ্রহ-রূপে যদি সংরক্ষিত হয়—নিজের, গোষ্ঠীর, সমাজের বা কালের অনুভূত সত্য ও আনন্দরূপে তা উত্তরকালেও সঞ্চারিত হতে পারে। শ্রীম কথামৃতের গদ্যরূপের সংলাপ-সংগ্রহকারী অনুরাগী হিসেবে যোগ্যজন এবং উত্তরকালের ইতিহাসেও শ্রীরামকৃষ্ণের গদ্যরীতির পরিচায়ণে জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গদ্য-উক্তির মধ্যেও অবশ্য প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে। কথা-নৈপুণ্যেই সেখানে স্বতোৎসারিত পূর্ণতা—শ্রীম'র লেখনী মাধ্যমমাত্র। অধ্যাত্মজগতের শ্রেষ্ঠ দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আদর্শ ও অনুভবের কথা সর্বজনের সহজবোধ্য ভাষায় বলে গেছেন। অসাধারণ অনুভূতি ও বক্তব্যের প্রকাশোপযোগী ভাষাশিল্প কবি মুখে মুখেই প্রকাশ করেছেন। সেই গদ্যের আপন ভঙ্গীটির সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই এর অন্তর্নিহিত কাব্যগুণের স্বতঃপ্রকাশ ঘটেছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই আনন্দময় গদ্য-বাণী আমাদের চালিত করেছে। এ গদ্যরীতির মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ ঐশ্বর্য আছে—যা অনুবাদে পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। তথাপি ভাষান্তরে বা মূল প্রাণসত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে মানবজীবনপ্রবাহকে গতিময় করে রাখে। নীরব প্রার্থনায় ডুবে যাবার অতল গভীরতা কথামৃতের গদ্যরীতির মধ্যে আছে। ধর্মবেত্তার কথা কার্যত সংকেত-লিপিকরের রচনায় যে ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে—সেই কথা-গদ্যের উৎস প্রসঙ্গেও শ্রীম বলেছেন: "সংসারে জড়িয়ে আছি, কাজে বাঁধা, ইচ্ছামতো ঠাকুরের কাছে যেতে পারিনা—তাই তাঁর কথাগুলো টুকে রাখতাম, কোন্ ভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি করে তা-ও, যাতে করে পরবর্তী সাক্ষাৎকারের আগে পর্যন্ত ঐসব কথা নিয়ে ভাবতে পারি, যেন সংসারের কাজকর্ম মনকে একেবারে গ্রাস করে না ফেলে। সুতরাং আমি নিজের উপকারের জন্যই নোটগুলি করেছিলাম।" বলা বাহুল্য, সমগ্র জাতির

ক্ষেত্রেই তা অনুসরণযোগ্য হয়েছে—কথামৃতের গদ্যরূপ তার ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে, উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে, স্মরণ-মনন ও ধ্যানের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত বলে এই গদ্যরূপের মধ্যে প্রত্যক্ষতা (direct) গুণ ও নাটকীয় বিবৃতি-ভঙ্গী একটি বড় দিক।

কথামৃতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অতুলনীয় সম্পদ নিহিত থাকলেও তাঁর গদ্যের মধ্যে রোমা রোলাঁ 'অবিরাম অনর্গল জ্ঞানের' দিকটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ সেই গদ্যরূপের মধ্যে ছিল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অতুলনীয় সম্পদ, তুলনা ও উপমার অফুরন্ত ভাণ্ডার, সরস রসিকতার পরিচয়। কথামৃতের গদ্যরূপের মধ্যে হৃদয়োত্থিত ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা আছে। তথাকথিত নিরক্ষরের মৌলিক চিন্তা ও অনুভূতি কথামৃতের মধ্যে আশ্চর্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এনেছে—মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিকে সম্মিলিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই গদ্য তাই 'প্রসাদস্নিগ্ধ কাব্যচিত্র, বাস্তবধর্মী কবিতা' কিংবা 'অভিনব, বর্ণনা ব্যঞ্জনায় অপরূপ' বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার রামকৃষ্ণের উক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন—'আমি কেন স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনি ?...তাঁর মুখের কথা অন্তরস্থ অগ্নির অবিরাম শিখা বিস্তার ছাড়া আর কিছু নয়।' শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *Men I Have Seen* গ্রন্থে রামকৃষ্ণের প্রজ্ঞাঘন উক্তি বিষয়ে বলেছেন—'জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মতো দুরূহ তত্ত্বকে এমন সহজভাবে ব্যাখ্যা করা চলে, একথা পূর্বে কখনও ধারণা করিতে পারি নাই। ...তাঁহার ব্যাখ্যাত তত্ত্বগুলি এতই প্রত্যক্ষ ও সহজ যে, যে-কোনো মানুষই তাহা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পারিত।"

রামকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় সুরেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি', প্রথম ভাগ (২৩ শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪) প্রকাশ করেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় (১২৯১) এ বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছিল—"...উক্তিগুলি এমন উদার, জ্ঞানগর্ভ এবং অন্তঃসারপূর্ণ যে, সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় ইহার সারবত্তা যথার্থরূপে বিবৃত হওয়া অসম্ভব। দু'একটি উক্তি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—'মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা যেমন অট্টালিকার ছাদে উঠা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি দিক দেখাইয়া দিতেছে।' কি গভীর কথা! কেমন উদার ধর্ম!" বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পরে, কিন্তু কথামৃত প্রকাশের আগে, সি. এইচ. টনী সুরেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থটির সূত্রে '*A Modern Hindoo Saint*' প্রবন্ধে রামকৃষ্ণ-প্রযুক্ত ঘরোয়া সংলাপধর্মী উপমার প্রশংসা করেন। মননের বিচারে রামকৃষ্ণ যে 'মৌলিক চিন্তার মানুষ' সে বিষয়ে ম্যাক্সমূলার তাঁর 'রিয়েল মহাত্মন্' প্রবন্ধের উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণের একত্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। সমসাময়িক পত্রিকায় ম্যাক্সমূলারের রামকৃষ্ণ-বাণী প্রসঙ্গে এগুলির মধ্যেকার 'উপমা ও রূপকের অপূর্ব সমাহারের' গদ্যরীতি প্রসঙ্গ 'পবিত্র প্রজ্ঞার রত্নভাণ্ডাররূপে' বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া গদ্যরীতির সংক্ষিপ্ত, সংহত, উদাহরণ ও

উপমায় পূর্ণ দিকের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি যখন লেখা হয়েছে—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীম বা 'এম' নামের অন্তরালে নিজ ডায়েরিতে রক্ষিত রামকৃষ্ণকথা ১৮৯৬ সাল থেকে প্রকাশ সুরু করেন। কথার সঙ্গে স্বয়ং কথককে বাস্তব পরিবেশে স্থাপন করে রামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনকে একই সঙ্গে তিনি তুলে ধরেন প্রথমত ইংরেজীতে। ইংরেজী কথামৃতের সমাদর লক্ষ্য করে শ্রীম বাংলায় কথামৃত রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

শ্রীম রচিত বাংলা কথামৃত গদ্যরীতির মধ্যে যে অসীম শক্তি ও ঐশ্বর্য এনে দিয়েছে—পূর্বে রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসংবলিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কথামৃতের গদ্যরীতি বক্তব্যধর্মী। কিন্তু বক্তব্য কোথাও কাহিনীরসকে ক্ষুণ্ণ করেনি। রূপকথা, উপকথা জাতীয় বক্তব্যের যেমন নিজস্ব লিপিমূল্য থাকে—আধ্যাত্মিকতাধর্মী এই গল্পগুলি যে গদ্যরূপের মধ্য দিয়ে বিবৃত, তার স্বতন্ত্র সাহিত্যমূল্য রয়েছে। ছোট ছোট সরল বাক্যে গদ্যরীতির মধ্যে স্বগতচিন্তা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বর্ণনা কতটা নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে নীচের উদ্ধৃত অংশটি তারই প্রমাণ ; "সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিয়া, বীজমন্ত্র জপিয়া, নামগান করিতেছেন। ঘরের বাহিরে অপূর্ব শোভা। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। বিমল চন্দ্র-কিরণে একদিকে ঠাকুরবাড়ী হাসিতেছে অপর একদিকে ভাগীরথীবক্ষে সুপ্ত শিশুর বক্ষের ন্যায় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে।" অধ্যাত্ম-উপলব্ধির তত্ত্ব—রসে ও রেখায় আটপৌরে গদ্যরীতিকেও কতখানি সহজ ও প্রবল শক্তিসম্পন্ন করে তুলতে পারে—তার পরিচয় পাই ; "লুনের লবণের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছলো, কতো গভীর জল তাই খপর (খবর) দেবে। খপর দেওয়া আর হল না। যাই নামা, অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক।" (কথামৃত—৩য় ভাগ)। উপমার ক্ষেত্রেও কথামৃতে এমন প্রাচুর্য যা গদ্যরীতিকে চিরকালীন সম্পদে পরিণত করেছে। সে উপমার মধ্যে নিরপেক্ষ বস্তুমুখীন দৃষ্টিকোণ একজাতীয় সচেতন শিল্পবোধ এনেছে। এই উপমা-গুলি প্রায় ক্ষেত্রেই চলিত গ্রাম্যভাষায় ব্যক্ত—তথাপি সে গদ্যভাষার মধ্যে প্রচণ্ড স্থিতিস্থাপকতা এবং ভারবহনের ক্ষমতা রয়েছে : "বিজ্ঞানীরা সাকার-নিরাকার দুই-ই লয়—অরূপ-রূপ দুই গ্রহণ করে। ভক্তি-হিমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞানসূর্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে যেমন জল তেমনিই হয়।" (কথামৃত ৪র্থ ভাগ। অনুভব সংবেদনায় ও উপমার সংকেতে মুখের গদ্য বাক্‌রীতি এখানে কাব্যস্পন্দিত হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতে কাব্য বলতে গদ্য-পদ্যের কোনো ভেদ নেই—অনুভূতিময় এবং প্রকাশসমুজ্জ্বল ভাষাই কবিতা। কথাকোবিদ রামকৃষ্ণ এখানে বাংলা গদ্যের স্বরূপস্রষ্টা।

কথামৃতের গদ্যরীতিকে আর একটি দিক সমৃদ্ধ করেছে—তা হ'ল কথোপকথনে

নাট্যগুণ। শ্রীরামকৃষ্ণ নামক এক অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব এ গ্রন্থে চলনে-বলনে, হাস্য-পরিহাসে, কীর্তনে-সমাধিতে পাঠকচিত্তকে দ্রষ্টার ভূমিকায় আবিষ্ট করে রাখে। স্মরণীয়, রামকৃষ্ণের গদ্যের এই নাট্যভঙ্গিমা নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে, প্রভাবিত করেছে। অধ্যাত্ম-উপলব্ধির রূপকে ও সংকেতে গদ্যে গল্প বলার যে রীতি শ্রীরামকৃষ্ণ এনেছেন—তা কখনও তাঁর মৌলিক সৃষ্টি, কখনও পূর্ব-প্রচলিত লোককথা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু লক্ষণীয়, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধের অদ্ভুত সামঞ্জস্য এর মধ্যে স্বতন্ত্র নিপুণতা এনেছে। বিশ্বসাহিত্যের গল্পসংগ্রহে পঞ্চতন্ত্র, ঈশপ, জাতক এবং বাইবেলের মতো কথামৃতের গদ্যরীতি পাশাপাশি ঠাঁই পাবার যোগ্য। কথামৃতের এই জাতীয় সহজ গদ্যগল্পগুলি—'ভাবের ঘরে চুরি', 'মেছুনীর ঘুম আসা,' 'স্বাতী নক্ষত্রের জল পাওয়া', 'হাতী নারায়ণ মাহুত নারায়ণ' এক্ষেত্রে চিরন্তন সম্পদ। উদ্দেশ্যমুখীন হয়েও গল্পগুলির মধ্যে নিজস্ব রসের আবেদন রয়েছে। গদ্যরীতির আঙ্গিক এখানে এমনই নিটোল যে, ছোটগল্পের রসকেন্দ্রে অবস্থান করেও তা অব্যর্থ শিক্ষাপ্রদ।

কথামৃতের গদ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বুদ্ধি ও মেধার সমন্বয়ে সৃষ্ট প্রবচন ও প্রবাদগুলি—যা কোনো বিশেষ পরিবেশে ব্যবহৃত হয়েও নির্বিশেষ রসভাষ্যে পরিণত হয়েছে। গদ্যভঙ্গীর মধ্যে গভীরতা ও গাঢ়-সংক্ষিপ্ত উক্তি লোক-প্রজ্ঞার চিরন্তন উৎসে পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির জীবনরূপও এর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কথামৃতের গদ্যরীতিতে ব্যবহৃত লোকসংগীত অনেক সময় উচ্চাঙ্গের জীবনসংগীতের রূপ ধরেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, জীবনে সমন্বয়ের যে বাণীর উপর জোর দিয়েছেন—কথামৃতে ব্যবহৃত উপমা-চয়নের মধ্যেও সেই সমন্বয়ের রূপ স্পষ্ট। পূর্বেই বলেছি—কাহিনী ও উপমা-চয়নের মধ্যে ঐতিহ্যলব্ধ, পুরাণাগত দিক যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি তাঁর অবিস্মরণীয় মৌলিকতা ও রসদৃষ্টি এর মধ্যে আছে। কথামৃতের গদ্যরীতির বাণীর মধ্যেও তাই ব্যবহারিক জগতের সমন্বয়ের রূপক স্বাতন্ত্র্য এনেছে।

বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের এই দুই বরেণ্য বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপচারী বিবরণ কথামৃতে আছে। কিন্তু সেই গদ্য-বিনিময়ের ক্ষেত্রেও তাঁরা দু'জনে শ্রোতা—কথার রাজা স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব। দক্ষিণেশ্বরের সেই ছোট্ট ঘরটিতে বাংলা গদ্যের অমৃত-অনুশীলনের দিকটিকে ভুললে চলবে না। বিবেকানন্দের বক্তব্যে সেই স্বীকৃতি রয়েছে—"ঠাকুরের বাংলাভাষা ভারী চমৎকার। একেবারে pure—খুব wit আছে।" 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' সেই বিশ্বাস ও সংকল্প আরও দৃঢ় এবং স্পষ্ট—"ঠাকুরের আগমনে, ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে—এখন সব নূতন ধাঁচে গড়তে হবে।" স্বামীজীর নিজস্ব সাধু ও চলিত গদ্য-রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে এই উপলব্ধির সক্রিয় দিকটি বাংলা গদ্যের বিবর্তনে স্মরণীয়। সুভাষচন্দ্র, বিনয় সরকার, সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যরীতিতে রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দের গদ্যরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসরণ ও প্রয়োগভঙ্গী সক্রিয়। বনফুলের গল্পকণিকা সৃষ্টির অসামান্য শিল্প-প্রয়াসের মধ্যেও কথামৃতের গদ্যরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অধ্যাত্মরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ—কথামৃত গ্রন্থে জ্ঞানীর উপরে দেখেছেন বিজ্ঞানীকে। জ্ঞানীর ঐক্যানুভূতি লাভ করেও যে-সাধক বিশ্বজগতে সেই পরম সত্যকে বহুরূপে অনুভব করেন এবং সেবা করেন—তিনিই বিজ্ঞানী। কথামৃতের গদ্যরীতি সত্যকে বহুরূপে অনুভব করবার বিজ্ঞান।

প্রসঙ্গ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে সঙ্গীত

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

সাধারণভাবে গদ্যভাষায় সামগ্রিক ভাবপ্রকাশ অসম্ভব হলে সাঙ্গীতিকী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। আধ্যাত্মিক বা সূক্ষ্ম মানবিক ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেও কবিতার বা সঙ্গীতের আশ্রয়গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। গদ্য ভাষায় যা বলা যায় না সেটা বোঝাবার জন্য ছন্দের দোলা দরকার হয়ে পড়ে। 'আবেগের বেগকে' প্রকাশের জন্য ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাব্যভাষা না নিলেই নয়। "শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক ভঙ্গী ও বিশেষ গতি দেওয়া যায়, তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও বেশী-কিছু প্রকাশ করে। এই বেশীটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি, শুনছি, তার সঙ্গে অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই বলে রস।···এই জন্য বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।" [রবীন্দ্রনাথ]।

বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্গত ধর্মসাহিত্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' সঙ্গীতের উপস্থিতি অনেকখানি যেন 'অনুভূতি লোকের বাহনের কাজে' প্রযুক্ত। চরাচরব্যাপী অনুভূতির সান্দ্র তন্ময়তাময় কথামৃত সঙ্গীতের আরাত্রিকায় জীবনের সর্ব অর্গল উন্মুক্ত করে। কথা যেখানে শেষ হয়, গদ্য যেখানে অনুরণন তুলতে পারে না, সঙ্গীত সেখানে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়—যুগ যুগান্তরের উন্মোচিত পর্দার অন্তরাল থেকে গমকে-গমকে উত্থিত হয় সেই অসাধারণ সুরসঙ্গীতগুলি। স্মর্তব্য, বাংলা বা ভারতীয় ভাষায় রচিত ধর্মসাহিত্য ইতিপূর্বে সঙ্গীতাশ্রয়ী হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, তা মানবচেতনার মুক্তিসূত্র বিভ্রান্ত মানবযাত্রীর হাতে তুলে দিয়েছে,

এবং অধ্যাত্মসাধকের অন্তর্লীন চেতনার মধুবিন্দু ক্রমক্ষরিত হয়েছে সঙ্গীতের সপ্তস্বরা সুরমূর্ছনায়। কিন্তু কথামৃত প্রধানত গদ্যে রচিত। তথাপি লক্ষ্য করি, গদ্যাশ্রয়ী কথামৃত অনর্গলিত অমৃত-নিস্যন্দী রসপ্রবাহে। অধিকন্তু কথামৃতে আছে অজস্র সঙ্গীতের সম্ভার। সেই সঙ্গীতগুলি কথামৃতের আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে যেন নীহারিকাপুঞ্জের অনির্বাণ জ্যোতিতরঙ্গে। কথামৃতে গানের প্রাসঙ্গিকতা এমনই। সঙ্গীতের ধারা শ্রীরামকৃষ্ণের চিদাকাশ থেকে নেমে আসে মর্ত্যভূমিতে— মরুভূমির রিক্ততায় পথভ্রষ্ট যাত্রীদের জীবন শ্যামল সজীবতায় মণ্ডিত হয়। গান গেয়ে ওঠেন প্রাণের ঠাকুর, দয়াল ঠাকুর—নেমে আসেন মেঠো পথ ধরে এই শতাব্দীর রাজপথে।

মহান ধর্মসাধকেরা তাঁদের অধ্যাত্মচেতনায় উদ্দীপ্ত বাণীর জাগরণে সঙ্গীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অনিবার্যতা স্বীকার করেছেন। নানকের, কবীরের, তুলসীদাসের, সুরদাসের সঙ্গীত, শ্রীচৈতন্যের চেতনায় উদ্বোধিত বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী, সঙ্গীতের অপরূপতায় উদ্ভাসিত। ভারতীয় সভ্যতার আদি পর্বে গদ্যের প্রান্তর অপেক্ষা শ্লোকের কল্লোল। রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত তো শক্তিসঙ্গীতের গঙ্গোত্রী। একালে আবির্ভূত ধর্মসাধকদের মধ্যে অনন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ; তাঁর কথামৃত গদ্যসাহিত্যের কাঠামোয় কবিতার রূপকল্পে আকারিত, আর সঙ্গীতের কল্লোলমুখরতায় ধ্বনিত। কথামৃতের গদ্য যদি ঝলসিত হয় স্পষ্টতায়, চারিত্রে শাণিত দ্যুতিতে—তবে সঙ্গীত সেখানে শ্যামলায়মান বর্ষার সঞ্চরমান মেঘখণ্ড, যার অন্তরে রয়েছে বর্ষার বারিধারা, যাতে ফুল ফোটে, রিক্ত শ্মশানের বুকে আন্দোলিত হয় শ্যামপত্রপল্লব।

এ তো গেল অনুভূতির কথা। অপরূপ কথামৃতকে পরিসংখ্যানের বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা যেন অপরাধ মনে হয়। কেননা, কথামৃত, শুধু অসাধারণ নয়, অসাধারণোত্তর। যেখানে সমস্ত সৃষ্টির অঙ্কুর বিনষ্ট, সূর্য দৃষ্টিহীন, যেখানে আভাহীন বহ্নি জ্বলে —সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে কথামৃত অনন্তবিস্তারী অমৃতসাগর—আর কথামৃতের সঙ্গীতগুলি যেন উর্মিমালা। সেই উর্মিমালায় অরূপ রহস্যের-উদ্ঘাটন।

তবু হিসাব নিতে হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মোট পাঁচটি ভাগ। পাঁচটি ভাগের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে সঙ্গীতের অজস্র চাঁদমালা। মোটামুটি একটা সাধারণ হিসাবে দেখা যায় যে ; প্রথম ভাগে ৪৬টি, দ্বিতীয় ভাগে ৯৯টি, তৃতীয় ভাগে ৮৯টি, চতুর্থ ভাগে ১৫৬টি, এবং পঞ্চম ভাগে ৭০টি সঙ্গীত আছে। এই হিসাবে অবশ্যই স্তোত্র বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টাংশে ১২টি সঙ্গীত আছে। সঙ্গীতে যারা অংশ-গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ত্রৈলোক্য সান্যাল, তারাপদ, কীর্তনীয়া, বৈরাগী, বৈষ্ণবচরণ, নীলকণ্ঠ, রামতারণ, সুরেন্দ্র, তারক, শরৎ, গোস্বামী, রাজনারায়ণ প্রভৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে গীত অধিকাংশ সঙ্গীতই রামপ্রসাদী। রামপ্রসাদী ব্যতীত তিনি কবীরের ভজন, দাশরথি রায়, রামদুলাল নন্দী প্রভৃতির গান গেয়েছেন। "কথামৃতের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় রামকৃষ্ণের সঙ্গীত-প্রীতি আর সঙ্গীতকৃতির পরিচয় জাজ্বল্যমান, ১৭৯ দিনের মধ্যে ১০৮ দিন তিনি গেয়েছেন স্বয়ং, ৬০ দিন গান শুনেছেন গায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে।...১০৬ দিনে ১০৫ খানি গান গেয়েছেন রামকৃষ্ণ। তার মধ্যে ৫৬টি গেয়েছেন ১ বার, কিন্তু ৪৯টি গান একাধিকবার। কোনোটি ৮ দিন, কোনোটি ৭ দিন, কোনোটি ৬দিন কোনোটি ৫ দিন, কোনোটি ৪ দিন, তিনদিন, দুদিনও তাঁর গাইবার কথা জানা যায়।"[১]

কথামৃত-পাঠে জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শশধর তর্কচূড়ামণি, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতকীর্তিদের। তিনি যে কত বিচিত্র প্রসঙ্গে গান গাইতেন, তার ইয়ত্তা নেই। "বিভিন্ন অধ্যাত্মবিষয়ে আলোচনার সময় গান। শিক্ষা ও উপদেশদানের উদ্দেশ্যে গান। একেক প্রকার ঈশ্বরীয় ভাবের অনুপ্রেরণায় বা উম্মাদনায় গান। শোকে দুঃখে সান্ত্বনা দানের জন্য গান। মৃন্ময়ী চিন্ময়ীর উদ্দেশ্যে গান। মা কালীর সঙ্গে কথোপকথনে গান। একাকী আপন মনে গান, সঙ্গীত-গুণী কিংবা অনুরাগী শ্রোতার অনুরোধে গান। আকস্মিক ভাবাবেগে গান। সমাধি ভঙ্গে গান। গান গাইতে-গাইতে সমাধি লাভ।"[২] তিনি কি ধরনের গান গাইতেন, এমন প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে—"আমি কখনো পুজো, কখনো-বা ধ্যান, কখনো-বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখনো তাঁর নাম করে নাচি।"[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও যাঁদের গান গাইতেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে—স্বনামধন্য পাঁচালীকার ও গায়ক দাশরথি রায়, রাজা রামকৃষ্ণ রায়, নরেশচন্দ্র, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা নন্দকুমার, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, ত্রৈলোক্য-নাথ সান্ন্যাল, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি। তিনি শ্যামাসঙ্গীত ব্যতীত কীর্তনও গাইতেন। তাঁর গীত সঙ্গীতের মধ্যে একটি কীর্তনাঙ্গ কালীগীতি পাওয়া যায়। তবে তিনি যতগুলি কীর্তন গেয়েছেন, অধিকাংশই লীলাকীর্তন। শ্রীরামকৃষ্ণ গায়করূপে কীর্তনে, শ্যামাসঙ্গীতে ভজনে ও অধ্যাত্মগানে সিদ্ধ। তাঁর গানে তৃপ্ত হয়েছেন সকলেই। "নরেন্দ্রতুল্য ওস্তাদী শিক্ষাপ্রাপ্ত মার্জিতকণ্ঠ গায়ক যে তাঁকে অনুরোধ করে বিশেষ কোনো গান শুনেছেন তা শুধু গুরুভক্তিতে নয়, রামকৃষ্ণের সঙ্গীত গুণে।...প্রখ্যাতনামা গায়ক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কিংবা বৈষ্ণবচরণ, নরোত্তম, বনোয়ারী, শ্যামাদাস বা সহচরী প্রমুখ কীর্তন গায়ক-গায়িকার সামনে

১ সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পৃঃ ৯১—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।
২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৬২।
৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম ভাগ (পৃঃ ২২২) শ্রীম কথিত।

তিনি সপ্রতিভভাবে গান শুনিয়েছেন।...অথচ তিনি তো প্রচলিত অর্থে গায়ক নন। ধর্মজগতের এমন এক মহাপুরুষ তিনি, সকলকে ঈশ্বরমুখীন করবার জন্যে যাঁর আবির্ভাব। কিন্তু গায়কের যা প্রধান গুণ—রঞ্জনী-শক্তিতে শ্রোতাদের মোহিত করা, গানের ভাব শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করা, তাঁর ছিল পূর্ণমাত্রায়।"[৪]

নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ কথামৃত গ্রন্থে অন্যতম গায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনি পাঁচটি ভাগে প্রায় ৯০টির অধিক গান গেয়েছেন। তাঁর গীত সঙ্গীতের মধ্যে আছে ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, সুরদাস, নানক প্রভৃতি রচিত ভজন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতি। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়েছেন, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রচিত গানও শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রচিত আদি ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির অন্যতম 'দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন' গানটি শোনান ঠাকুরকে নরেন্দ্রনাথ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রচিত 'মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়' গানটি স্বামীজী গেয়েছিলেন। যদুভট্ট ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্রুপদ, ব্রহ্মসঙ্গীত স্বামীজী গেয়েছেন।

সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে উন্মোচিত হতেন, এবং অপরকে উন্মোচিত করতেন তার অজস্র দৃষ্টান্তের একটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলছি ঃ

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাটীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।...আজ শনিবার, ২২-এ ভাদ্র ১২৯১; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি।... শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গান গাইবেন, তাহার আয়োজন হইতেছে। কীর্তনাঙ্গের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন—'কীর্তনে তাল সম্ এসব নাই—তাই অত লোকে ভালবাসে। নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান—সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।

গান—যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥

নরেন্দ্র আরও দুই একটি গান করবার পর বৈষ্ণবচরণ গান গাইতেছেন—

চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)
ওহে বঙ্কুরায় ভুলে আছ মথুরায়।
হাতীচড়া জোড়াপড়া, ভুলেছ কি ধেনুচরা,
ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"হরি হরি বল রে বীণে" ঐটে একবার হোক্ না।

৪ সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পৃঃ ৭৬, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন—

"হরি হরি বল রে বীণে।
শ্রীহরির চরণ বিনে পরমতত্ত্ব আর পাবিনে॥
হরিনামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে,
হরি যদি কৃপা করে তবে ভবে আর ভাবিনে।
বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাহি সম্বল,
দাস গোবিন্দ কয়, দিন গেল, অকূলে যেন ভাসিনে॥

গান শুনিতে-শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—আহা! আহা! হরি হরি বল।

এই কথা বলিতে-বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন, ও দর্শন করিতেছেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কীর্তনীয়া ঐ গান সমাপ্ত করিয়া নূতন গান ধরিলেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়।"

কীর্তনীয়া যখন আখর দিচ্ছেন, 'হরি প্রেমের বন্যে ভেসে যায়,' ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার বসিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া আখর দিতেছেন—একবার হরি বল রে।

ঠাকুর আখর দিতে-দিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন ও হেঁটমস্তক হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, তাকিয়াটি সম্মুখে। তাহার উপর শিরোদেশ ঢলিয়া পড়িয়াছে। কীর্তনীয়া আবার গাইতেছেন—

'হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধুর স্বরে'।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম রাম রাম রাম হরে হরে॥

গান— হরি বলে আমার গৌর নাচে
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে।
রাঙ্গাপায়ে সোনার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে॥
থেকো রে বাপ নরহরি থেকো গৌরের পাশে।
রাধার প্রেমে গড়া তনু, ধূলায় পড়ে পাছে।
বামেতে অদ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই।
তার মাঝে নাচে আমার চৈতন্য গোঁসাই॥

ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আখর দিয়া নাচিতেছেন। (প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)।

সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

নাচিতে-নাচিতে ঠাকুর এক-একবার সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দশা। মুখে

একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির, ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বেড়িয়া-বেড়িয়া নাচিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্ধবাহ্যদশা—চৈতন্যদেবের যেরূপ হইত—অমনি ঠাকুর সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা নাই—প্রেমে উন্মত্তপ্রায়। যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন—অমনি একবার আখর দিতেছেন।

আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে। হরিনামের রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে।

ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ। সেই অবস্থায় নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—সেই গানটি—'আমায় দে মা পাগল করে'।

ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—'আমায় দে মা পাগল করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ঐটি—চিদানন্দ সিন্ধুনীরে।'—

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদানন্দের সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি॥
মহাযোগে সমুদয় একাকার হইল,
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল॥
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া,
বলরে মন হরি হরি॥···

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ— আর ঐটে—'হরিরস মদিরা'?

নরেন্দ্র— হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে॥

ঠাকুর আখর দিতেছেন—

প্রেমে মত্ত হয়ে হরি হরি বলি কাঁদরে।
ভাবে মত্ত হয়ে হরি হরি বলি কাঁদরে!" [৫]

'সর্বোচ্চ ধর্মসাহিত্য ও জীবনীসাহিত্য' রামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে সঙ্গীত ভাব-নিয়ন্ত্রী ভূমিকায় অবতীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল 'মধুর কণ্ঠ, যাত্রার প্রতি আসক্তি, দলবেঁধে অভিনয়।' শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঋষি এবং শিল্পী যে কিভাবে সম্মিলিত হয়ে-

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ : পৃঃ ১২৬-১২৮।

ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় কথামৃত গ্রন্থে গীত সঙ্গীতাবলীতে। "রামকৃষ্ণ, রোঁলার কাছে, 'ভারতের মহাসঙ্গীত'। এই সঙ্গীতের সকল সুর রামকৃষ্ণের রচনা নয়ঃ 'এই মহাসঙ্গীত আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত-প্রতিভাদের সৃষ্টিগুলির মতোই অতীত হইতে সংগৃহীত বহু বিভিন্ন সুরের সমাবেশে রচিত।' কিন্তু রামকৃষ্ণই সকল পুরাতন সৃষ্টিকে 'সার্বভৌম ব্যক্তিত্বের দ্বারা সংহত' করে 'ঐশ্বর্যপূর্ণ ঐকতান' গড়ে তুলেছিলেন—এবং সেজন্য 'তাঁর নাম-চিহ্ন নিয়ে' নবযুগের নামাংকন হচ্ছে।…এই রামকৃষ্ণ নিরন্তর জাগ্রত করতেন 'ঘুমন্ত অরণ্য-সৌন্দর্যের নির্ঝরগুলিকে এবং নিজের যাদু-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উষ্ণস্পর্শে তাহাদের করিয়া তুলিতেন উত্তপ্ত'।"

"অধ্যাত্মজগতের এই মহানেতার পক্ষে মহাশিল্পী না হয়েও উপায় ছিল না, কারণ, শিল্পময় ভাবাবেগ এবং সৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বসিত একটি অনুভূতির মধ্য দিয়াই ভগবানের সহিত রামকৃষ্ণের প্রথম মিলন ঘটে।"

"শিল্পী ও প্রেমিক-কবির জাতি বাঙালী। তাই বাঙালীরা এই পথকেই বিশেষভাবে আপন করিয়া লইয়াছে। এ পথের প্রেরণা ও নির্দেশ দিয়েছেন ভাবোন্মোত্ত কৃষ্ণপ্রেমে পাগল শ্রীচৈতন্য। এ পথের সঙ্গীত দিয়াছেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—মধু-মাখা গান তাঁহাদের। তাঁহারা ছিলেন বাংলা মাটির সুবাসিত ফুল। তাঁহাদের গন্ধে বাংলার মাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মাতাল রহিয়াছে। রামকৃষ্ণের আত্মাও সেই একই পদার্থে প্রস্তুত ছিল।" [৬]

মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত প্রতিভার উৎস এখানেই, আর সেইজন্যই কথামৃত অমরত্বের আসনে অধিষ্ঠিত বিশ্বের 'সর্বোচ্চ ধর্মসাহিত্য ও জীবনীসাহিত্য'।

৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ: দ্বিতীয় খণ্ড—শংকরীপ্রসাদ বসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও মাস্টার মহাশয়

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রমাণপুঞ্জের আঘাতে অলৌকিক, অপার্থিব ও রহস্যময় সত্তার প্রতি বিশ্বাস ও বিস্ময় ক্রমেই বোধের মধ্যে ধরা দিচ্ছে। সুতরাং ঈশ্বরচেতনাও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-যন্ত্রের কবলীভূত হয়েছে। একালের নব্য শিক্ষিতের কাছে ভূত ও ভগবান প্রায় একই প্রকার। তবু আমরা অলক্ষ্যে, নির্জনে নিঃসঙ্গ প্রান্তরে ভূতের ভয় করি, যদিও চেতনমনে ভূত বিশ্বাস করি না। প্রমাণ করা যায় না বলে ঈশ্বর অসিদ্ধ এমন কথাও তার্কিক বলতে পারেন। কিন্তু কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সহসা আমরা মানুষের ধারণাতীত একটি সর্বাতিগ, সর্বশক্তিমান, অধৃষ্য চেতনায় ফিরে যাই কেন? মানুষের শক্তি যতদিন সীমাবদ্ধ থাকবে, ততদিন তাকে তার চেয়ে বৃহত্তর শক্তির কাছে মাথা নত করতেই হবে। প্রচণ্ড প্রবৃত্তি তাকে বলপূর্বক মাথা নত করায়, প্রচণ্ডতর প্রবৃত্তি তাকে রক্তমাংসের কারাগারে বন্দী থাকতে বাধ্য করে। এই সীমার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির পথ আছে। তা হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যেই সেই অধরা অপ্রাপণীয়া শক্তিকে উপলব্ধি করা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত নতুন করে পড়তে গিয়ে সেই কথাই মনে জাগছিল। মাস্টার মহাশয় জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শন ও মননের একনিষ্ঠ ছাত্র। জ্ঞানে যতটুকু জানা যায়, তিনি তার চূড়ান্ত উচ্চে উঠেছিলেন। কিন্তু নিছক জ্ঞানানুশীলনে তো চিত্তের প্রদাহ মেটে না। নিম তিক্ত, শর্করাখণ্ড মিষ্ট, শুধু জ্ঞানে জানলেই কি তিক্ততা ও মিষ্টতার স্বরূপ জানা যায়? আসলে চাই আস্বাদন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জ্ঞান-তাপস মহেন্দ্রনাথ উপলব্ধির দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই নিঃশ্রেয়স্ উপলব্ধি, যাকে শাস্ত্র বলেছেন বাক্‌পথাতীত, তা মাঝে মাঝে কায়া গ্রহণ করে। হয়তো তার পিছনে কোনো ঐশী প্রেরণা থাকে, ঐশী অর্থাৎ যাকে আমরা হৃদয় ও চেতনার দ্বারা অবধারণ করতে পারি না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বহু যুগের তপস্যা দিয়ে তৈরি এমন একটা সত্তা, যাঁর মধ্যে সাকার-নিরাকার, গুণাতীত ও গুণময়, অবিকল্প ও নির্বিকল্প—সমস্ত দ্বি-বিভাজিত (dichotomy) সত্তার পূর্ণ মিলন হয়েছে। দার্শনিক 'শ্রীম' সেই সত্যের শুধু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই যথেষ্ট মনে করেননি, তাকে জিজ্ঞাসু, মুমুক্ষু ও ভক্তের কাছে একটা বিচিত্র মানবধর্মের মধ্যে স্থাপন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিজ্ঞানালোকিত সংশয়ী যুগেই আবির্ভাব, এবং তাঁর আবির্ভাব কীভাবে এবং কতদিক থেকে মানুষের ইতিহাসকে নতুন পথ দেখিয়েছে তা ভবিষ্যতের সমাজ-বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকগণ বিচার ব্যাখ্যা করবেন। আমরা এখানে শুধু কথামৃতের সাহিত্যগুণ ও ভাষারীতির কথা বলছি।

সংলাপের মধ্য দিয়ে ধর্মজিজ্ঞাসা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন রীতি। উপনিষদের ঋষি, ষড়দর্শনের তাত্ত্বিক, টীকাকার ও রচনাকারেরা আলাপের মধ্য দিয়েই চিত্তের মালিন্য দূর করে তাকে মার্জিত দর্পণের মতো স্বচ্ছ করতে চেয়েছিলেন, যাতে তার উপরে চেতনার যথার্থ প্রতিফলন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, ভক্ত ও অনুরাগীদের নিয়ে যে আলাপ করতেন, রহস্যকৌতুক করতেন, ছোট ছোট কথা-উপকথার প্যারাবেলের সাহায্যে নিগূঢ় তত্ত্বকথা বলতেন—প্লেটো-সক্রেটিস, মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান তাত্ত্বিক ও সাধক এবং মুসলিম সুফী রসিকদের উপলব্ধি ও উক্তির সঙ্গে তার গোত্রগত মিল। কিন্তু অমিলও বড়ো কম নয়। পূর্বসূরীরা যখন শিষ্যদের উপদেশ দিতেন, কথাচ্ছলে গল্পের আধারে ইতিকর্তব্য নির্ধারণে সাহায্য করতেন, তখন তাঁরাও জানতেন যে তাঁরা শ্রোতাদের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের জন্যই উপদেশ দিচ্ছেন, শ্রোতারাও অবহিত ছিলেন যে, তাঁরা আচার্যের মুখ থেকে জীবন সম্বন্ধে নতুন পথের সন্ধান লাভ করছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ নীতিমার্গীয় ও জীবনচর্যামূলক হলেও তা বহুস্থলে তত্ত্বের গুরুভার কাটিয়ে উঠে সংলাপের মধ্য দিয়ে শিল্পরস সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। তাঁর মুখের সেই সমস্ত বাক্যসমষ্টিকে মহেন্দ্রনাথ আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে এমনভাবে কথামৃতে ধরে রেখেছেন যে, বসওয়েল প্রভৃতি জীবনীকারদের বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছেন। বাংলা গদ্যরীতির ও শিল্পরসের এক আশ্চর্য স্বাদ এই রচনায় ফুটে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যকে ঠিক তাঁরই ভাষায় পরিবেশন করা খুবই দুরূহ। কেননা, কোনো মহাপুরুষের বাণীকে রেখার আখরে স্থায়ী রূপ দিতে গেলেই তাতে রচনাকারের ব্যক্তিত্ব কোনো-না-কোনো প্রকারে প্রতিফলিত হবেই। কিন্তু অতি আশ্চর্যের ব্যাপার, মাস্টার মহাশয় এইসমস্ত রচনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে লোকসমাজে ব্যাখ্যার জন্য অল্পস্বল্প সংযোজন করেছেন। কিন্তু ব্যাখ্যার দ্বারা মূলকে আচ্ছাদন করেননি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অনেকে ধর্মীয় প্রেরণার বশে অধ্যয়ন করে থাকেন, এর মধ্য থেকে জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধান করেন। এই গ্রন্থ সংকলনের অন্যতম উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকেও এর মূল্য বিশেষ-ভাবে স্বীকারের যোগ্য। কথাসাহিত্য, নাটকীয়তা ও গীতিরসের ব্যঞ্জনা রচনা-গুলির প্রতি সাহিত্যরসিক পাঠককে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। এমন কি যিনি ভিন্নধর্মাবলম্বী, অথবা কোনো ধর্মমতই পোষণ করেন না, তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত ছোট ছোট সংলাপ ও কথিকাগুলিকে সাহিত্যের দিক থেকেই উপভোগ করতে পারবেন। ১৯০২ সালে কথামৃতের কিয়দংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন নানা পুষ্পপল্লবে ভরে উঠেছে। কিন্তু কথামৃতের সমধর্মী আর কোনো রচনা দ্বিতীয়বার বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়নি। আজ এই নাস্তিকতা ও বৈজ্ঞানিকতার মধ্যাহ্নেও এই

গ্রন্থের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। বরং ক্রমেই নানা ধরনের নানা মানসিকতার পাঠক এর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করছেন। এর মধ্যে চেষ্টাকৃত সাহিত্য ফলাবার কৃত্রিম চেষ্টা নেই, ধর্ম-উপদেশের দুর্বহ গুরুভার নেই, আছে জীবনের প্রতি বিস্ময়বোধ, জীবনাতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, চারিদিকের নর-নারীর প্রতি পরম মমতা। সর্বোপরি, রচনাগুলির মধ্য দিয়ে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেন চোখের সামনেই দেখতে পাই। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী মাস্টার মহাশয়ের কাছে কথামৃতের কিয়দংশ শুনে বলেছিলেন, "তোমার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনি ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।" সত্যই আমরাও যখন মাঝে মাঝে এই গ্রন্থের যে-কোনো একটা অংশ পড়ি, তখন মনে হয় তাঁকে যেন লেখাগুলির মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করছি। নিজেকে গোপন করে যিনি এইভাবে আমাদের জন্য বহু যুগের খাদ্য পানীয় সংগ্রহ করে রেখেছেন তিনি ধন্য, তাঁর পাঠকও ধন্য।

৫. শ্রীম ও তাঁর গ্রন্থ-সংবাদ

১৮৮২ ফেব্রুয়ারি মাস। দক্ষিণেশ্বর।

"গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল। ইংরাজি ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে।...সন্ধ্যা হয়-হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তপোষে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন।

"মাস্টার দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাম-গুণ-কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'যখন একবার হরি, বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রাম নাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হল।' আবার বলিলেন, 'সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।'...

"মাস্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন—এ সৌম্য কে—যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছে।...ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো।" [কথামৃত, ১-১/১]

৫ অক্টোবর ১৯২২। মর্টন ইনস্টিটিউশনের চার তলার ছাদ। ৫০ আমহার্স্ট স্ট্রীট।

"আজ কোজাগর লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। সুনির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র।...শ্রীম এক দৃষ্টে চন্দ্র দর্শন করিতেছেন। চাঁদের ভিতর কি যেন দেখিতেছেন আর আনন্দে ভরপুর হইতেছেন।

"শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—'সেই পূর্ণিমা, সেই চাঁদ, সেই রাত, সবই আছে—নাই কেবল তিনি—রামকৃষ্ণ-শশী। সেই আনন্দময় দিব্যবালক, সেই বেদপুরুষ।

" 'আটত্রিশ বছর পূর্বে এই রাতে কলুটোলায় এসেছিলেন নবীন সেনের বাড়ীতে। ইনি কেশববাবুর বড় ভাই। আহা, ঠাকুর কি ইম্প্রেসন্-ই করে দিয়েছেন মনে। অপরের কাছে আটত্রিশ বছর, আমাদের মনে হচ্ছে—এই সবে হল।

" 'সেই রাতে ঠাকুর তিনটি গান গেয়েছিলেন, নৃত্যও করেছিলেন। কি মধুর সে দৃশ্য। কেশব সেনের মা নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখনো দেখছি সেই নাচ গান। আমরা তখন শ্যাম-পুকুরে রয়েছি। বাসা খালি রেখেই পলায়ন, এমনি টান। খেয়ালও হয়নি যে বাড়িতে বিপদ হতে পারে। উপরে যাইনি, নীচে রোয়াকে বসে সব দেখেছি। রাত বারোটায় বাড়ি ফিরি।

" 'ঠাকুর কিন্তু জানতে পেরেছিলেন। পরদিন বললেন, হাঁ, গোপনে খুব ভালো। ঈশ্বরকে ডাকতে হয় গোপনে—কেউ না জানে। তাঁর অগোচর তো কিছু নেই, অন্তর্যামী পুরুষ।

" 'উঃ আটত্রিশ বছর হয়ে গেল। আমার মনে হচ্ছে, এই মাত্র হল!' "

[শ্রীম-দর্শন ; তৃতীয় ভাগ, ১৭-১৮]

শ্রীম-র জীবনরূপ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

কথামৃতের লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'শ্রীম' ছদ্মনামে অধিক পরিচিত, রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীতে তিনি মাস্টার মহাশয়; জন্ম ১৮৫৪, ১৪ জুলাই, দেহান্ত ১৯৩২, ৪ জুন; মধ্যে ৭৮ বছরের জীবন, যার দুই ভাগ—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে এবং সাক্ষাতের পরে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ১৮৮২, ২৬ ফেব্রুয়ারি, [?] তখন বয়স ২৮। শ্রীম'র পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর জীবনই যদিচ আত্মার সৃষ্টিশীল অভিযান—পূর্ববর্তী জীবন কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে সামান্য ছিল না। রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষায় তিনিই নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা কৃতী—এনট্রান্সে দ্বিতীয়, এফ-এ-তে পঞ্চম ('অঙ্কের একটি খাতা না দিয়াও'), বি-এ-তে তৃতীয়। এই প্রদীপ্ত ছাত্র ইংরাজী, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতি পড়িয়েছেন রিপন, সিটি ও মেট্রপলিটান কলেজে। তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাতেই বেশি সময় কেটেছে; শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি বিদ্যাসাগরের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধানশিক্ষক, শেষে ঝামাপুকুর মর্টন ইনস্টিটিউশন কিনে তার পরিচালক। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের কেউ-কেউ তাঁর ছাত্র, পরেও তাঁর ছাত্ররা অনেকে রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসী। এর জন্য খ্যাতি বা অখ্যাতি রটেছিল—'ছেলেধরা মাস্টার'। দেহান্তের পরেও সেই খ্যাতি সম্পূর্ণ যায় নি, কারণ রামকৃষ্ণ-সংঘের অনেক সন্ন্যাসী কথামৃত পড়েই প্রথম রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের কথা জেনেছেন। এখনও তাই ঘটছে।

শ্রীম'র দেহত্যাগের পরে স্বামী রাঘবানন্দ প্রবুদ্ধ ভারতে ১৯৩২, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর—এই তিন সংখ্যায় 'মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত' নামক একটি তথ্যবহুল অথচ গভীররসাত্মক প্রবন্ধ লেখেন। তার থেকেই উপরের জীবনী সংক্রান্ত সংবাদের অনেকগুলি সংগ্রহ করেছি। উজ্জ্বল ছাত্র এবং সফল অধ্যাপক শ্রীম, দেশ-বিদেশের জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের কথা না বললেও চলে, কিন্তু দুটি গ্রন্থ তাঁর খুবই প্রিয় ছিল দেখি, যেগুলি অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে তাঁকে সাহায্য করেছিল, তার একটি বাইবেল (প্রবুদ্ধ ভারতের শোকবার্তায়, ১৯৩২, জুলাই, তাঁর বাইবেল-প্রীতির বিষয়ে লেখা হয়েছিল—'খৃস্টের বাণী তার মুখ থেকে তাঁর প্রভু রামকৃষ্ণের বাণীর মতোই অনর্গল নির্গত হত; মনে হত, সমগ্র বাইবেলই তাঁর কণ্ঠস্থ")—দ্বিতীয়টি চৈতন্য-চরিতামৃত, যার বিষয়ে তিনি স্বয়ং বলেছেন, (গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন): "ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমি পাগলের মতো ঐ বই পড়তাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের আগে শ্রীম'র হীরো ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর স্ত্রী কেশবের পরিবারেরই কন্যা। কেশব কিভাবে শ্রীমকে অভিভূত করেছিলেন, সে বিষয়ে রাঘবানন্দ লিখেছেন : "মাস্টার-মহাশয় প্রায়শঃ বলতেন, কেশব এমন মধুর ভাষায় ও কণ্ঠে প্রার্থনা করতেন, প্রফেটের উদ্দীপ্ত আলোকে তাঁর মুখ এমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠত যে, মন-প্রাণ আলোড়িত হয়ে যেত। কেশব যেন দেবতার রূপ ধারণ করেছিলেন তাঁর কাছে।" শ্রীম বলতেন, তিনি পরে বুঝেছেন, কেন কেশব তাঁকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন : কেশব বস্তুতঃ প্রতিফলিত করছিলেন রামকৃষ্ণেরই আলোক— যেহেতু তারই মধ্যে কেশব রামকৃষ্ণের দ্বারা গৃহীত হয়েছেন।

মহেন্দ্রনাথের রামকৃষ্ণ-লাভের কাহিনী এখানে বর্ণনায় প্রয়োজন নেই ; তা তাঁর বোধিলাভেরই কাহিনী, যার সিদ্ধিফল ভক্ষণ করছে সমগ্র মানবজাতি। কিন্তু জানাতেই হয় কিভাবে প্রতি শ্বাসে রামকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি দিন কাটাতেন। ধ্যান— কেবল ধ্যান— ধ্যানই তাঁর জীবন—আর স্মরণ ও মনন। গৃহী তিনি—রামকৃষ্ণ তাঁকে ঘরছাড়া করেননি—সুতরাং ঘরেই থাকতেন—কিন্তু গবাক্ষপথে দেখতেন অনন্তকে। আশ্রয়ের মধ্যে নিরাশ্রয়ের সাধনা করতেন ; তাই মাঝে-মাঝে গভীর রাত্রে উঠে চলে যেতেন সেনেট হলের খোলা বারান্দায়, আশ্রয়হীন ভিক্ষুকদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে—চেতনার মধ্যে একান্ত করে এইটুকু জানতে—আমি একা এই পৃথিবীতে। না, আছেন ঈশ্বর, সর্বত্রই তিনি আছেন, বিশেষতঃ তাদের মধ্যে যারা তাঁকে পেতে চায়—সেই 'তাদের' মুখে ঈশ্বরজ্যোতি দেখার জন্য তিনি যেতেন গঙ্গাতীরে, সাধুদের মধ্যে, চেয়ে দেখতেন তীর্থযাত্রীদের—কোন্ আনন্দের বার্তা লেখা রয়েছে আননে-আননে।

শ্রীম'র কাছে সবই ঈশ্বরে রঞ্জিত। সকলেই তা অনুভব করত। তাই নিকট ও দূর থেকে কত মানুষ আসত তাঁর কাছে। তারা রামকৃষ্ণকে নিত্য জাগ্রত দেখত তাঁর দেহমন্দিরে। "সেই স্বর্গীয় জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে তারা ফিরে পেত [রামকৃষ্ণের দৈহিক অবস্থিতির] অতীত দৃশ্যগুলিকে, আর মোহিত হয়ে যেত ; পুরাতন দিনগুলিতে তারা বাস করত ঠাকুর ও তাঁর সন্তানদের সঙ্গে, পান করত ঠাকুরের কথামৃত। মাদ্রাজ, বোম্বাই, কুমায়ুন, আসাম এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে, আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে, যাঁরাই ঠাকুরের কথা শুনেছেন, আসতেন তাঁর কাছে, কেননা রত্নভাণ্ডারের মালিক তিনি, আর অকাতরে বিলিয়েছেন সেই ঐশ্বর্য।...তাঁর গৃহ হয়ে উঠেছিল যথার্থই তীর্থভূমি।" ভক্তরা কী লাভ করত, কোন্ বাণীকে, আবার কখনো মৌন বাণীর সংক্রমণকে—রাঘবানন্দ সে সম্বন্ধে আরও লিখেছেন : "এপ্রিল ও মে মাসের মধুর উত্তপ্ত দিনগুলিতে, ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের ছাদের বাগানে, চারিদিকে সেখানে লতা পুষ্প, উপরে আকাশের চন্দ্রাতপ, গ্রহ-তারকারা নিজ কক্ষে চলার পথে বিরাটের ও অনন্তের আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে, তিনি তখন

বসে আছেন প্রাচীন ঋষির মতো, আর আমাদের কাছে বলছেন ঈশ্বরের কথা, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কথা, বলছেন নিত্য রহস্যের সমাধানের জন্য মানবাত্মার আকুতির কথা, যার মূর্ত বিকাশ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। মৃদু উচ্চারিত তাঁর মধুর কোমল আলোকিত শব্দগুলির স্পর্শে বিগলিত হয়ে যেত আমাদের মন, তা যেন শান্ত অস্তিত্বের সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে দুঃসাহসে উঁকি দিতে চাইত অনন্তের যবনিকা অন্তরালে।"

"গোপন রহস্যময় ভারতের সন্ধানে" ভারতে এসেছিলেন আমেরিকান লেখক পল ব্রানটন। ভারত-রহস্যের চাবিকাটি নিয়ে যেহেতু তখনো বর্তমান ছিলেন মাস্টার-মহাশয়—পল ব্রানটন স্বতঃই তাঁর চরণপ্রান্তে হাজির হন। শ্রীম-দর্শনের অভিজ্ঞতা-কাহিনী অনবদ্যভাবে তিনি লিখেছেন। কলকাতায় এসে মাস্টার-মহাশয়ের গৃহ-সন্ধান করে হাজির হয়েছিলেন আকাঙ্ক্ষিত স্থানে। খাপছাড়াভাবে গড়ে-ওঠা একটা বড় বাড়ির উপরে উঠেছিলেন উঁচু অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে, একটি ছোট ঘরে তাঁকে বসানো হয়েছিল, যার পাশে খোলা ছাত—ঘরে একটি লণ্ঠন, কিছু বই ও কাগজ এবং দুদিকে নীচু তক্তপোষ—আর কিছু নেই। এইখানে বসে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তারপর ?—

"দশ মিনিট কাটল। নীচের তলার একটি ঘর থেকে কেউ কেউ বেরুচ্ছেন, তার শব্দ পেলাম। তখনি আমার মাথায় তীব্র এক শিহরণ অনুভব করলাম—সহসা মনের উপরে চেপে বসল একটি ধারণা—নীচের তলায় কেউ আমার সম্বন্ধে মনঃ-সংযোগ করেছেন—সেই মানুষটির পদক্ষেপ শুনছি, উপরে উঠছেন তিনি। অত্যন্ত ধীরে তিনি উঠছিলেন—অবশেষে ঘরে প্রবেশ করলেন—কে তিনি সেকথা বলবার কোনো প্রয়োজনই আর হল না। বাইবেলের পৃষ্ঠা থেকে নেমে এসেছেন বহুমানিত মহাধর্মযাজক, মোজেসের কালের মানুষ—রক্তমাংসের আকারে সহসা উপস্থিত। মানুষটি—তাঁর কেশবিরল মস্তক, দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু-গুম্ফ, সুগম্ভীর মুখ, বৃহৎ ভাবতন্ময় চোখ, আশি বছরের পার্থিব অস্তিত্বের ভারে ঈষৎ-নত স্কন্ধ—ইনি মাস্টার-মহাশয় ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

"তক্তপোষে বসে আমার দিকে ফিরলেন। সেই ধীর-গম্ভীর উপস্থিতির মহিমা দেখামাত্র আমি অনুভব করলাম। এখানে লঘু বাক্চাতুরীর ঠাঁই নেই, হাস্যকৌতুক বিনিময়ের অবকাশ নেই ; না, এ স্থান কর্কশ সন্দিগ্ধতা বা অনালোকিত নাস্তিকতার বিস্তারক্ষেত্র নয়—যে-মনোভাব মাঝে-মাঝে আমার সত্তাকে অধিকার করে। এঁর চরিত্র লেখা আছে এঁর অবয়বে ঃ ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে সদাচারের মহত্ত্ব।"

"নিখুঁত ইংরাজি উচ্চারণে" মাস্টার-মহাশয় কথাবার্তা আরম্ভ করেছিলেন—ব্রানটন স্বভাবতঃই রামকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করেন—আর সে-কথা বলতে মাস্টার-মহাশয় "সদাই উদ্গ্রীব।" ব্রানটন জেনেছিলেন—রামকৃষ্ণ কিভাবে মাস্টার-মহাশয়কে

একেবারে বদলে দিয়েছিলেন—কেবল তাঁকে নয় আরও কতজনকে। জড়বাদী নাস্তিকেরাও রামকৃষ্ণের সম্মোহন এড়াতে পারেন নি। এখানে ব্রানটন স্বতঃই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নাস্তিক কিভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে আসবে? মাস্টার-মহাশয় বলেছিলেন, জেনে বা না-জেনে যেভাবেই লঙ্কা চিবানো হোক, মুখ জ্বলে যাবেই। রামকৃষ্ণের আগুন অনিবার্যভাবে পুড়িয়েছে সকলকে। আচ্ছন্ন কণ্ঠে রামকৃষ্ণের কথা তিনি বলে গিয়েছিলেন—"আ-হা! সেই অপরূপ দিনগুলি। প্রায়ই তিনি সমাধিতে ডুবে যেতেন—তখন এমনই দিব্যতার আলোকবিচ্ছুরণ হত যে, আমরা যারা তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে থাকতাম, মনে হত, তিনি মানুষ নন, স্বয়ং ঈশ্বর।" রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে নিজের অভিজ্ঞতার অনেক কথাই মাস্টার-মহাশয় শুনিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের লোকান্তরের পরে তাঁর প্রভাব কিভাবে বিস্তারিত হচ্ছে তার কথাও। বহুমুখী সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সেই প্রভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, তা সহজেই চোখে দেখা যায়, "কিন্তু যা সহজে দেখা যায় না অথচ কম গভীর বা কম সত্য নয় তা হল হৃদয়ের পরিবর্তন। এই অপূর্ব মানুষটি কত মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন যে ঘটিয়েছেন! কারণ তাঁর বার্তা ছড়াচ্ছে শিষ্য-পরম্পরায়, শিষ্যরা যতদূরে সম্ভব সেই বার্তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার সৌভাগ্য, তাঁর অনেক কথাকে বাংলায় লিখে নিতে পেরেছি—তার প্রকাশিত রূপ বাংলার ঘরে-ঘরে প্রবেশ করে গেছে, আর তার অনুবাদও ছড়িয়েছে ভারতের নানা স্থানে।"

বিশ্বাসের এই প্রতিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পল ব্রানটন নিজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। সেখানে সংশয়, অবিশ্বাস, বুদ্ধির অহংকার। "আমি যে, বিশ্বাস করতে পারি না, আমার উপায় কি?"—তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। "প্রার্থনাই উপায়" —মাস্টার-মহাশয় বলেছিলেন। "কিন্তু প্রার্থনাও করতে পারি না।" "তাহলে উপায় সাধুসঙ্গ।" সেই সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য ব্রানটন পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন:

"মাস্টার-মহাশয় তাঁর দীর্ঘ বিবরণ শেষ করে গহন নীরবতায় তলিয়ে গেলেন। আবার যখন তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, তার অ-হিন্দু বর্ণ ও আকার দেখে চমকে গেলাম। আবার আমি এশিয়া মাইনরের ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে ফিরে গেলাম, যেখানে ইসরায়েলের সন্তানেরা তাদের কঠিন ভাগ্যের পীড়ন থেকে সাময়িক অব্যাহতি পেয়েছিল। সেই তাদের মধ্যে দেখলাম মাস্টার-মহাশয়কে—পরম শ্রদ্ধেয় প্রফেট তিনি—নিজের জনগণের কাছে কথা বলছেন! মানুষটি কি মহৎ ও মর্যাদাময়! তাঁর ভালোত্ব, সাধুত্ব, সদ্‌গুণাবলী, ধর্মপ্রাণতা, ঐকান্তিকতা—একেবারে স্বতঃ-স্বচ্ছ। বিবেকের কণ্ঠস্বর যিনি নতমস্তকে শুনেছেন কালদীর্ঘ জীবনে—এমন মানুষের আত্মমর্যাদায় ভূষিত তিনি।"

"রাতের পর রাত তাঁর কাছে গিয়েছি—যতখানি না তাঁর পবিত্র বাণী শুনতে, ততোধিক তাঁর সান্নিধ্যের আধ্যাত্মিক কিরণে নিস্নাত হতে। তাঁর চতুর্দিকে পরিবেশ সুকোমল ও সুন্দর, মধুর এবং প্রেমময়। নিজের মধ্যে তিনি কোনো এক পরমানন্দ

পেয়েছেন, বাইরে তার উদ্‌ভাসন স্বতঃস্পষ্ট। তিনি যা বলেছেন, প্রায়ই তা ভুলে যাই, কিন্তু কদাপি ভুলতে পারিনা তাঁর মঙ্গলালোকিত ব্যক্তিত্বকে।···

"আমাদের শেষ সন্ধ্যা এল। তাঁর পাশে তক্তপোষের উপরে বসে আছি আনন্দে, ভুলে গেছি কতক্ষণ কেটেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের কথাবার্তা অব্যাহত বয়ে গেছে, অবশেষে তার ছেদ ঘটল। তখন মহান আচার্য আমার হাতটি ধরলেন, নিয়ে গেলেন বাড়ির সমতল ছাদের উপরে, সেখানে ঝকঝকে চাঁদের আলোয় দেখলাম—টবে-হাঁড়িতে দীর্ঘ চারাগাছ ও লতা গোল করে সাজানো। নীচে শহর-কলকাতার শত-সহস্র গৃহের আলোকমালা।

"ভরা পূর্ণিমা। মাস্টার-মহাশয় পূর্ণিমার চাঁদের দিকে দেখালেন। তারপর কিছুক্ষণ নীরব প্রার্থনায় ডুবে গেলেন। আমি ধীরভাবে তাঁর পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রার্থনাশেষে আমার দিকে ফিরে আশীর্বাদের রীতিতে হাত তুললেন, আর মৃদুভাবে আমার মস্তক স্পর্শ করলেন।

"আমি ধর্মের মানুষ নই, তবু এই দেবদূতের সামনে ভক্তিতে নত হলাম। আরও কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পরে তিনি কোমলভাবে বললেন, 'আমার কাজ প্রায় শেষ। ঈশ্বর যা করবার জন্য এই শরীরটিকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তা প্রায় সমাপ্ত। যাবার আগে আশীর্বাদ করছি, গ্রহণ করো।'

"অদ্ভুতভাবে তিনি আমাকে আলোড়িত করলেন। আজ রাত্রে নিদ্রা নয়—পথে-পথে ঘুরে বেড়ালাম। অবশেষে একটা বিরাট মসজিদের কাছে পেঁছিলাম, সেখানে শুনলাম—সুগম্ভীর প্রার্থনাধ্বনি—আল্লা হো আকবর—ঈশ্বর মহতো মহীয়ান্—মধ্যরাত্রির মৌন ভেদ করে উপরে উঠছে। আমি তখন ভাবলাম, বুদ্ধির যে-সংশয়কে আমি আঁকড়ে ধরে আছি, তার থেকে আমাকে মুক্ত ক'রে যদি কেউ সহজ বিশ্বাসের জীবনে যুক্ত ক'রে দিতে পারেন—তিনি আর কেউ নন—মাস্টার-মহাশয়।"

মাস্টার-মহাশয়ের কাজ শেষ। সত্যই ঈশ্বর তাঁকে একটি কাজ দিয়েছিলেন এযুগে শ্রৌত ঋষি হবেন—সেই তাঁর ভবিতব্য। স্বামী রাঘবানন্দ তাঁর বিদায়-দিনটির বর্ণনা করেছেন। সেদিন সকাল থেকে তিনি অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সক্রিয়। সকালে পারিবারিক ভবনে ঘুরে এসেছেন, যথারীতি নিজের রান্না করেছেন, দুপুরে খাওয়ার পরে অল্প বিশ্রাম নিয়েছেন। বিকালে কিছুক্ষণ ঝাঁট দিয়েছেন একটি ঘর। তারপর একটু হাঁপ ধরতে বিশ্রাম নিয়েছেন। নিকটস্থ ভক্ত-সেবক যখন বলেছেন, কি অদ্ভুত, ইঁদুর নোংরার মধ্যেও ঘোরাফেরা করে, তখন তিনি ভাবে বলেছেন, না, ওরা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, সর্বত্রই ব্রহ্ম। সন্ধ্যায় আবার গেছেন পৈতৃক বাড়িতে, আরাত্রিকের সময়ে ফিরেছেন, ঠাকুরঘরে প্রণাম ক'রে নিজের ঘরে গেছেন, সেদিন ফলহারিণী কালীপূজা, ভক্তরা দক্ষিণেশ্বরে ও গদাধর আশ্রমে পূজা দেখতে যেতে চাইলে তৎক্ষণাৎ বলেছেন, নিশ্চয় যাবে, পূজা দেখবে না, তা কি হয়? ঘণ্টাখানেক

ধরে কথামৃতের চতুর্থ খণ্ডের প্রুফ দেখেছেন, তারপর বিশেষ হাঁপ ধরায় ভক্তকে বলে মেঝেয় বিছানা পাতিয়ে তাতে শুয়েছেন, বাড়ির লোকজন এবং ডাক্তার এসেছেন, নাড়ির গতি কিন্তু ভালই, অন্যান্য ভক্তদের খবর দেওয়া হবে কি-না জিজ্ঞাসা করায় বলেছেন, না, কাউকে ব্যস্ত করার প্রয়োজন নেই ; রোগের আক্রমণ কিন্তু কমেনি, "তারপর মহাকালীর সেই মহারাত্রিতে, যখন সব-কিছু ঢেকে গেছে ঘনান্ধকারে, যখন মহামাতা মহামৌনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্য তাঁর সুগভীর স্নেহ, তখন তাঁর সন্তানের ব্যাকুল মর্মস্পর্শী প্রার্থনা শোনা গেছে— 'মাগো, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও।' মা সন্তানকে কোলে নিয়েছেন, নেমে এসেছে যবনিকা।"

কথা শেষ ? না, আর একটু বাকি আছে। মহেন্দ্রনাথ যখন সত্যই শিশু, বয়স মাত্র চার, তখন মায়ের সঙ্গে নৌকোয় মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময়ে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে তাঁরা নামেন। মায়ের হাতছাড়া হয়ে ছেলেটি মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। একজন সৌম্যমূর্তি মানুষ তাঁকে আদর করে কোলে নিয়ে, চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন, 'কাদের ছেলে গো, এর মা কোথায় গেল গো ?' মহেন্দ্রনাথ ভাবতে চেয়েছেন, ঐ মানুষটি রামকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নন। তিনি কোলে তুলে নিয়েছিলেন, আর ছেলেটির মায়ের সন্ধান করেছিলেন। জীবনের শেষ ডাকে দুজনের কোল চেয়ে মহেন্দ্রনাথ চলে গেলেন।

[বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (২য় খণ্ড) থেকে সংকলিত]

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ

শঙ্খদীপ বসু

কথামৃতের প্রামাণিকতা নিয়ে ইতস্তত প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন ওঠার একাধিক কারণ আছে।

প্রথম কারণ, আর কোনো বাঙালীর দৈনন্দিন কথাবার্তা ও জীবনচিত্রের এমন হুবহু চিত্র নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা থাকাটাই বিস্ময়কর—তদনুযায়ী সন্দেহ-জনক।

দ্বিতীয় কারণ, কথামৃতের মধ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে এমন কথা আছে যা প্রশস্তিসূচক নয়। ঐসকল ব্যক্তির অনুরাগীদের পক্ষে তা বিরক্তিকর—সুতরাং তাদের প্রামাণিকতা সন্দেহজনক।

তৃতীয় কারণ, 'অশিক্ষিত' রামকৃষ্ণের পক্ষে ঐসকল সমুচ্চ ও সুগভীর কথা বলা সম্ভব কি ? কথামৃতের কতখানি রামকৃষ্ণের আর কতখানি শ্রীম-র ?

সৌভাগ্যের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথার অপূর্বত্ব কথামৃত রচনার অনেক আগেই শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত। সমকালীন ব্রাহ্ম সূত্র ও অন্য সূত্রে তার ভূরি-ভূরি সাক্ষ্য আছে।[১]

কথামৃত প্রকাশের কালে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির অল্পস্বল্প মার্জনা করেন নি তা নয়। কিন্তু তার পরিমাণ সামান্যই—মুখের কথাকে লিপিবন্ধ করতে হলে যেটুকু মার্জনার প্রয়োজন হয় ততটুকু। কিন্তু উক্তির প্রামাণিকতা তা নষ্ট করেনি। সুবিখ্যাত দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ্ অশ্বিনীকুমার দত্ত একাধিকবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীম-কে তিনি দর্শন-বিবরণ লিখে পাঠান। তার গোড়ায় বলেন, "ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হয়েছিল···তাই জানাবার একটু চেষ্টা করি। কিন্তু আমি তো আর শ্রীম-র মতো কপাল করে আসিনি যে, শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ, মুহূর্ত, আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক-ঠিক লিখে রাখব!" স্মৃতি-কথার শেষে অশ্বিনীকুমার লিখেছেনঃ "সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিয়েছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো'! আর হাসিচ্যুত অমৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে 'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ।' আমারই যদি এই, এখন বোঝ, তুমি কেমন ভাগ্যধর?"

এক্ষেত্রে দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের উপভোগ্য মন্তব্য আছে। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ-প্রণীত "শ্রীম-দর্শন" গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে (পৃঃ ১৬০) পাই, শ্রীম কথা-প্রসঙ্গে বলেছেন ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)ঃ

> "সুরেনবাবু (দাশগুপ্ত) একজন আছেন—ইংলণ্ড, জার্মানী, এসব স্থানে লেখাপড়া করেছেন। এঁর যখন ৬ বছর বয়স তখন থেকেই আমরা এঁকে দেখছি। দুটো এম-এ পাস দিয়েছেন। ছেলেবেলায় এমন সব কথা বলতেন ঠিক যোগীদের মতো। ওয়েস্ট থেকে আমাদের লিখেছিলেন, 'কথামৃত যিনি বলেছেন তিনি অবতার। তা যদি না হয় তবে যিনি লিখেছেন তিনিই অবতার। আপনি লেখক। আপনাকে জানি, আপনি অবতার নন। তাহলে যাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে তিনি নিশ্চয় অবতার।"

দার্শনিকের এই লজিককে ম্যাজিক বলে মনে করতে পারেন কেউ-কেউ। তাঁদের সন্দেহভঞ্জনের জন্য অন্য যুক্তির প্রয়োজন আছে। মনে হয় না, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ও আলোচনার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে, যেহেতু উক্ত সাক্ষাতের (৫ আগস্ট, ১৮৮২) এক মাসের মধ্যে (৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮২) নিউ ডিসপেনসেসন পত্রিকায় এই সাক্ষাতের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।[২] বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁর দুই জীবনীকার চণ্ডীচরণ

১ এই গ্রন্থে তেমন বহু সাক্ষ্য সংগৃহীত আছে।—সম্পাদক।

২ এই অংশ বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র সংকলিত আছে।—সম্পাদক।

বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার এই সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন তাঁদের রচিত জীবনী দুটিতে। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত লাইট অব দি ইস্ট পত্রিকার মার্চ ১৮৯৮ সংখ্যায় শ্রীম এই সাক্ষাতের বিবরণ যখন লিখেছিলেন তখন সমসাময়িক অধিকাংশ মানুষই জীবিত।

সন্দেহ জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের বিষয়ে। এই সাক্ষাৎ মধুরেণ ব্যাপার হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সিন্ধ বক্রতায় উপেক্ষা-ভরে এমন কিছু কথা বলেছিলেন যা শ্রীরামকৃষ্ণকে বিরক্ত করেছিল—এবং তিনি মুখের উপর কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্যাদা-রক্ষায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যদি মনে করেন—যিনি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তিনি নিজ মর্যাদার তাগিদে রামকৃষ্ণ নামক অর্ধনগ্ন দরিদ্র ঈশ্বরোন্মত্ত এক ব্যক্তিকে ব্যঙ্গের নগদ বিদায় দিয়ে সরিয়ে দিতে প্ররোচিত হয়েছিলেন—তাহলে ব্যাপারটার একটা সম্মানজনক মীমাংসা হয়ে যায়!! অপরদিকে, সমকালীন নানা সাক্ষ্যসূত্রে যখন দেখা যায়—রামকৃষ্ণ কোনো ঐশ্বর্যগরিমা বা পদমর্যাদাকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না, যে-কোনো মুখের উপর যে-কোনো বাক্য বর্ষণ করতে পারতেন—তখন তাঁর পক্ষেও বঙ্কিমের কথা শুনে বিরক্তিসূচক উক্তি স্বাভাবিক—তাও আমরা মনে করতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয় ৬ ডিসেম্বর ১৮৮৪—বঙ্কিমের ডেপুটি-বন্ধু অধরলাল সেনের বাড়িতে।

কথামৃতে একাধিকবার বঙ্কিম-প্রসঙ্গ আছে। প্রথম খণ্ডে পাই (১৭/৩)—২৬ অক্টোবর ১৮৮৫ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সামনে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় খণ্ডে পাই (১৭/৩)—১৩ জুন, ১৮৮৫ তারিখে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু মন্তব্য করেছেন। পঞ্চম খণ্ডে (পরিশিষ্ট 'ক')—ঐ সাক্ষাতের দীর্ঘ প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ আছে। ঐ খণ্ডেই দেখতে পাই—বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় সাক্ষাতের মৌখিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ—গিরিশচন্দ্র ও শ্রীম-কে বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাসায় পাঠিয়েছিলেন—এবং বঙ্কিমের সঙ্গে এঁদের রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। তবে রামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমের আর সাক্ষাৎ ঘটেনি।

এই খণ্ডেই আছে, ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৪ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীর অংশবিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণকে পড়ে শোনানো হয় এবং তিনি মন্তব্যাদি করেন।

শ্রীম, রামকৃষ্ণ বঙ্কিম সাক্ষাতের যে অসাধারণ জীবন্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন, তার বিষয়ে সন্দেহ করার শক্তি যদি সংগ্রহ করতে হয় তবে তা নিজ সন্দেহ-স্বভাবের ভিতর থেকেই করতে হবে। তবু—এই সাক্ষাতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য দেওয়া যায়। উভয়ের সাক্ষাতের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের এক পরম ভক্ত (শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অপরপক্ষে যাঁর ভক্তি ছিল এমন

মনে করার কারণ নেই) শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের রচনা থেকে। (শ্রীশ মজুমদার রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী বন্ধু)। 'সমালোচনী' পত্রিকায় ইনি বঙ্কিম-স্মৃতি লিখেছিলেন—সেটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বঙ্কিম-প্রসঙ্গ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে—তাতে পাই :

> "পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত বাবু অধরলাল সেনের গৃহে একদিন বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ ঘটে। পরমহংস কথায়-কথায় বলিয়াছিলেন—শুনিয়াছি আপনার বড় বিদ্যার অভিমান। বঙ্কিমবাবু তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং ধর্মোপদেশ শুনিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতেও পরমহংস নরম হন নাই। বঙ্কিমবাবু হাসিয়া সকল উড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের অতঃপর আর কখনো দেখাশোনা হইয়াছিল কি-না আমি অবগত নহি।"

রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন—কথামৃতের চতুর্থ ভাগের চতুর্থ খণ্ডে তা পরিষ্কার লিখিত আছে। তা সত্ত্বেও এমন কথা নাকি কারো-কারো মনে উদিত হয়েছে—ঐ সাক্ষাৎ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন কখনো লিখিতভাবে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয়ের কথা বলেন নি (যদিও তার পক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ রয়েছে), তেমনি তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের উল্লেখও করেন নি। কেন করেন নি তা আমরা জানি না। তবে কথামৃতে রবীন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনকালীন ঘটনার বিবরণ মেলে।

ঘটনাস্থল—নন্দনবাগানে কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ি। তারিখ ২ মে, ১৮৮৩, বুধবার। কাশীশ্বর মিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, তাঁর বাড়ির দ্বিতলের এক কক্ষে ব্রাহ্মোৎসব হত। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর পুত্ররা উৎসব করতেন। এমনই এক উৎসবে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন।

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুর বংশের ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন"—কথামৃতে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীম, রাখাল (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতির সঙ্গে বেলা পাঁচটা নাগাদ উৎসবস্থলে উপস্থিত হন। তাঁকে প্রথমে নীচে একটি বৈঠকখানা ঘরে বসানো হয়। পরে নিয়ে যাওয়া হয় দ্বিতলে উৎসবস্থলে।

সেখানে উপাসনা আরম্ভের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ব্রাহ্মদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করেছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী (এবং সরলাদেবীর পিতা) জানকী ঘোষাল।

সন্ধ্যায় উপাসনা আরম্ভ হয়। কথামৃতে তার বিবরণ এই :

> এইবার উপাসনা আরম্ভ হইবে। উপাসনার বৃহৎ প্রকোষ্ঠ ব্রাহ্মভক্তে পরিপূর্ণ হইল। কয়েকটি ব্রাহ্মিকা ঘরের উত্তর দিকে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন—হাতে সঙ্গীতপুস্তক।

পিয়ানো ও হারমোনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে উদ্বোধন—প্রার্থনা—উপাসনা। বেদীতে উপবিষ্ট আচার্যগণ বেদ হইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন—

'ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নোবোধি।
নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

'তুমি আমাদের পিতা, আমাদের সদ্‌বুদ্ধি দাও—তোমাকে নমস্কার। আমাদিগকে বিনাশ করিও না।'

ব্রাহ্মভক্তেরা সমস্বরে আচার্যের সহিত বলিতেছেন—

'ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতংযদ্বিভাতি।
শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌ ॥'

এইবার আচার্যগণ স্তব করিতেছেন—

'ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায় । ইত্যাদি।

স্তোত্রপাঠের পর আচার্যরা প্রর্থনা করিতেছেন—

অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতংগময়। অবিরাবির্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।

স্তোত্রাদি শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। এইবার আচার্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন।"

স্টেটসম্যান পত্রিকায় ৫ মে ১৮৮৩ তারিখে (তৃতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে) এই উৎসব-সংবাদ বেরিয়েছিল যাতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি এবং সমবেত সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের কথা আছে। সংবাদটি এই ঃ

CALCUTTA

THE SHAMBAZAR BRAHMO SOMAJ—This somaj celebrated its 20th anniversary at the residence of Baboo Srinath Mittra and brothers in North Circular Road on Wednesday last. The prayer-hall was modestly and tastefully decorated with flowers and evergreens. From early morning hymns were sung till 7 when divine service commenced. In the afternoon Ramkisto Prankrisna, the sage of Dukhineswar, discoursed on morality

and religion. The evening service commenced at 7-30, the Pundit Sivanath Sastri M.A., and Baboo B. C. Banerjee officiating. The choir was led by Baboo Rabindra Nath Tagore.

শ্রীম-র সান্নিধ্যে

দিলীপকুমার রায়

[এই স্মৃতিকথায় উল্লিখিত 'পিতৃদেব' হলেন নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায়) এবং নির্মলদা—প্রখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ী।]

পিতৃদেবের জীবদ্দশায় যত সাধু দেখেছিলাম তার মধ্যে সেরা সাধু ছিলেন শ্রীম।···সে-সময়ে নির্মলদা সুরধামেই ছিলেন।

আমি : শ্রীম-কে দেখে এলাম বাবা।

পিতৃদেব (হেসে) : তোর ঠাকুরের বস্‌ওয়েল ? বেশ বেশ। বল্ কী হল ?···

আমি (হেসে) : হল কি—নির্মলদার সঙ্গে কাল হঠাৎ তর্ক বাধল। আমি পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি বটে—আরো আপনার ভরসা পেয়ে—

পিতৃদেব : রোস্ রোস্—আমার ভরসা মানে ?

আমি :—বাঃ আপনি সেদিন বলেননি যে পরমহংসদেব সাধু—একথা তেমনি জলজ্যান্ত সত্য যেমন সত্য—ঐ দোরটা দোর।

পিতৃদেব (প্রসন্ন) : বলেছি। আর বলার পরে কথাটা শুধু যে ফিরিয়ে নেব না তাই নয়, আরো একটু জুড়ে দেব—তাঁর ভাবে-ভোলা ছবি দেখলে মনে না হয়েই পারে না যে, তিনি মহাপুরুষ।···

আমি (আহ্লাদে আটখানা) : একথা কালই গিয়ে বলব শ্রীম-কে।

পিতৃদেব (হেসে) : বলিস। কেবল আমার মতন নাস্তিকের কথার কী মূল্য বল্ তাঁর মতন আস্তিকের কাছে ?

আমি : আপনার যত বাজে কথা—নাস্তিক কি গান বাঁধতে পারে—"গিরি গোবর্ধন—গোকুলচারী—যমুনাতীর নিকুঞ্জবিহারী—শ্যাম সুঠাম কিশোর ত্রিভঙ্গিম চিত্তবিনোদনকারী ?"

পিতৃদেব : তোর নির্মলদা'র সঙ্গে কী নিয়ে তর্ক বাধল ?

আমি : নির্মলদা'র আশ্চর্য বিশ্বাস, কিন্তু কিরকম যেন একটা গোঁড়ামি ওঁকে পেয়ে বসে সময়ে-সময়ে। আমাকে বললেন কী জানেন—কথামৃতের প্রতি কথাটি বেদবাক্য। এ কখনো হয় বাবা ? বলুন তো ?

পিতৃদেব (প্রসন্নকণ্ঠে) : তুই-ই বল না।

আমি (রোখালো ঢঙে মাথা নেড়ে) : না, হয় না। কোনো মানুষই অভ্রান্ত নয়, হতে পারে না—না এক কৃষ্ণ ছাড়া—তবে তিনি যে ভগবান স্বয়ং—মানুষ নন তো।

পিতৃদেব : হুম। কী করে জানলি ?

আমি : বাঃ, আপনিই তো লিখেছেন : "জয় নারায়ণ শ্রীশ জনার্দন জয় পরমেশ্বর ভবভয়হারী—জয় কেশব মধুসূদন জয় গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি।"

পিতৃদেব (কোণঠাসা হয়ে) : আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। না হয় মেনেই নিলাম যে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পারের পারী, ভবভয়হারী, সুতরাং অভ্রান্ত। তারপর কী —নির্মল বলে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ঠিক অমনি সাক্ষাৎ ভগবান ?

আমি (সংক্ষেপে) : নৈলে আমার সঙ্গে বাধবে কেন বলুন ? আমি বলি—তিনি মহাপুরুষ, যুগাবতার, আপাপবিদ্ধ, সবই মানি, কিন্তু তিনি একেবারে সাক্ষাৎ ভগবান্—এ কি গোঁড়ামি নয় ? বলুন তো ?

পিতৃদেব (হেসে) : কী ক'রে বলি বল্ ? আমার চোদ্দপুরুষেও কেউ ভগবানকে চর্মচক্ষে দেখেননি যে রে !

আমি (চমকে গিয়ে বিজ্ঞভাবে) : তা বটে। তবে কি আমারো বলা উচিত নয় যে, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ হতে পারেন না ?

পিতৃদেব : নিজের ধারণা বলবি না কেন ? তবে বেশী জোর করে বলা ভালো নয়—তিনি কি হতে পারেন আর কি হতে পারেন না ! তবে এ আমার কথা নয় বাবা, সেদিন তোর দেওয়া কথামৃতেই পড়ছিলাম—যাকে পরমহংসদেব বলতেন—"মতুয়ার বুদ্ধি"। আর পড়ে একটু চমকে গিয়েছিলাম বৈ কি। কিন্তু আমার কথা যাক—শুনি তোর গল্প।...

আমি (কিঞ্চিৎ উপশান্ত) তারপর আর কি ? নির্মলদা কথামৃতের সব কথাই বেদবাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠলাম রুখে, বললাম : মানি না। নির্মলদা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললেন : "ঠাকুরের শ্রীমুখের কথা তুই না মানলে তো তাঁর এইটি ! যাঁকে স্বয়ং স্বামীজী বলেছেন, অতুলনীয়।" আমি বিষম রেগে গিয়ে বললাম : ঠাকুর অতুলনীয় হতে পারেন, কিন্তু তা বলে কথামৃতে শ্রীম যা-যা লিখেছেন তা যে সবই ঠাকুরের মুখের কথা—তাঁর বানানো কিছুই নেই, এ তো প্রমাণ হয় না। নির্মলদা রেগে আগুন, বললেন : "থাম্ থাম্ ডেঁপোর সর্দার ! এইটুকু বুদ্ধি নিয়ে ধরাকে সরা—আঙুল ফুলে কলাগাছ ! কী জানিস তুই—কার কেমন স্মৃতিশক্তি যে বলে বসলি—তাঁর বানানো কথা ? জানিস তুই শ্রীম কে ? তাঁর মতন সত্যবাদী বিরল। তার উপর কী অদ্ভুত তাঁর স্মরণশক্তি—সাক্ষাৎ শ্রুতিধর।" আমি মরীয়া হয়ে আরো এক পর্দা চড়িয়ে বললাম : শ্রুতিধর হ'তে পারেন—কিন্তু ঠাকুর যা-যা বলতেন তাঁর সবই মনে

থাকত বলতে চান না কি ?···শ্রীম যা-সব লিখেছেন সমস্তই যে, হুবহু ঠাকুরের মুখের কথা, মেনে নিইই বা কেমন করে ? তিনি কিছু শোনা মাত্র [তো] ডায়ারিতে টুকে রাখতেন না ! নির্মলদা সোল্লাসে বললেন : "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে। পেয়েছি তোকে এবার কায়দায় । হ্যাঁ, তিনি যা শুনতেন ঐ ডায়ারিতেই তখনি-তখনি রোজ লিখে রাখতেন—আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি তাঁর সে ডায়ারি—চল্ তুই, তোকেও দেখাবো তবে ছাড়বো। চল্। আর যদি না যাস তবে হার মেনে নাকখৎ দে।"

পিতৃদেব : বটে ? উনি ডায়ারি লিখে রাখতেন রোজ ? ইনটারেস্টিং বৈকি। এ আমিও জানতাম না।···

আমি : বলছি, শুনুন। শ্রীম খুব কাছেই থাকেন। নির্মলদা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সটান হাজির—একেবারে তাঁর বসবার ঘরে। দেখি কি, তক্তপোষের উপরে তিনি বসে। চারিদিকে ছড়ানো বই। ঘরে কয়েকটি ধুপকাঠি জ্বলছে। সামনে ঠাকুরের ছবি। ওধারে শেলফে কয়েকটি মরক্কো-বাঁধানো একসার লম্বা বই। পরে শুনলাম—এইগুলিই তাঁর বিখ্যাত ডায়ারি। কিন্তু কী সুন্দর শ্রীম-র উজ্জ্বল সৌম্য মুখ বাবা ! বড়-বড় চোখ—সর্বদাই যেন জলে ভাসছে, তার উপরে সে যে কী মিষ্টি হাসি—কী বলব, মন-প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

পিতৃদেব (উৎসুক) : তারপর ? বল্ বল্, থামিস নে।

আমি (বেজায় খুশি) : নির্মলদা সোজা ঘরে ঢুকে তাঁকে ঢিপ্ করে প্রণাম করতেই তিনি মুখ তুলে চেয়ে একগাল হেসে বললেন : "এসো এসো নির্মল !—আর এ ছেলেটি ?" নির্মলদা পরিচয় দিতেই বলে উঠলেন : "অ্যাঁ ! ডি. এল. রায়ের ছেলে—যিনি 'সীতা', 'পাষাণী' লিখেছেন ? 'ও কে গান গেয়ে চলে যায়' গান বেঁধেছেন ? বোসো, বোসো, বোসো বাবা ! ধন্য তুমি !"···আমাকে খুব আদর করে ডেকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেন তাঁর কাছে এসেছি। আমি লজ্জায় তর্কাতর্কির কথা তুলতে পারলাম না, বললাম : এসেছি ঠাকুরের কথা শুনতে। না, মিথ্যা বলিনি বাবা। কারণ সত্যিই আমার ইচ্ছা ছিল, দেখা হলে তাঁকে ঠাকুরের কথাই জিজ্ঞাসা করব—ডায়ারি দেখে আমার কি হবে বলুন ?···

পিতৃদেব : শ্রীম-কে তুই বললি—সত্যনিষ্ঠ হয়েই—যে তুই তাঁর কাছে এসেছিস ঠাকুরের কথা শুনতে ?

আমি : হ্যাঁ হ্যাঁ। আর অমনি কী-যে ঘটে গেল চক্ষের নিমেষে—সে কী বলব ? জীবনেও নাটক ঘটে বাবা ! হল কি জানেন ? তিনি আমার কথা শুনেই কেঁপে উঠে চেঁচিয়ে ডাকলেন : "প্রভাস—ও প্রভাস ! আয় রে আয় ! দেখে যা, এইটুকু ছেলে আমার কাছে এসেছে কিনা ঠাকুরের কথা শুনতে রে—ঠাকুরের কথা শুনতে—দেখে যা—দেখে যা ! আহা—" বলেই নির্মলদাকে—"তোমাদের এ পূর্বজন্মের সুকৃতি

বাবা। নৈলে কি এমন জিজ্ঞাসা জাগে তোমাদের বয়সে ?" –ব'লে আমার দিকে ফিরে—"দ্যাখো বাবা দ্যাখো, আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—" বলেই দুটি হাত সোজা ক'রে আমার সামনে বাড়িয়ে দিলেন। দেখি কি, সত্যিই দুহাতেরই লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়—দু ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আর কি! তিনি কোঁচার খুঁটে দু চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন: "বেঁচে থাকো বাবা—শতায়ু হও।"

ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্য থেকে তিন চার জন লোক এলো ছুটে আমাকে দেখতে। আমি তো থ। কারণ ভাবুন একবার কাণ্ডটা—কোথায় আমি গিয়েছি তাঁকে দর্শন করতে—না, উল্টো বুঝিলি রাম! ওরা ছুটে এল কিনা আমাকে দেখতে!...

পিতৃদেব: ওঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! ড্রামা বটে। তা হবে না? ড্রামাটিস্টের কুলতিলক তো তুই—ড্রামা ভালোও বাসিস স্বভাবে—কাজেই "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" আর কি! যাক্, তারপর?

আমি: তারপর আর কি? তিনি উজিয়ে উঠে একটানা বলে চললেন ঠাকুরের কথা। আহা! কী সুন্দর কথা সে বাবা! বলতে লাগলেন চোখের জল মুছতে-মুছতে —কিভাবে ঠাকুর গাইতেন, নাচতেন, ছোটদের সঙ্গে ফচকিমি করতেন, খাওয়াতেন, গান গাইতে-গাইতে কিভাবে শিশু ভোলানাথ হয়ে যেতেন দিগম্বর—এই সব। আর সব ছাপিয়ে তাঁর অগাধ স্নেহের কথা। বললেন: "সে তো মানুষের স্নেহ নয় বাবা, মানুষ এমন ভালবাসতে পারে না। তাঁর ছিল এমনি স্নেহ যে, মনে হত কতদিনের চেনা, কত আপন! দেবতা থাকেন দূরে-দূরে মান বাঁচিয়ে। ঠাকুর ধরা দিলেন একেবারে কাছের মানুষ হয়ে—।" এইরকম যে কত সুন্দর-সুন্দর কথা বাবা! কিন্তু আমার মন মুগ্ধ হল ঠাকুরের কথা শুনেও তত না—যত তাঁর গুরুভক্তি দেখে।... ঠাকুর শ্রীম-কে কতখানি ভালবাসতেন জানি না, কিন্তু শ্রীম ঠাকুরকে যে কী ভালোই বেসেছিলেন স্বচক্ষে দেখে এলাম বাবা! এত বৎসর পরেও গুরুর নামটি মাত্র শুনেছেন—অমনি তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে! এ রকম গুরুভক্তি মানুষের হয়? কী বলেন আপনি?...যান! আপনি কিছুই বলছেন না।...

পরদিন সকালে ফের ছুটলাম শ্রীম-র ওখানে নির্মলদার হাত ধ'রে।...

শ্রীম ফের আদর ক'রে পাশে বসালেন। দেখতে-দেখতে দু পেয়ালা চা এসে হাজির।

আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠতেই—

শ্রীম: খাও বাবা! তোমাকে কাল মিষ্টিমুখ করানো হয় নি। ঠাকুরের কথা বলতে গেলে আমি সব ভুলে যাই কিনা। (বলতে-বলতে চোখ দুটি ফের চিকিয়ে ওঠে)

নির্মলদা: ওকে আপনার ডায়ারি দেখাবেন?

শ্রীম (উঠে সন্তর্পণে একখণ্ড ডায়ারি শেলফ্ থেকে বার করে): এই দ্যাখো

বাবা। তখন কি ভাবেই যে দিন গেছে! কোনদিন ভুল হত না আমার লিখে রাখতে—আর স্মরণশক্তিও ছিল তো তাজা—

আমি আবিষ্ট হয়ে ডায়ারিগুলির পাতা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম। বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল ভাবতে যে, যার কথামৃত আজ লক্ষ-লক্ষ তাপিতের আর্তি দূর করছে, দিশাহীনকে পথ দেখাচ্ছে, ভক্তিহীনকে বিশ্বাসের পাথেয় যোগাচ্ছে, হতাশের অন্ধকারে এনে দিচ্ছে ভরসার আলো, সে সবই তাঁর শ্রীমুখের মহাবাণী—আর এমন মানুষের কথামৃত—যিনি যুগাবতার হ'য়ে এসেছিলেন এ বস্তুতান্ত্রিক যুগে প্রেমময়ের সুধা পরিবেশন করতে—যিনি সারা জীবন সামান্য একটি ঘরে অকিঞ্চনের মতনই কাটিয়ে গেছেন শুধু অকিঞ্চনের কাছে এই বাণী বহন ক'রে এনে দিতে যে, সর্বেশ্বর অকিঞ্চনের যেমন বন্ধু এমন আরো কারো নন। পরে যখন ভাগবতে প্রথম পড়ি রুক্মিণীর কাছে কৃষ্ণের মৃদু পরিহাস ঃ

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বৎ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥

অর্থাৎ

অকিঞ্চন আমি, অকিঞ্চনেরি লো বন্ধু প্রিয় আমি নিত্য।
আমাকে সাধে না তো তাই গো তারা রাণী, যাহারা বৈভবদৃপ্ত।

তখন মনে পড়েছিল শ্রীম আমাকে সেদিন বলেছিলেন ঃ পরমহংসদেবের কাছে একদিন এমনি এক নিঃস্ব এসে বলে হাহাকার ক'রে ঃ "ঠাকুর, আমার কেউ নেই।" তাতে ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা, হাততালি দিয়ে হৃদয়কে ডেকে বলেন ঃ "ও হৃদু; দ্যাখরে দ্যাখ, কে ভাগ্যবান এসেছে আজ আমার কাছে—ওরে, যার কেউ নেই তারই যে ভগবান্ আছেন।" আহা কি মিষ্টি কথা—কথামৃতই বটে।…

নির্মলদা আর একখণ্ড ডায়ারি নিয়ে পাতা উল্টোচ্ছিলেন, হঠাৎ বললেন ঃ "মণ্টু কাল ঠাকুরের সম্বন্ধে সব কথা গিয়ে ছোটমামাকে বলেছে।"

শ্রীম ঃ বটে! (আমাকে) তা তিনি কি বললেন শুনে? বলো বাবা, বলো।

আমি ঃ বললেন—ঠাকুর মহাপুরুষ—তাঁর ভাবে ভোলা ছবি দেখলেই মনে হয়।

শ্রীম ঃ আহা! এমন বাপ পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। শোনো বাবা! একটি কথা বলি তোমাকে। তুমি তাঁর কথাবার্তা রোজ লিখে রাখবে একটি খাতায়—যেমন আমি রেখেছি। না, শুধু তাঁর নয়, যখনই কোনো মহাজনের মুখে মনে রাখার মতো কিছু শুনবে টুকে রাখবে, কেমন?

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে ঘাড় নেড়ে "রাখবো" বলতেই তিনি বললেন ঃ "আর একটি কথা। তোমার বাবা সামান্য লোক নন—যদি সামান্য লোক হতেন তবে এমন কথা বলতে পারতেন না যে, ঠাকুর মহাপুরুষ। আহা, কী কথা! মহাপুরুষকে মহাপুরুষ বলে চেনা কি সোজা কথা বাবা!…

মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর থেকেই পিতৃদেবের ঔদাসীন্য এসেছিল নিজের স্বাস্থ্যের

প্রতি।…তিনি টের পেয়েছিলেন যে, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই তাঁর "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে"-তে ফুটে উঠেছিল তাঁর "অন্তিম দিনের" প্রার্থনা : "পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে, বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।" "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" গানটিতে—আকুল ডাক : "এখন বড় শ্রান্ত আমি ওমা কোলে তুলে নে না।" "আর কেন মা ডাকছ আমায়" গানে—মধুর মিনতি :

> সাঙ্গ হ'ল ধুলোখেলা, হ'য়ে এল সন্ধ্যে বেলা,
> ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, শেষে তোমায় হারাই পাছে।
> আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নেও মা ঘিরে
> ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা, তোমার ঐ বুকের মাঝে।"

ভক্তিপ্রবণতা তাঁর ছিল বরাবরই, কিন্তু ক্রমাগত বুদ্ধিবাদীদের সাহচর্যে তাঁর সহজাত ভগবৎভক্তির স্রোত যৌবনে মন্দা হ'য়ে এসেছিল। শেষজীবনে কথামৃত পড়ে পরমহংসদেবের দিকে ঝোঁকার সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন ভক্তি ফের আত্মপ্রকাশ করেছিল—ঠিক যেমন পাথরচাপা নির্ঝরিণী হঠাৎ পাথর ঠেলে আত্মপ্রকাশ করে অফুরন্ত উৎসধারে।

['স্মৃতিচারণ' (১ম) গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

কথামৃত প্রকাশন (গ্রন্থপঞ্জী)

সুনীলবিহারী ঘোষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রীম-কথিত) বাংলা সাহিত্যে এক মহতী সৃষ্টি। দীর্ঘ আশি বছর ধরে এই মহাগ্রন্থ শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-সমাজে প্রায় নিত্যপঠিত এবং মহাকালকে অতিক্রম করে দিনদিন আরও বৃহত্তর গোষ্ঠীতে গৃহীত হচ্ছে। এই বিস্তারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থপঞ্জী।

গ্রন্থপঞ্জীর পরিধি আরও একটু ব্যাপক করা হয়েছে। কেবল কথামৃত নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি সংকলনও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রামকৃষ্ণের যে-কোনো জীবনচরিতে তাঁর উক্তি অতিঅবশ্য থাকলেও যেহেতু উদ্দেশ্য কেবল উক্তি সংকলনের পঞ্জী প্রস্তুত করা, তাই সাধারণ জীবনীগ্রন্থ এই গ্রন্থপঞ্জীতে গ্রহণ করা হয় নি।

বহু পত্রপত্রিকায় রামকৃষ্ণের উক্তি ও কথামৃত সম্বন্ধে আলোচনা ছড়িয়ে আছে। ঐ সব পত্রপত্রিকার অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নি। ১৯৮২ সালের বহু পত্রপত্রিকায় এমনকি কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রে কথামৃতের নোট আরম্ভ করার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে (সেইসঙ্গে কথামৃতকারের দেহান্তের পরে পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার

সূত্রে) নানা গবেষণামূলক তথ্যপ্রধান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা সেগুলিও এই গ্রন্থপঞ্জীর বাইরে রেখেছি। কেবল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আলোচনাই গৃহীত হয়েছে। অবশ্য এই গ্রহণও অসম্পূর্ণ।

এই গ্রন্থপঞ্জীর ছটি ভাগ। যেমন, ক. কথামৃতের পূর্বে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাংলা উক্তি সংকলন; খ. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, গ. বাংলায় অন্যান্য উক্তি-সংকলন ও তদুপরি নির্ভরশীল গ্রন্থ, ঘ. ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ, ঙ. The Gospel of Sri Ramakrishna ও চ. অ-ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রথম যে-খবর প্রকাশিত হয় ইংরাজীতে ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় ২৮ মার্চ ১৮৭৫-এ, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

"The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful."[১]

বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক অর্থাৎ ১৪ মে ১৮৭৫-এ। এই আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত গল্প 'বিড়ালের বাচ্চা' ও 'হনুমানের বাচ্চা'-র উল্লেখ আছে।[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা 'উক্তি' হিসাবে সর্বপ্রথম বিধৃত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পরমহংসদেব সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ রচনায়, যেটি দি সানডে মিরার-এ ১৬ এপ্রিল ১৮৭৬-এ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি Theistic Quarterly Review পত্রিকায় ১৮৭৯-এর অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়, পরে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে 'Paramahansa Ramakrishna' নামে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। এতে দশটি উক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় তাঁর উপদেশ নিয়ে মোট চারটি বই প্রকাশিত হয়। লোকসমক্ষে আত্মপ্রচারে শ্রীরামকৃষ্ণের তীব্র অনীহা ছিল। এর বহু দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ-জীবনীতে, কথামৃতে, আছে। যেমন,

কেশব (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনি কতদিন এরূপ গোপনে থাকবেন—ক্রমে এখানে লোকারণ্য হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও তোমার কি কথা। আমি খাইদাই থাকি, তাঁর নাম করি। লোক জড়ো করাকরি আমি জানি না। কে জানে তোর গাইগুই, বীরভূমের বামুন মুই।

কেশব—আচ্ছা, আমি লোক জড়ো করব। কিন্তু আপনার এখানে সকলের আসতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি সকালের রেণুর রেণু। যদি দয়া করে আসবেন, আসবেন।

১ বিস্তৃত উদ্ধৃতির জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন।—সম্পাদক

২ বিস্তৃত উদ্ধৃতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে।—সম্পাদক

কেশব—আপনি যা বলুন, আপনার আসা বিফল হবে না। (১লা জানুয়ারী ১৮৮১)

ঠাকুর বলিতেছেন—আমার নাম কাগজে প্রকাশ করো কেন ? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, কারুকে বড়ো করা যায় না। ভগবান যাকে বড়ো করেন, বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায় না। মানুষ কি করবে ? মানুষের মুখে চেয়ো না—লোক্ ! পোক ! যে মুখে ভাল বলছে, সেই মুখে আবার মন্দ বলবে। আমি মান্যগণ্য হতে চাই না। যেন দীনের দীন, হীনের হীন হয়ে থাকি। (১ জানুয়ারী ১৮৮২)

ক. কথামৃতের পূর্বে প্রকাশিত বাংলা উক্তি-সংকলন

পুস্তকাকারে শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তির প্রথম প্রকাশ ২৪ জানুয়ারী ১৮৭৮। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হতে কেশবচন্দ্র সেন-কর্তৃক প্রকাশিত 'পরমহংসের উক্তি' নামক পুস্তিকা। এতে ১০টি পৃষ্ঠা ছিল, দাম দু' পয়সা। ১৮৮৬ সালে এটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়, দাম দু পয়সাই থাকে। এগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য।

উক্তি-সংকলনের দ্বিতীয় বই প্রকাশিত হয় ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৪ সালে। সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি'। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত সংস্করণের মুখবন্ধে বইটির ইতিহাস বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে :

"এই পুস্তক পরমহংসদেবের জীবিতাবস্থায় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'Sayings of Paramahansa Ramkrishna' 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামে পুস্তিকাকারে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় ভাগও বাহির হয়। পরে ১২৯৭ সালে 'পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের উপদেশ' নামে ১ম ও ২য় ভাগ পরিবর্ধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তৎপরে সুরেশবাবু আরও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করিয়া ১৩০১ ইং ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড উপদেশ (এক এক খণ্ডে ১০০টি উপদেশ ধরা হয়) পুনঃমুদ্রিত করেন।···এই পুস্তকে মিথ্যা, অতিরঞ্জিত বা পরিবর্তিতাকারে পরমহংসদেবের কোনো উপদেশ স্থান পায় নাই।···পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা যাইতেন এবং যাঁহারা বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই উপদেশগুলিই আমরা স্থানদান করিয়াছি।···এই সংস্করণে দুইখানি ছবি দেওয়া গেল। একখানি শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের দাঁড়ান ছবি, অপরখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমন্বয়ভাব, যাহা তাঁহার প্রধান ভক্ত ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।"

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণে প্রথম হইতে অষ্টম খণ্ড একত্রে ৭৫০টি উপদেশ সংগৃহীত হয়েছে। এই বইটি এখনও প্রচলিত আছে।

১৮৮৪ সালে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হলে বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১২৯১ সালের ২৩শে চৈত্রের 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় এই বইটির সমালোচনায় বলা হয়, 'প্রথম ভাগ।⋯ ইহাতে প্রকাশিত পরমহংসদেবের উক্তিগুলি এমন উদার, জ্ঞানগর্ভ, এমন অন্তঃসারপূর্ণ যে সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় ইহার সারবত্তা যথার্থরূপে বিবৃত হওয়া অসম্ভব।⋯'

বইটির ২য় ভাগ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হলে ১২৯৩ সালের ৫ঠা কার্তিক তারিখের 'দৈনিক' পত্রিকা লেখেন, "যদি কেহ অমূল্য রত্ন চান ত, এমন আর পাইবেন না। এমন সহজ সরল শিশুবোধ্য কথায়, অতি সুন্দর উপমায় দুরূহ ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে রামকৃষ্ণদেবের মতো মহাপুরুষ আমরা আর দেখি নাই।⋯ উক্তিগুলি সমস্ত না হউক, অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে পারিলেও যে, 'বঙ্গভাষায় একটি রত্নভাণ্ডার স্থাপিত হয়' তাহাতে আর সন্দেহ কি।"

'পতাকা' পত্রিকায় লেখা হয়, '⋯পরমহংস ঠিক কথা বলিয়াছেন যে, অপরকে বধ করিতে হইলে বিবিধ অস্ত্রের আবশ্যক হয়, কিন্তু আত্মহত্যা সামান্য একখানি নরুণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। লোকশিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্ত্রপাঠ আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু আপনার ধর্মলাভ সামান্য জ্ঞান দ্বারা হইতে পারে।'

এই বইটির নামে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি', 'পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের উপদেশ', 'শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও উপদেশ', 'আদি ও অমৃতময় শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ/শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা ও ভগবান রামকৃষ্ণের উপদেশ' ইত্যাদি।

বইটির ভূমিকায় সঙ্কলকের বিনয় ও নম্রতা লক্ষণীয় :

"কামকাঞ্চনের দাস—বর্তমান লেখক যে ভগবান রামকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র চিত্রিত করিবার উপযুক্ত পাত্র নন, সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে যাঁহারা তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার প্রকৃত অধিকারী, এক্ষেত্রে অদ্যাপি কেহই তাঁহারা অবতরণ করিতেছেন না দেখিয়া বলপূর্বক তাঁহাদিগকে এক্ষেত্রে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যেই আমি এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

"আমি শিব গড়িতে জীব গড়িয়াছি, ধান ভানিতে শিবের গান করিয়াছি, অমূল্য দ্রব্যগুলি আনিয়া ডাল খিচুড়ি বানাইয়াছি, রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ ইহা পাঠে ছত্রে ছত্রে ব্যথিত হইবেন, তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার এই কিম্ভূত চিত্রগুলি পাঠ করে ব্যথিত হ'য়ে যদি কোনো মহাত্মা ঠাকুরের সর্বাঙ্গীণ সর্বসুন্দর একখানি জীবন-চরিত প্রকাশ করেন, তবেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

তৃতীয় বই—রামচন্দ্র দত্ত রচিত 'তত্ত্বসার' ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৩৯ পৃষ্ঠার এই বইটির বিজ্ঞাপনে আছে 'পরমহংসদেবের উপদেশসকল তত্ত্বসারের ন্যায় ভূরি ভূরি পুস্তক প্রচার দ্বারা ধর্মরাজ্যের নিগূঢ় ভাবসকল প্রকাশিত হইবে।'

চতুর্থ বই—তত্ত্বপ্রকাশিকা। অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক মহাত্মা রামচন্দ্র প্রণীত।

এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ ১৩১৪ সালে (১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রামচন্দ্র দত্তের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে :

"আমার হৃদয়-ভাণ্ডার-স্থিত রত্নরাজি হইতে, আজ তত্ত্ব-প্রকাশিকা-রূপ কিঞ্চিৎ রত্ন সাধারণের সুখের নিমিত্ত প্রদত্ত হইল। প্রভু আমায় যে রত্ন দিয়াছেন, তাহা অক্ষয় এবং অসীম।...ইতিপূর্বে এই রত্নের কিয়দংশ সাধারণের নিমিত্ত বাহির করিয়াছিলাম, তাহাতে অনেকের আগ্রহ দেখিয়া, বর্তমান আকারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।...প্রভুর উপদেশগুলি...আমার শিক্ষানুযায়ী আমি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি।...আমাদের যে প্রকার সময় পড়িয়াছে, তাহার হিসাব করিয়াই পুস্তকখানি সাজান হইয়াছে। এই নিমিত্ত ঈশ্বর নিরূপণ হইতে, ঈশ্বরলাভ এবং সামাজিক অবস্থাদি বিষয়ক উপদেশগুলিও যথাযথরূপে বিন্যস্ত হইল।"

তত্ত্ব-প্রকাশিকা প্রথমে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটি ২০শে জুন ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। '৪৬০ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ গ্রন্থাকারে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ (মে ১৮৯১) প্রকাশিত হয়।' বইটির তৃতীয় সংস্করণ কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে সেবকমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত। ৩০০টি উপদেশ ব্যাখ্যাসহ বিধৃত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় কিছু কিছু উক্তি প্রকাশিত হয়। যেমন, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯-এ ১৩টি উক্তি ; ১ অক্টোবর ১৮৭৯-এ ৭টি ; ১ নভেম্বর ১৮৭৯-এ ৫টি উক্তি ইত্যাদি। 'পরিচারিকা' পত্রিকার জুলাই ১৮৮৬ সংখ্যায় ৭টি উক্তি প্রকাশিত হয়।

পরমহংসদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন-সংকলিত 'পরমহংসের উক্তি' (২য় সংখ্যা) এবং সংক্ষিপ্ত জীবন ২৪ জানুয়ারী ১৮৮৭-এ প্রকাশিত হয়। ৬৪ পৃষ্ঠার এই বইটির মূল্য ছিল তিন আনা। ৭৫টি উক্তি এই পুস্তকে সংগৃহীত হয়েছে। কেশবচন্দ্র-প্রকাশিত 'পরমহংসের উক্তি' ও গিরিশচন্দ্র-প্রকাশিত উহার ২য় সংখ্যা—এই দুইটি গ্রন্থের মিলিত রূপ ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪-এ প্রকাশিত হয়। এই বইটিই 'আদি অমৃতময় কথামৃত' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি বা উপদেশ নিয়ে আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হয় কথামৃতের পূর্বে। যেমন,

'পদ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ'। এই বইটির প্রথম ভাগ ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হয়। ২৪ পৃষ্ঠার এই বইটির মূল্য ছিল দুই আনা। অতি সহজ ও সরল পদ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ১৪১টি উপদেশ সংকলিত হয়েছে। "অল্পায়াসে ধর্মানুরক্ত

করিতে পরমহংসদেবের উপদেশের ন্যায় সহজ পথ আর কিছুই নাই।" "পুস্তকারম্ভের ভণিতা হইতে জানা যায় ইহা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'-লেখক অক্ষয়কুমার সেনের রচনা।"

বন্দি মাতা শ্যামাসুতা প্রভু অবতারে।
বন্দি প্রভু রামকৃষ্ণে ভক্তি সহকারে ॥
বন্দি তাঁদের ভক্ত যত যে যেখানে আছে।
চরণ শরণ চায় অভাজন পদ-রেণু যাচে ॥
নামটি আমার শাঁকচুন্নি কল্প গাছে বাসা।
লীলাপুঁথি উক্তি লিখে মিটে যেন আশা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-জগতে 'শাঁকচুন্নি' অতি পরিচিত নাম। অক্ষয়কুমার সেনের শাঁকচুন্নি নামকরণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস/ (জীবনী ও উপদেশ)/ হিন্দুধর্ম প্রচারক পরিব্রাজক/ শ্রীসত্যচরণ মিত্র/প্রণীত/কলিকাতা/ ১৩০৪ সাল/এক টাকা মাত্র। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯২।

ভূমিকায় গ্রন্থকারের নিবেদন—

"প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা লেখক শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিশেষ আলাপ হয়। ইনি আমাকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনী লিখিবার জন্য পরামর্শ ও উৎসাহ দান করেন।···বাঙ্গালার বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের অনেক ভক্তলোক পূর্ব প্রকাশিত 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনচরিত' মধ্যে অনেক হাস্যোদ্দীপক কথা পাঠ করিয়া দুঃখিত হয়েন।···যেমন দশচক্রে ভগবান ভূত হন সেইরূপ ভক্তচক্রে পড়িয়া অনেক মহাপুরুষ মাটি হইয়াছেন। রামকৃষ্ণের স্বর্গীয় জীবন বিকৃত হইতেছে দেখিয়া আমি অনেক অনুসন্ধানে সেই বিকৃতি দূর করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছি। পূর্ব জীবন-চরিতের ভ্রম, কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া অনেক নূতন প্রকৃত ঘটনা যুক্ত করিয়াছি।···এ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিশেষ বন্ধু— ডমরু শ্রীমহিমচন্দ্র নকুলাবধূত মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই পুস্তকের অর্ধেক কথা নকুলাবধূত মহাশয়ের ঋষিতুল্য মুখ হইতে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে লেখক বলিয়াছেন, "পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন এক অত্যদ্ভুত সামগ্রী।"···"ভগবান ভারতবর্ষের পরিত্রাণের জন্য 'রামকৃষ্ণ-রূপী' হইয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে প্রকৃত জ্ঞানভক্তির আধাররূপে প্রকাশিত হইলেন।" (পৃঃ ৯)।

গ্রন্থটির ১১৯-১২৬ পৃষ্ঠা ও ১৬০-১৭৮ পৃষ্ঠায় উপদেশ সংকলিত আছে। পরিশেষে 19th Century-তে প্রকাশিত ম্যাক্সমুলারের বিখ্যাত প্রবন্ধটি দেওয়া আছে।